শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

ফিকহি মাকালাত

আধুনিক সমস্যার শরয়ি সমাধান

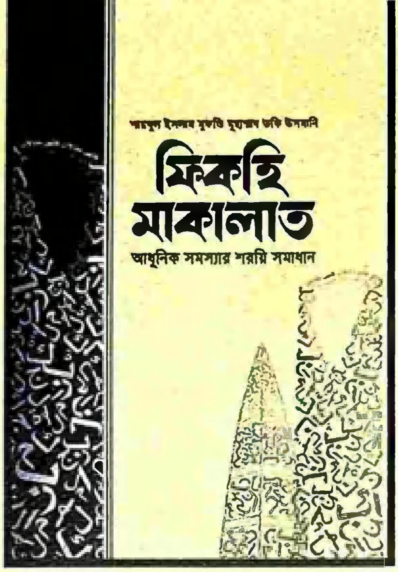

গ্রন্থ সম্পর্কে

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকিহ। আধুনিক সমস্যার সমাধান বিষয়ে তার রচনা-বক্তৃতা পুরো বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর ব্যাপক উপকার ও কল্যাণ বিতরণ করছে। 'ফিকহি মাকালাত' গ্রন্থটি শায়খুল ইসলামের সেসব রচনার সংকলন-সমষ্টি। এসব রচনার অধিকাংশ সেমিনারে উপস্থাপিত হয়েছে এবং প্রবন্ধ আকারে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এতে আধুনিক সমস্যাবলির সমাধান তুলে ধরা হয়েছে, ফলে মুদ্রাব্যবস্থা, হালাল-হারাম, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যাংকিং ব্যবস্থা, পবিত্রতা অর্জন, কাজা নামাজ, ট্রাফিক দুর্ঘটনা, মাতৃদুগ্ধ পান, আমদানি-রপ্তানি, মুদারাবা, জাকাত, জিহাদ, ভোট-নির্বাচন, পশু জবাই, আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, হারাম বস্তু দিয়ে চিকিৎসা, মানব-অঙ্গ প্রতিস্থাপন, ইত্যাদি বিষয়ে উদ্ভূত বিভিন্ন অবস্থার বিশ্লেষণ অত্যন্ত সুচারুরূপে এ গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে।

আধুনিক সমস্যার শরয়ি সমাধান

ফিকহি মাকালাত

১

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

আধুনিক সমস্যার শরয়ি সমাধান

ফিকহি মাকালাত-১

মূল : শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

তরজমা : মুফতি ইলিয়াস বিন আলাউদ্দীন

সম্পাদনা : মাকতাবাতুল ইসলাম সম্পাদনা পর্ষদ

ভাষা সম্পাদনা : আহমাদ গালিব

বিষয় সম্পাদনা : মুফতি রেজওয়ান বিন রায়হান

বানান ও ভাষারীতি : মাকতাবাতুল ইসলাম

সম্পাদক মণ্ডলী

১. মুফতি রেজওয়ান বিন রায়হান। ২. মুফতি আবদুল কাইয়ুম শেখ। ৩. মুফতি রাওয়াহা। ৪. মুফতি সাইফ আকরামি। ৫. মাওলানা আহমাদ গালিব। ৬. মাওলানা ফরিদ মাসউদ। ৭. মুফতি মুহাম্মাদুল্লাহ মুজাহিদ। ৮. মাওলানা হাসান আহমাদ।

আধুনিক সমস্যার শরয়ি সমাধান

ফিকহি মাকালাত

১

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

মাকতাবাতুল ইসলাম

আধুনিক সমস্যার শরয়ি সমাধান

ফিকহি মাকালাত-১

মূল : শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

তরজমা : মুফতি ইলিয়াস বিন আলাউদ্দীন

সম্পাদনা : মাকতাবাতুল ইসলাম সম্পাদনা পর্ষদ

প্রকাশক

হাফেজ কুতুবুদ্দিন ইবনু আশ-শায়খ মুহিউদ্দিন আহমাদ

সর্বস্বত্ব : সংরক্ষিত

পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি.
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রি.

প্রচ্ছদ : মাকতাবাতুল ইসলাম

মূল্য : BD ৳ ৫৯০, US $ 15, UK £ 10

মূল্য : ৩১৮০/- টাকা মাত্র [ছয় খণ্ড একত্রে]

সার্বিক যোগাযোগ

মাকতাবাতুল ইসলাম

[সেরা মুদ্রণ ও প্রকাশনার অগ্রপথিক]

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
৬৬২ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা
ঢাকা-১২১২

বাংলাবাজার বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামি টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

০১৯১১৬২০৪৪৭, ০১৯১২৩৯৫৩৫১, ০১৯১১৪২৫৬১৫, ০১৯১১৪২৫৮৮৬

ISBN : 978-984-91049-1-9
www.facebook/Maktabatul Islam
www.maktabatul-islam.com

FIQHI MAKALAT 1.ST
Writer : Shaikhul Islam Mufti Mohammad Taqi Osmani
Translatet by : Mufti Iliyas Bin Alauddin

একমাত্র পরিবেশক : অর্পণ প্রকাশন

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com, wafilife.com, boibiswa.com

بسم الله الرحمن الرحيم

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

আলহামদুলিল্লাহ ছয় খণ্ডে প্রকাশিত 'ফিকহি মাকালাত—فقہی مقالات' গ্রন্থটির পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ এখন পাঠকের হাতে। পাকিস্তানের করাচিতে অবস্থিত মায়মান ইসলামিক পাবলিশার্স থেকে ২০১২ খ্রি. সালে 'ফিকহি মাকালাত—فقہی مقالات' গ্রন্থের ছয় খণ্ডের যে সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিলো তা বাংলাদেশ থেকে মাকতাবাতুল ইসলাম বাংলা ভাষায় ছয় খন্ড একত্রে প্রথমবারের মতো ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে প্রকাশ করে। তখন অল্প দিনেই প্রথম সংস্করণের সকল কপি নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু পাঠকের তরফ থেকে কিছু অসংগতি ও ভুল-ভ্রান্তির অভিযোগ এলে আমরা গ্রন্থটির মুদ্রণ বন্ধ করে দিয়ে এর ব্যাপক সংস্কার-কাজ হাতে নিই।

বিভিন্ন জটিলতা ও সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে অবশেষে জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দে আমরা মূল্যবান এ গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ শেষ করতে সক্ষম হই। এ সংস্করণে বাংলা অনুবাদ মূল গ্রন্থের সঙ্গে অনুপুঙ্খভাবে মিলিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে মূল আরবি উৎসগ্রন্থের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। তখন উর্দু সংস্করণের কিছু অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলে সেগুলো সংশোধন করা হয়েছে। যেসব হাদিসের রেফারেন্স যুক্ত ছিলো না সেগুলোর রেফারেন্স যুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া অন্য যেসব বর্ণনার রেফারেন্স জরুরি ছিলো সেগুলো যুক্ত করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে লেখক নিজে যেসব অভিমত

প্রত্যাহার করে নিয়েছেন এবং রুজু করে ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন এমন স্থানগুলোও চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে। এর বাইরে ভাষা, বানান ও বিন্যাসে প্রচুর কাজ করা হয়েছে। গ্রন্থটির বাংলা বর্ণনার সাহিত্যমান উত্তীর্ণ করাসহ সম্পূর্ণ গ্রন্থটিতে ব্যাপক পরিমার্জনা সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে ছয় খণ্ডে প্রকাশিত ফিকহি মাকালাত গ্রন্থের এই দ্বিতীয় সংস্করণটি আগের তুলনায় বহুগুণ মার্জিত, সমৃদ্ধ, ও অভিরূপ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।

—আহমাদ গালিব

২৯-১-২০২২ খ্রি.

লেখক পরিচিতি

শাইখুল ইসলাম, মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ্ বর্তমান বিশ্বের প্রখ্যাত ও প্রভাশালী ইসলামি ব্যাক্তিত্ব। ইসলামি মহাকাশের এক অনন্য উজ্জ্বল নক্ষত্র তিনি। তার লিখনী, বক্তৃতা, গবেষণা ঝরনার মতো প্রবাহিত করে জ্ঞান; সিঞ্চিত করে জ্ঞানবৃক্ষগুলোকে, তৃষ্ণা মেটায় জ্ঞানপিপাসু মুসাফিরদের। তার তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ ফুলের তোড়ার মতো সাজিয়ে দেয় প্রতিটি বিষয়কে—যে বিষয়ে আয়োজিত হয় সেমিনার। যার নসবনামা মিলিত হয়েছে ইলমবৃক্ষের প্রধান শাখা সাহাবিগণের সঙ্গে।

বিখ্যাত এই জ্ঞানতাপস ৩ অক্টোবর, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৫ শাওয়াল, ১৩৬২ হিজরিতে ভারতবর্ষের উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দ থানায়, দারুল উলুম দেওবন্দের পাশেই পৈত্রিক বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। মুফতি মুহাম্মাদ শফি রহ. তার পিতা। মুহাম্মাদ ইয়াসিন তার পিতামহ। তিনি তৃতীয় খলিফা উসমান রা.-এর বংশধর। এ কারণে তার নামের সঙ্গে উসমানি শব্দটি ব্যবহার করা হয়। তার বংশের আরেকটি উপাধি হলো মিয়াজি। তার পিতা ও পিতামহ উভয়ই দারুল উলুম দেওবন্দের শিক্ষক ছিলেন। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে তিনি কনিষ্ঠ।

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হলে তিনি তার পিতার সঙ্গে পাকিস্তানের

করাচিতে হিজরত করেন। হিজরতের পর শিক্ষালাভের জন্য বাড়ির কাছে মাদরাসা না থাকায় পরিবারেই তার প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি হয়েছিলো। উর্দু ভাষার প্রথম কিতাব হিসেবে মায়ের কাছে তিনি বেহেশতি জেওর ও সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া পড়েছেন। ফার্সি ভাষার জ্ঞান লাভ করেন পিতার কাছে।

১৩৭৯ হিজরিতে তিনি দাওরায়ে হাদিস পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হন। তার আগেই তিনি মাত্র ষোলো বছর বয়সে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফাজিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। দাওরায়ে হাদিসের পর দারুল উলুম করাচির ফতোয়া বিভাগে ভর্তি হন এবং পিতার তত্ত্বাবধানে ফিকহশাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করেন। একই সঙ্গে তিনি করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ, সিন্ধ (sindh) মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তার শিক্ষকদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন তার পিতা মুফতি মুহাম্মাদ শফি উসমানি—যিনি পাকিস্তানের প্রধান মুফতি ছিলেন। তার বুখারির শিক্ষক হলেন মুফতি রশিদ আহমাদ রহ.। তার অন্য শিক্ষকগণের মধ্যে রয়েছেন : ওয়ালি হাসান টঙ্কি, সলিমুল্লাহ খান, আকবর আলি, সাহবান মাহমুদ, শামসুল হক প্রমুখ রহ.। এ ছাড়াও তিনি মুহাম্মাদ ইদরিস কান্ধলবি, রশিদ আহমাদ লুধয়ানবি ও মুহাম্মাদ জাকারিয়া কান্ধলবির কাছ থেকে হাদিস বর্ণনার অনুমতি পেয়েছেন।

আত্মশুদ্ধি অর্জনে তিনি আশরাফ আলি থানবি রহ.-এর খলিফা আবদুল হাই আরিফির সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। মৃত্যুর দশদিন আগে আবদুল হাই আরিফি তাকে খিলাফত প্রদান করেন।

১৩৮০ হিজরিতে দারুল উলুম করাচিতে প্রাথমিক আরবি সাহিত্য পড়ানোর মধ্য দিয়ে তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন। বর্তমানে তিনি দারুল উলুম করাচির শায়খুল হাদিস ও ফতোয়া বিভাগের প্রধান মুফতি। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি আল-বালাগ নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। বর্তমানেও তিনি পত্রিকাটির সম্পাদক পদে বহাল আছেন। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি আল-বালাগ পত্রিকাটির ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করেন।

১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের শরিয়া আপিল বিভাগের বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং ২০০২ সাল পর্যন্ত বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন। জেনারেল জিয়াউল হকের শাসনামলে ১৯৮০ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানের ফেডারেল শরিয়া কোর্টে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। মুফতি তকি উসমানি তার বিচারপতি হওয়ার ঘটনা نقوش رفتگاں (নুকুশে রফতেগা) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাতে লিখেছেন—

'১৯৮০ সালে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে সফরে এলে কামরাঙ্গীরচরের নূরিয়া মাদরাসায় মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জি হুজুর রহ.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তার খেদমতে একদিন কাটিয়ে চলে যাওয়ার সময় তিনি আমাকে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক সাহেবের নামে একটি পত্র দিলেন। আমি পত্রটি পড়ার পর দেখলাম আমার ব্যাপারে কিছু কথা লেখা আছে। আমি হুজুরের কাছে নিবেদন করলাম, 'আমার ব্যাপারে শেষের একটি লাইন কেটে দিলে ভালো হয়।' হাফেজ্জি হুজুর তখন বললেন, 'চিঠি যেভাবে আছে থাকতে দাও এবং আমি যা বলছি তা করো। তুমি পত্রটি প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হককে পৌঁছে দেবে।' মোটকথা, হাফেজ্জি হুজুরের সুপারিশের ফলেই আমাকে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত করা হয়।' তিনি 'ইসলামি ফিকহ অ্যাকাডেমি জেদ্দা'র স্থায়ী সদস্য এবং করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য নির্বাচিত হন। তা ছাড়া তিনি 'পাকিস্তান বেফাকুল মাদারিস আল-আরাবিয়্যাহ'র প্রধান রোকন এবং 'মাদারেসে আরাবিয়্যাহ'র শুরার রোকন ছিলেন।

ইসলামি বিশ্বের যুগশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ শায়খ আবুল হাসান আলি নদবি রহ.-এর ইনতেকালের পর মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানিকে ইসলামি বিশ্বের পক্ষ থেকে 'মুফাক্কিরুল ইসলাম' ও 'শায়খুল ইসলাম' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বর্তমানে তিনি—

- শায়খুল হাদিস ও নায়েবে মুহতামিম : দারুল উলূম করাচি।
- চেয়্যারম্যন : আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড শরিয়া কাউন্সিল, ইসলামি অর্থনৈতিক অ্যাকাউন্টিং ও পরিদর্শন সংস্থা , বাহরাইন।

- স্থায়ী সদস্য : আন্তর্জাতিক ফিকহ্ অ্যাকাডেমি , জেদ্দা (ওআইসির অঙ্গপ্রতিষ্ঠান)।
- চেয়্যারম্যান : সেন্টার ফর ইসলামিক ইকোনমিক্স , পাকিস্তান (১৯৯১ থেকে)।

এত দায়িত্ব কাঁধে নিয়েও তিনি ইসলামি বিষয়ে আরবি, উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় রচনা করেছেন গ্রন্থের এক বিশাল ভান্ডার। যার প্রায় সবগুলো বই-ই অনূদিত হয়েছে অসংখ্য ভাষায়। তার কিছু প্রসিদ্ধ রচনা হলো—

আরবি রচনা : তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, বুহুস ফি কজায়া ফিকহিয়্যা মুআসারা, মা হিয়া আন-নাসরানিয়্যাহ, ফিকহুল বুয়ু, ইত্যাদি।

ইংরেজি রচনা : The Authority of Sunnah, The Rules of I'tikaf, What is Christianity? Easy Good Deeds, Perform Salaah Correctly, The Language of the Friday Khutba, Discourse on the Islamic Way of Life, Sayings of Prophet Muhammad, etc.

উর্দু রচনা : তাওজিহুল কুরআন, ইসলাম আওর সিয়াসি নাজরিয়াত (ইসলাম ও রাজনৈতিক মতবাদসমূহ), তাবসেরে (গ্রন্থ-সমালোচনা), জাহানে দিদাহ, দুনিয়া মেরে আগে, সফর দর সফর, আসান নেকিয়া, ইনআমুল বারি, ইসলাম আওর জিদ্দাদ পসন্দি, ইসলাহি খুতুবাত, ইত্যাদি।

সম্পাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে নেয়ামতের মাধ্যমে ভরপুর করেছেন এবং সকাল-সন্ধা তাঁর অনুগ্রহে চলার তাওফিক দান করেছেন। দুরুদ ও সালাম আমাদের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যিনি তাঁর সুস্পষ্ট হিদায়াতের মাধ্যমে আমাদের চলার পথকে মসৃণ করেছেন।

বর্তমান সময়ের প্রবীণ আলেম শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ)। তার ছায়া আল্লাহ আমাদের ওপর দীর্ঘায়িত করুন। তার লেখা ও কথা থেকে শুধু পাকিস্তানের জনসাধারণ নয় বরং পুরো বিশ্বই উপকৃত হচ্ছে। তিনি বর্তমান বিশ্বের এমন একজন আলেম যার প্রতিটি লেখা প্রতিটি বক্তব্য মুহূর্তের মধ্যেই সংরক্ষিত হয়ে যায়। মুসলিম উম্মার জন্য তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক বড়ো নেয়ামত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। তার অসংখ্য রচনা-গ্রন্থ সারা বিশ্বের আনাচে-কানাচে বিভিন্ন ইসলামি সংস্থা ও ফোরামের খেদমতে নিয়োজিত। তার আলোকিত কর্মযজ্ঞ ও সৃজন-সম্ভারের দীপ্তিময় তালিকা পেশ করা আসলে দুষ্কর।

যুগশ্রেষ্ঠ মহান এ আলেমের অন্যতম সেরা একটি গ্রন্থ হচ্ছে উর্দু ভাষায় ৬ খণ্ডে রচিত ফিকহি মাকালাত। ফিকহি মাকালাত অর্থ হচ্ছে ফিকহি রচনাবলি। যা উলামা মহলে ব্যাপক সমাদৃত। ৫৩টি প্রবন্ধ ও রচনা

সন্নিবেশিত হয়েছে এই ৬ খণ্ডের গ্রন্থটিতে। ইবাদত, মুআমালাত, মুআশারাত, রাজনীতি, অর্থনীতিসহ বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধসম্বলিত এই গ্রন্থটি পাঠক মহলে ব্যাপক সমাদৃত; বিশেষ করে আলেম-পরিমণ্ডলে। তার প্রবন্ধগুলো যেমন বর্তমান সময়ের আধুনিক মাসআলার সমাধান দিচ্ছে তেমনই সেগুলোতে পূর্ববর্তী ফকিহ এবং বর্তমান ফকিহদের বক্তব্যের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয়েছে এবং পূর্ববর্তী ফকিহদের বক্তব্যকে যুগোপযোগী করে উপস্থাপন করা হয়েছে। ফিকহি মাকালাত গ্রন্থটি মূলত মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ)-এর স্বরচিত কোনো কিতাব নয়। এটি তার বিভিন্ন আরবি-ইংরেজি প্রবন্ধ ও বিভিন্ন সেমিনারে দেওয়া ভাষণের অনুলিপি যার অধিকাংশই পাকিস্তানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম করাচির বিশিষ্ট শিক্ষক আবদুল্লাহ মায়মান অনুবাদ করেছেন। অধিকাংশ প্রবন্ধ শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ)-এর লেখা আরবি কিতাব বুহুস ফি কজায়া ফিকহিয়্যা মুআসারার প্রবন্ধগুলোর উর্দু অনুবাদ। কোনো কোনোটি শায়খের লেখা কালজয়ী গ্রন্থ তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম থেকে নেওয়া। কোনো মাকালা হজরতের উর্দু ফাতাওয়ার কিতাব ফাতাওয়ায়ে উসমানি থেকে নেওয়া। কোনো মাকালা শায়খের ইংরেজি প্রবন্ধের তরজমা আবার কোনো কোনোটি শায়খের সেমিনারে দেওয়া উর্দু বক্তব্যের অনুলিপি।

শায়খের কিতাবের প্রতি আমার সবসময় আলাদা একটি ঝোঁক ছিলো। কিন্তু মাকতাবাতুল ইসলাম প্রকাশিত ফিকহি মাকালাতের পূর্ববর্তী সংস্করণটি মূল গ্রন্থের সঙ্গে মিলিয়ে অধ্যয়নের সময় অনেক ধরনের অসংগতি আমার নজরে পড়ে । এরই মধ্যে একদিন মাকতাবাতুল ইসলামের পরিচালক বিশিষ্ট আলেম মুঈনুদ্দীন আহমাদ গালিব ভাই আমাকে এই কিতাবটি পুনঃসম্পাদনার দায়িত্ব দেন। আমারও আগ্রহ ছিলো বর্তমান সংস্করণে থাকা ভুল-ত্রুটিগুলো সংশোধন ও পরিমার্জন করে পুনরায় বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য গ্রন্থটি সহজবোধ্য করে তুলে ধরার। ফলে দ্বিতীয় মুদ্রণের আগে আহমাদ গালিব ভাইয়ের কথা আমি সাদরে গ্রহণ করি এবং বিভিন্ন সময়ে দীর্ঘ সময় ব্যয় করে কিতাবটির অধিকাংশ খণ্ড মূল উর্দু গ্রন্থের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার পাশাপাশি এর

আরবি উৎসগ্রন্থও সামনে রেখে নজরে সানি করি। এতে আমার দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়। কারণ প্রথম সংস্করণে এমন অনেক ভুল ছিলো যেগুলো মাসআলার মূল মাফহুম বুঝতেও অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে দিতো। সেই সঙ্গে আমি যেহেতু মূল উৎস আরবি গ্রন্থ থেকেও মিলিয়ে দেখেছি এজন্য উর্দু অনুবাদের মধ্যেও এমন কিছু বিষয় পেয়েছি যা মূল উৎস আরবি গ্রন্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এজন্য আমি সেই জায়গাগুলোও সংশোধন করে দিয়েছি। অনেক উদ্ধৃতিও সংশোধন করেছি। দু-একটি মাসআলার ক্ষেত্রে এমন হয়েছে যে, শায়খুল ইসলাম তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) একসময় পূর্বে একটি মত বলেছিলেন কিন্তু বর্তমান সময়ে এসে সেই সময়ে লিখিত প্রবন্ধের মত থেকে ফিরে এসেছেন—এমন স্থানগুলোও চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে।

প্রিয় পাঠক, সম্পাদনায় যা কিছু সুন্দর ও পরিমার্জিত হয়েছে তা সবই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। তিনি সকল প্রশংসার অধিকারী। আমি আমার সাধ্যমত পূর্ববর্তী এডিশনের ভুলগুলো সংশোধন করার চেষ্টা করেছি। তারপরও যে-কোনো ধরনের ভুল থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। পাঠকের কাছে একান্ত অনুরোধ, আপনাদের দৃষ্টিতে যদি এমন কোনো ভুল ধরা পড়ে আপনারা আমাদেরকে তা জানাবেন আমরা পরবর্তী সংস্করণে সেগুলো সংশোধন করে দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

—(মুফতি) রেজওয়ান বিন রায়হান

শুক্রবার, ২৮ জানুয়ারি ২০২২ খ্রি.

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর 'ফিকহি মাকালাত—فقہی مقالات' কিতাবটির ছয় খণ্ডের অনুবাদ এখন পাঠকের হাতে। প্রায় দু-বছর আগে কিতাবটির অনুবাদ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর প্রত্যাশিত সময়ের আগেই অনুবাদ সম্পন্ন হয়। কিন্তু পরিমার্জনা ও সম্পাদনার সময় কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক নষ্ট হয়ে যাওয়ায় প্রকাশ বিলম্বিত হয়। কিতাবটির ছয়টি খণ্ডে স্থান-পাওয়া প্রবন্ধগুলোর রচয়িতা একজন বিশ্ববিখ্যাত আলেম। তার সম্পর্কে কিঞ্চিত ধারণা পাওয়া যাবে এ খণ্ডে বিধৃত লেখক পরিচিতি থেকে। এ কিতাবের অনুবাদ করেছেন তিনজন দক্ষ মুফতি। তারা হলেন, মুফতি ইলিয়াস বিন আলাউদ্দিন, মুফতি আবদুল কাইয়ুম শেখ ও মুফতি ইসমাইল। আধুনিক সমস্যাবলির ইসলামি সমাধান সম্বলিত এ কিতাব যে-কোনো পাঠকের জন্য অত্যন্ত উপকারী হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। এ কিতাবের এই প্রথম সংস্করণে অনুবাদ, কম্পোজ ও মুদ্রণের ক্ষেত্রে কিছু ভুল-অসংগতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে সেগুলো অবশ্যই সংশোধনের প্রচেষ্টা থাকবে ইনশাআল্লাহ। এ ছাড়া যেসব মাসআলায় শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) 'রুজু' করবেন অর্থাৎ মত পরিবর্তন করবেন আমরা সেগুলোও

যথাযথভাবে প্রকাশ করবো ইনশাআল্লাহ্। পরবর্তী সংস্করণে কীভাবে এর প্রকাশ আরও উন্নত-উৎকৃষ্ট করা যায় সে বিষয়ে সম্মানিত পাঠকগণের নিকট আমরা পরামর্শ চেয়ে রাখলাম। এবারের প্রকাশে যারা মেহনত করেছেন মহান আল্লাহ্ তাদের কবুল করুন এবং উত্তম প্রতিদান দান করুন।

—হাফেজ কুতুবুদ্দিন আহমাদ
সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রি.

মুফতি মিজানুর রহমান সাঈদ[১] (হাফিজাহুল্লাহ)-এর অভিমত

হামদ ও সালাতের পর। বর্তমান বিশ্বের সাড়া জাগানো এক মহান ইসলামি ব্যক্তিত্বের নাম শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ)। অধুনা যুগে সৃষ্ট বহু শরয়ি সমস্যার যুক্তি ও তথ্যনির্ভর সমাধান পেশ করে কুরআন-সুন্নাহর বিধিবিধানকে চিরন্তন প্রমাণ করার মাধ্যমে গোটা মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে যারা অপূর্ব অবদান রেখে গেছেন ও যাচ্ছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি। আরবি, উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় হাদিস, উসুলে হাদিস, তাফসির, উসুলে তাফসির, ইতিহাস, ফিকহ ও ফতোয়া কিংবা উসুলে ইফতা, তাসাউফ, রাজনীতি, বিশেষ করে অর্থনীতির ক্ষেত্রে তার সাড়া-জাগানো গবেষণামূলক রচনা ও প্রবন্ধের সমাহার বিশ্ব-মুসলিমকে জাগ্রত করে তুলেছে এবং আলেম-সমাজে তা অকুণ্ঠ সমাদৃতি লাভ করেছে। অসাধারণ খেদমত ও প্রতিভাগুলো তাকে সালাফে

---

[১] মুফতি মিজানুর রহমান সাঈদ (হাফিজাহুল্লাহ) শাহ আবরারুল হক রহ.-এর বিশিষ্ট খলিফা, শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানির অন্যতম শাগরিদ, বর্তমান বাংলাদেশের খ্যাতিমান ফকিহ, শায়খ জাকারিয়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার ঢাকা'র প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও শায়খুল হাদিস।—সম্পাদক

সালিহিনের সাচ্চা তরজুমান হিসেবে বিজ্ঞ মনীষীদের প্রশংসিত ও শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত করেছে। গর্ব করার মতো নিজের কোনো গুণ থাকলে আমি বলবো, একমাত্র এটিই আছে যে, তিনি আমার খাস উসতাজ এবং বর্তমানে তিনিই আমার শায়খ ও মুরুব্বি।

তার এসব ইলমি গবেষণামূলক রচনা শুধু স্বদেশেই নয় আরব-আজম, তথা পুরো বিশ্বে মুসলিম জাতির জন্য অতি মূল্যবান ইলমি পাথেয়। ইলম ও প্রজ্ঞার সব ময়দানেই তার পদচারণা দৃপ্ত ও সৃজন-মুখর। বিশেষ করে অর্থনীতি ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য শাস্ত্রে তার অবদান অপূর্ব ও ঈর্ষণীয়। তাকে বর্তমান যুগের ইলমি জগতের মুজাদ্দিদ বলা হলে অতিরঞ্জন হবে না মোটেও। কেউ যদি বর্তমান পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে ইসলামি শরিয়তের চিরন্তন বিধানের বাস্তব প্রয়োগের খোঁজ নিতে চায় তাহলে শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ)-এর গবেষণামূলক কিতাবাদিই পথ প্রদর্শক হিসেবে যথেষ্ট।

শায়খুল ইসলাম-এর বহুমুখি খেদমতের মধ্য থেকে শুধু অর্থনীতি-জগতের খেদমতগুলোকে বিবেচনা করা হলে নির্দ্বিধায় এ কথা বলা যায়—তিনি বর্তমান যুগের অর্থনীতি বিষয়ে ইসলামি নীতির আমলি প্রয়োগ পেশ করার মাধ্যমে যে খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তা বাস্তবে গোটা মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে ফরজে কিফায়া আদায় করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ! এটি শুধু আমার অন্তরে প্রতিভাত বিষয় নয়; বরং এর স্বীকারোক্তি অনারবসহ গোটা আরবের আলেমগণও দিয়েছেন। তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম সম্পর্কে অভিমতগুলোই এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

'ফিকহি মাকালাত' (فقہی مقالات) হলো, ইসলামি অর্থনীতি ও যুগোপযুগী জাতির বিভিন্ন আধুনিক বিষয়ের ওপর শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ)-এর গবেষণামূলক সমাধানের অসাধারণ কিছু প্রবন্ধ ও রচনার শিরোণাম। ছয় খণ্ডবিশিষ্ট এই সংকলনটিকে ঢাকার প্রসিদ্ধ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'মাকতাবাতুল ইসলাম'-এর উদ্যোগে বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষীদের উপকারার্থে প্রকাশ করা হচ্ছে শুনে আমি অত্যন্ত

আনন্দিত। ইতোপূর্বে এর আংশিক অনুবাদ হলেও পূর্ণ ছয়খণ্ডের অনুবাদ হয়তো এটিই প্রথম । যার পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ আমি পড়ে দেখেছি। মাশাআল্লাহ! বিজ্ঞ অনুবাদক তার মেধা ও প্রতিভা দিয়ে শায়খুল ইসলাম-এর অভিপ্রায়ের সফল বাস্তবায়ন ঘটিয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস।

মহান আল্লাহ বিশাল এ খেদমতটিকে কবুল করুন এবং এর মাধ্যমে তালিবুল ইলমগণ শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ)-এর রুহানি ফয়েজ দ্বারা উপকৃত হতে থাকুক। এর সঙ্গে বাংলাদেশের আলেম ও মুসলিম জনগোষ্ঠী ইসলামি অর্থনীতি-পরিমণ্ডলে এসব গ্রন্থের সাহায্যে যুগান্তকারী অবদান রাখতে সক্ষম হোক। আমিন।

—(মুফতি) মিযানুর রহমান সাঈদ
সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রি.

অনুবাদকের কথা

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ)-এর ফিকহি মাকালাত কিতাবটি কারও কাছে অপরিচিত নয়। বর্তমান বিশ্বের নতুন মাসআলাগুলোর ইসলামি সমাধান ও আধুনিক দর্শনের মোকাবিলায় কুরআন-সুন্নাহর সঙ্গে যুক্তির আলোকে ইসলামি দর্শন উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তার ভূমিকাকে বিশেষ শিরোনামে উল্লেখ না করলে একজন আহলে ইলমের সঙ্গে অত্যন্ত বেইনসাফি করা হবে। এ কথা আজ দৃপ্ত কণ্ঠে বলা যায় শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সন্তানকে যেমন মুজাদ্দিদ করে পাঠানো হয়, তেমনি করে শায়খ মুফতি তকি উসমানি-এর আবির্ভাব ঘটেছে।

হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলি থানবি রহ.-কে এমনই এক ক্রান্তিকালে পাঠানো হয়েছিলো, যখন শিরকাত ও আধুনিক বিষয়ে নিত্যনতুন সমস্যার সমাধানের প্রয়োজন ছিলো। যে কারণে লেনদেন বিষয়ক ফিকহি মাসআলায় তার ইজতিহাদ আমাদেরকে ভবিষ্যতের রাস্তা দেখিয়েছে। হাকিমুল উম্মতের বিদায়ের পর আধুনিক সমস্যা যখন আমাদেরকে ঘিরে ফেলেছে, তখন তারই অনুসারি শায়খুল ইসলাম মুফতি তকি উসমানি শায়খের পথ ধরে ইসলাম-বিরোধীদের দর্শন ও যুক্তির মোকাবিলায় ইসলামি দর্শন ও সমাধান নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। যা আমাদের জন্য বিশেষ রহমত।

ফিকহি মাকালাতের অধিকাংশ মাকালা আরবি ও ইংরেজিতে রচিত হওয়ায় মাওলানা আবদুল্লাহ মায়মান সেগুলোর অনুবাদ করেছেন। মাকালাগুলোর অধিকাংশ 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি'-এর সেমিনারসহ অন্যান্য সেমিনারে উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিলো।

মহান আল্লাহর দরবারে অশেষ শুকরিয়া যে, লেখকের মতো মহান ব্যক্তির কিতাবের খেদমতে আমার মতো ব্যক্তিকে তিনি কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। ফিকহি মাকালাতের অধিকাংশ মাকালা যেহেতু আরবি মাকালার অনুবাদ, তাই অনুবাদের ক্ষেত্রে আরবি মাকালার অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। আরবি মাকালার অনুসরণ করায় অনুবাদের কারণে আসল ঘ্রাণ হারিয়ে যাওয়ার অভিযোগ থেকে কিছুটা হলেও দূরে থাকা যাবে। তারপরও ভুল হওয়া সাধারণ মানুষের বৈশিষ্ট্য। তাই বিজ্ঞ পাঠকের অনুসন্ধানি চোখে কোনো ভুল ধরা পড়লে আশাকরি সেটি আমাদেরকে অবগত করে এই ইলমি খেদমতে অংশ নেবেন।

পরিশেষে মাকতাবাতুল ইসলাম পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। তাদের ইলমি পিপাসা ও সাহসী ভূমিকা আমার পাথেয় হিসেবে কাজ করেছে। সেই সঙ্গে বিভিন্নভাবে যারা ফিকহি মাকালাত সিরিজ প্রকাশে অংশ নিয়েছেন, তাদের জন্য দোয়া করি। মহান আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমিন।

—(মুফতি) ইলিয়াস বিন আলাউদ্দীন

১ জিলহজ, ১৪৩৬ হি.

প্রাক্‌কথন

ফিকহি মাকালাতের প্রথম খণ্ড এখন আপনাদের হাতে। এখানে মূলত সেসব মাকালার অনুবাদ করা হয়েছে, যেগুলো শায়খ মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি 'ইসলামি ফিকহ্ অ্যাকাডেমি'র জন্য আরবি ভাষায় লিখেছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে এ মাকালাগুলো ইসলামি ফিকহ্ অ্যাকাডেমির পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে 'মাকতাবায়ে দারুল উলুম করাচি-১৪'-এর পক্ষ থেকে কিতাব আকারে 'বুহুস ফি কজায়া ফিকহিয়্যা মুআসারা' নামে প্রকাশ করা হয়েছে।

মাকালাগুলো যেহেতু এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রচিত, যেগুলো আলেম, ছাত্র ও সাধারণ মানুষের সামনে আসছে; ফলে সাধারণ মানুষ এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে আলেমদের কাছে জিজ্ঞেস করছে এবং এগুলো যেহেতু আরবি ভাষায় রচিত, তাই সাধারণের জন্য তা থেকে উপকৃত হওয়া কঠিন ছিলো। এ কারণে এই অধম মহান আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে কয়েক বছর আগে (উর্দু ভাষায়) এগুলোর অনুবাদের কাজ শুরু করি। আলহামদুলিল্লাহ! কিছু মাকালার অনুবাদ শেষ হয়েছে। আর শায়খ মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি তার মূল্যবান সময় দিয়ে কিছু মাকালার ওপর পুনর্দৃষ্টি দিয়েছেন। আর কিছু মাকালার ওপর মুহাম্মাদ আশরাফ তার মূল্যবান সময় দিয়েছেন। অবশ্য একটি মাকালা তথা 'নিরেট স্বত্বের বিক্রি' নামক মাকালাটি আমার অনুবাদ নয়। বরং

হিন্দুস্তানের একজন বিজ্ঞ আলেম মাওলানা আতিক আহমাদ বাস্তাবি সাহেব করেছেন। তবে সেটিকে আমি নতুনভাবে বিন্যাস করেছি। অনুরূপভাবে ‘শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়’ শিরোনামের প্রবন্ধটি আসলে কোনো মাকালা নয়। বরং সেটি হলো শায়খ মুফতি মুহাম্মদ তকি উসমানি-এর একটি বক্তব্য। যেটি বাইতুল মুকাররম জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত একটি ব্যবসায়ী সেমিনারে আলোচনা করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে সেটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং শায়খ মুফতি মুহাম্মদ তকি উসমানি সেটিকে দ্বিতীয়বার দেখেছেন। মহান আল্লাহ তাকে কবুল করুন এবং তার কাজকে ইখলাসের সঙ্গে কবুল করুন। আর দুনিয়া ও আখেরাতে তার উত্তম প্রতিদান দিন। আমিন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ মায়মান

দারুল উলুম করাচি-১৪

৩-৫-১৪১৫ হি.

এই খণ্ডে যা আছে

• কাগুজে নোট এবং কারেন্সির হুকুম

এটি আরবি মাকালা 'احكام الأوراق النقدي'-এর অনুবাদ। ১৩০৯ হিজরির জুমাদাল উলা মাসের ১-৬ তারিখ মোতাবেক ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ১০-১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত কুয়েতে অনুষ্ঠিত 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি'-এর পঞ্চম অধিবেশনে এটি উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তী সময়ে 'বুহুস ফি কজায়া ফিকহিয়্যা মুআসারা'-এর প্রথম খণ্ডে এটি প্রকাশ করা হয়।

• কারেন্সির ক্রয়ক্ষমতা এবং তা সূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা

এটি আরবি মাকালা 'مسئلة تغير قيمة العملة وربطها بقائمة الأسعار'-এর অনুবাদ। ১৩০৯ হিজরির জুমাদাল উলা মাসের ১-৬ তারিখ মোতাবেক ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ১০-১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত কুয়েতে অনুষ্ঠিত 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি'-এর পঞ্চম অধিবেশনে এটি উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তী সময়ে 'বুহুস ফি কজায়া ফিকহিয়্যা মুআসারা'-এর প্রথম খণ্ডে এটি প্রকাশ করা হয়।

- কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করা

এটি আরবি মাকালা 'أحكام البيع بالتقسيط'-এর অনুবাদ। ১৪১০ হিজরির শাবান মাসের ১৮–২৩ তারিখ মোতাবেক ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের ১৩-২০ মার্চ পর্যন্ত সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি'-এর ষষ্ঠ অধিবেশনে এটি উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তী সময়ে 'বুহুস ফি কজায়া ফিকহিয়্যা মুআসারা'-এর প্রথম খণ্ডে এটি প্রকাশ করা হয়।

- শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়

এটি কোনো আরবি মাকালা নয়। এটি শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ)-এর একটি বক্তব্য। বাইতুল মুকাররাম জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত একটি ব্যাবসায়ি সেমিনারে তিনি এ বক্তব্যটি উপস্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে সেটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং শায়খুল ইসলাম নিজে তা দ্বিতীয়বার দেখেছেন। ব্যাপক উপকারিতার প্রতি লক্ষ করে এটিকে মাকালার অংশ করে প্রকাশ করা হলো।

- নিরেট স্বত্ব ক্রয়-বিক্রয় করা

এটি আরবি মাকালা 'بيع الحقوق المجردة'-এর অনুবাদ। ১৩০৯ হিজরির জুমাদাউল উলা মাসের ১৬ তারিখ মোতাবেক ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ১০-১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত কুয়েতে অনুষ্ঠিত 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি'-এর পঞ্চম অধিবেশনে এটি উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তী সময়ে 'বুহুস ফি কজায়া ফিকহিয়্যা মুআসারা'-এর প্রথম খণ্ডে এটি প্রকাশ করা হয়।

- পশ্চিমা দেশসমূহের কিছু মাসআলা

এগুলো পশ্চিমা দেশের কিছু সমস্যা কেন্দ্রিক প্রশ্নের উত্তর। ১৪০৭ হিজরির সফর মাসের ৮–১৩ তারিখ মোতাবেক ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের

১১-১৬ অক্টোবর পর্যন্ত তারিখে জর্ডানের রাজধানী আম্মানে অনুষ্ঠিত 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি'-এর তৃতীয় অধিবেশনে উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তী সময়ে 'বুহুস ফি কজায়া ফিকহিয়্যা মুআসারা'-এর প্রথম খণ্ডে এটি প্রকাশ করা হয়।

- ইসলামি ব্যাংকের কিছু মাসআলা

এটি জেদ্দার ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকের পক্ষ থেকে 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি'-এর কাছে পেশকৃত কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর। ১৪০৬ হিজরির রবিউস সানি মাসের ১০-১৬ তারিখ মোতাবেক ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২২-২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি'-এর দ্বিতীয় অধিবেশনে এটি উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তী সময়ে 'বুহুস ফি কজায়া ফিকহিয়্যা মুআসারা'-এর প্রথম খণ্ডে এটি প্রকাশ করা হয়।

সূচি

কাগুজে মুদ্রার বিধিবিধান-৩৫

কাগুজে নোটের ক্রয়ক্ষমতা এবং সেটিকে
সূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা-৬৭

কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করা-৯৯

শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের শরয়ি বিধান-১৫৫

নিরেট স্বত্ব ক্রয়-বিক্রয় করা-১৭৩

পশ্চিমা দেশগুলোর জন্য কিছু আধুনিক
মাসআলা ও তার সমাধান-২৪৬

ইসলামি ব্যাংকিং বিষয়ে কিছু মাসআলা ও
তার সমাধান-২৮৩

কাগুজে মুদ্রার বিধিবিধান ৩৭
ব্যাংক-নোটের ফিকহি অবস্থান ৩৭
বিশ্বে মুদ্রাব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ৩৯
আলোচিত মাসআলায় আমাদের অভিমত ৫০
কাগুজে নোট এবং জাকাত ৫৫
কাগুজেমুদ্রাকে কাগুজেমুদ্রার বিনিময়ে লেনদেন করা ৫৫
দেশীয় কাগুজে মুদ্রার বিনিময় ৫৫
এই মাসআলাতে অগ্রগণ্য অভিমত ৫৯
বিভিন্ন রাষ্ট্রের কারেন্সির মধ্যে বিনিময় ৬২
পরস্পরে মুদ্রার দখল বুঝে না নিয়েই
অন্যের কাছে তা বিক্রি করে দেওয়া ৬৪

কাগুজে নোটের ক্রয়ক্ষমতা এবং
সেটিকে সূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা ৬৯
প্রথমত : মূল মাসআলাটির বিবরণ ৬৯
মুদ্রা হ্রাসের সময় ১০০ টাকার পণ্য সামগ্রী ৭০
মুদ্রাস্ফীতির সময় ১০০ টাকার পণ্য সামগ্রী ৭১
দ্বিতীয়ত : ঋণকে মূল্যসূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা ৭২
মূল্যসূচক তৈরির পদ্ধতি এবং কাগুজে
মুদ্রার মূল্য নির্ধারণে তার ব্যবহার ৮০
পণ্যসামগ্রীর ঝুড়ি ৮১
তৃতীয়ত : নোটের মূল্য পরিশোধে
ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর অভিমত ৮৫
সিদ্ধান্তসমূহ ৯৩
পঞ্চমত : বেতনকে মূল্যসূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা ৯৪

কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করা ১০১

প্রথম আলোচনা : কিস্তিতে বিক্রয়ের বাস্তবতা ১০১
দ্বিতীয় আলোচনা : বাকির কারণে মূল্য বৃদ্ধি করা ১০২
তৃতীয় আলোচনা : ঋণকে গ্যারান্টিযুক্ত করা এবং তার বিভিন্ন পদ্ধতি ১০৬
চতুর্থ আলোচনা : দ্রুত ঋণ পরিশোধের শর্তে কিছু অংশ কমিয়ে দেওয়া ১২০
পঞ্চম আলোচনা : কিস্তি পরিশোধে টালবাহানা করার কারণে ঋণকে নগদে পরিণত করা ১৩৫
ষষ্ঠ আলোচনা : টালবাহানার কারণে জরিমানা আরোপ করা ১৩৭
সপ্তম আলোচনা : ঋণীর মৃত্যুর কারণে ঋণ নগদে পরিণত হওয়া ১৪৯

শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের শরয়ি বিধান ১৫৭

শেয়ারের সূচনা ১৫৭
শেয়ারের বাস্তবতা কী? ১৫৮
নতুন কোম্পানির শেয়ারের হুকুম ১৫৯
ক্রয়-বিক্রয়ের বাস্তবতা ১৫৯
চারটি শর্তের সঙ্গে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েজ ১৬০
শেয়ার ক্রয়ের দুটি উদ্দেশ্য ১৬৭
ডিফারেন্স সমান করে নেওয়া জুয়ার অন্তর্ভুক্ত ১৬৮
শেয়ার ডেলিভারি হওয়ার আগে বিক্রি করে দেওয়া ১৬৮
শেয়ার কবজা করা ১৬৯
ঝুঁকি পরিবর্তন হওয়াই যথেষ্ট ১৬৯
বদলার লেনদেন করা জায়েজ নেই ১৭০
শেয়ারের জাকাত ১৭১

নিরেট স্বত্ব ক্রয়-বিক্রয় করা ১৭৫

স্বত্বের প্রকারভেদ ১৭৬
প্রথম আলোচনা : শরয়ি স্বত্ব ১৭৮
দ্বিতীয় আলোচনা : প্রচলিত হক ১৮৪

হুকুকে উরফিয়া বা সামাজিক স্বত্বের প্রকার ১৮৪
এসকল ক্ষেত্রে তিন ইমামের মাজহাব ১৮৫
অগ্রাধিকার স্বত্ব ২০৯
চুক্তি স্বত্ব ২১৪
বাড়ি ও দোকানের পজিশন ২২৩
প্রচলিত পজিশনের বিকল্প পদ্ধতি ২৩২
স্বত্বের বিনিময় নেওয়ার ক্ষেত্রে শরয়ি হুকুমের সারাংশ ২৩৪
ব্যবসায়িক নাম বা ট্রেডমার্ক বিক্রি করা ২৩৫
ট্রেড লাইসেন্স ২৩৯
আবিষ্কার ও প্রকাশনা স্বত্ব ২৪০
পরিশিষ্ট ২৪৪

পশ্চিমা দেশগুলোর জন্য কিছু আধুনিক মাসআলা ও তার সমাধান ২৪৬
অমুসলিম দেশে নাগরিকত্ব নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করা ২৪৬
অমুসলিম দেশে সন্তান প্রতিপালন করা ২৫০
মুসলিম নারীর অমুসলিম পুরুষের সঙ্গে বিয়ে ২৫২
মুসলিমদের লাশ অমুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা ২৫৪
মসজিদ বিক্রি করা ২৫৪
শরয়ি মাহরাম ছাড়া মহিলাদের সফর করা ২৬৩
অমুসলিম দেশে নারীদের একাকি বসবাস করা ২৬৪
অমুসলিম দেশে কাজের প্রয়োজনে মহিলাদের হাত ও মুখ খোলা রাখার বিধান ২৬৫
যেসব হোটেলে মদ ও শূকরের গোশত বিক্রি করা হয় সেখানে কাজ করা ২৬৫
অ্যালকোহল মেশানো ওষুধের হুকুম ২৬৯
শূকর থেকে তৈরি প্রসাধনী ও জেলাটিন ব্যবহারের হুকুম ২৭১
মসজিদে বিয়ের আয়োজন করা ২৭২
খ্রিস্টানদের নামে সন্তানের নাম রাখা ২৭২
স্ত্রীকে সাময়িক সময় রাখার গোপন নিয়তে বিয়ে করা ২৭৩

সাজসজ্জা করে মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে যাওয়া ২৭৫
পরপুরুষের সঙ্গে মুসলিম নারীদের মুসাফাহা করা ২৭৬
নামাজের জন্য গীর্জা ভাড়া নেওয়া ২৭৬
আহলে কিতাব (ইহুদি খ্রিস্টানদের)
জবাইকৃত পশু খাওয়ার হুকুম ২৭৭
নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড হয় এমন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা ২৭৮
অমুসলিম রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে মুসলিমদের চাকরি করা ২৭৯
মুসলিম ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক খ্রিস্টানদের
উপাসনালয়ের ডিজাইন করা ২৮০
চার্চের জন্য চাঁদা দেওয়া ২৮০
স্বামী অথবা পিতার মদ বিক্রির মাধ্যমে উপার্জনের
ক্ষেত্রে স্ত্রী ও বাচ্চাদের হুকুম ২৮১
ব্যাংকের মাধ্যমে জমি ইত্যাদি ক্রয় করা ২৮২

ইসলামি ব্যাংকিং বিষয়ে কিছু মাসআলা ও তার সমাধান ২৮৫
ব্যাংকের পক্ষ থেকে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে যে খরচ হয়
সে খরচ বাবদ সার্ভিসচার্জ নামে ঋণগ্রহিতা থেকে একটি
নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ উসুল করা ২৮৫
ব্যাংকের পক্ষ থেকে গ্রাহককে প্রথমে পণ্য ক্রয়ের উকিল
নির্ধারণ করার পর সেটি তার কাছে ভাড়া দেওয়া
এবং শেষ পর্যায়ে তার কাছেই সেটি বিক্রি করা ২৯৩
উত্তরের সারাংশ ৩০৪
ইসলামি উন্নয়নমূলক ব্যাংকগুলো তাদের সদস্য
দেশের সঙ্গে বাকি লেনদেন করা ৩০৫
ব্যাংক কর্তৃক তার সদস্য দেশগুলোর সঙ্গে বাকিতে
ও কিস্তিতে মুরাবাহা লেনদেন করা ৩০৯
অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহের আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলো
থেকে প্রাপ্ত সুদি অর্থ ব্যবহার করা ৩১২
লেটার অফ ক্রেডিট ইস্যু করতে ব্যাংকের পারিশ্রমিক
বা কমিশন নেওয়া ৩১৪

কাগুজে মুদ্রার বিধিবিধান

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

‘কাগুজে মুদ্রার বিধিবিধান’ এ প্রবন্ধটি আরবি মাকালা ‘أحكام الأوراق النقدية’-এর অনুবাদ। ১৪০৯ হিজরির জুমাদাল উলা মাসের ১-৬ তারিখ মোতাবেক ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ১০-১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত কুয়েতে অনুষ্ঠিত ‘মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি’-এর পঞ্চম অধিবেশনে এটি উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তী সময়ে ‘বুহুস ফি কজায়া ফিকহিয়্যা মুআসারা’-এর প্রথম খণ্ডে এটি প্রকাশ করা হয়।

—আবদুল্লাহ মায়মান

মাকতাবাতুল ইসলাম মাকতাবাতুল ইসলাম

কাগুজে মুদ্রার বিধিবিধান

বর্তমানে সকল ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলে কাগুজে মুদ্রা একটি বিনিময় মাধ্যম হিসেবে ছড়িয়ে পড়েছে। এই আলোচনায় আমি কাগুজে মুদ্রার বাস্তবতা, ইতিহাস এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শরয়ি বিধান তুলে ধরার ইচ্ছে করেছি। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি যে, তিনি আমাকে তার সন্তুষ্টি মোতাবেক সঠিক বিষয়ের প্রতি পথ প্রদর্শন করবেন। তিনিই তাওফি কদাতা ও সাহায্যকারী। আমি এই আলোচনাকে দুই অধ্যায়ে ভাগ করেছি।

প্রথম অধ্যায় : কাগুজে মুদ্রার বিধিবিধান।

দ্বিতীয় অধ্যায় : মুদ্রার মূল্যের ওঠানামা ও মূল্যসূচকের সঙ্গে এর সম্পর্ক।

১. ব্যাংক-নোটের ফিকহি অবস্থান

ব্যাংক-নোট সম্পর্কে শাখাগত বিস্তারিত আলোচনা করার আগে আমাদের জন্য তার বাস্তবতা জানা আবশ্যক। সেটি কি ঋণের প্রমাণপত্র? না কি প্রচলিত মুদ্রা?

যাদের অভিমত অনুযায়ী এই নোটগুলো সেই ঋণের প্রমাণপত্র যা সেগুলো ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান ব্যাংকের দায়িত্বে রয়েছে। তাদের অভিমত অনুযায়ী এই নোটগুলো মুদ্রা বা পণ্যের কোনোটিই নয়। বরং শুধু একটি প্রমাণপত্রের ভূমিকায় রয়েছে, যেটিকে ঋণী ঋণদাতার জন্য ইস্যু করেছে। যেন ঋণদাতা

যখন ইচ্ছে করবে তখন এটির মাধ্যমে তার ঋণ উসুল করতে পারে। এ কারণে তাদের অভিমত অনুযায়ী যে ব্যক্তি এই নোটগুলোর কোনো একটি অন্যকে দেবে, তার অর্থ এই নয় যে, সে তাকে কোনো পণ্য দিলো। বরং এই নোটকে প্রমাণপত্র হিসেবে ইস্যুকারী ঋণীর কাছে সে তাকে হাওয়ালা করে দিলো। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ফিকহি হাওয়ালার মাসআলা প্রযোজ্য হবে। কাজেই যেসব ক্ষেত্রে হাওয়ালা করা জায়েজ আছে, সেখানে পাওনা আদায়ের জন্য এগুলোকে হাওয়ালা করা জায়েজ আছে। আর যদি এই নোটগুলোর বিপরীতে স্বর্ণ-রুপা থেকে থাকে, (অর্থাৎ তার বিপরীতে ব্যাংকে থাকা স্বর্ণ-রুপার প্রমাণপত্র হিসেবে সেগুলো ইস্যু করা হয়ে থাকে।) তাহলে তার বিনিময়ে স্বর্ণ-রুপা ক্রয় করা জায়েজ নেই। কারণ স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে বা রুপাকে রুপার বিনিময়ে লেনদেন করাকে ফিকহি পরিভাষায় 'বায়ে সরফ' বলে। বায়ে সরফের মধ্যে চুক্তির মজলিসেই উভয় বিনিময়কে (পণ্য ও মূল্য) কবজা করা শর্ত। আর এই প্রমাণপত্রগুলো কবজা করা তার বিপরীতে থাকা স্বর্ণ-রুপা কবজা করা নয়। বিধায় 'বায়ে সরফ' জায়েজের জন্য চুক্তির মজলিসে পণ্য ও মূল্য উভয়টি কবজা করার শর্তটি পাওয়া যায় না। ফলে শরিয়তের দৃষ্টিতে এই লেনদেনটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

অনুরূপভাবে কোনো ধনী যদি তার ওপর থাকা জাকাত আদায়ের উদ্দেশ্যে কোনো ফকিরকে এই নোটগুলো দেয়, তাহলে ফকির সেটির বিপরীতে থাকা স্বর্ণ-রুপা কবজা করা বা সেটির মাধ্যমে কোনো জিনিস ক্রয় করা ছাড়া জাকাত আদায় হবে না। আর ফকির সেটি দিয়ে উপকৃত হওয়ার আগে যদি সেটি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ধনী ব্যক্তির জাকাত আদায় হবে না। (তাকে এখন দ্বিতীয়বার জাকাত আদায় করতে হবে।)

কিন্তু এ ক্ষেত্রে আরও একটি অভিমত রয়েছে। আর সেটি হলো, বর্তমানে এই নোটগুলো নিজেই একটি প্রচলিত মূল্যে পরিণত হয়েছে। সুতরাং কাউকে সেটি দেওয়ার অর্থ হলো কোনো পণ্য বা মূল্য দেওয়া। ঋণ হাওয়ালা করা নয়। ফলে সেটির মাধ্যমে জাকাত আদায় হয়ে যাবে এবং স্বর্ণ-রুপা কেনাও জায়েজ হবে।

সুতরাং ব্যাংক-নোট ও বিভিন্ন দেশের কারেন্সির বিধিবিধানের আলোচনাতে যাওয়ার আগে আমাদের জন্য জরুরি হলো ফিকহি দৃষ্টিতে এ ধরনের বিষয়ের যে-কোনো একটি অভিমতের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া।

এ বিষয়ে ফিকহি কিতাব এবং অর্থনীতিবিষয়ক বইপুস্তক অধ্যয়নের পর আমার অভিমত দ্বিতীয় মতামতের দিকে। আর সেটি হলো, এই নোটগুলো প্রচলিত মূল্য, ঋণের হাওয়ালা করা নয়।

ব্যাংক-নোটের বাস্তবতা জানতে আমাদের জন্য জরুরি হলো বিশ্বে নোট সৃষ্টির ক্রমাগত ধারাবাহিকতা জানা। তাই আলোচনার শুরুতে নোট সৃষ্টির ক্রমবিকাশের কিছু সারাংশ উপস্থাপন করছি।

২. বিশ্বে মুদ্রাব্যবস্থার ক্রমবিকাশ

এ কথা স্বতসিদ্ধ যে, মানব ইতিহাসের সূচনালগ্নে মানুষ পণ্যের বিনিময়ে পণ্যের লেনদেন (Barter) করতো। (অর্থাৎ একটি জিনিস দিয়ে তার বিনিময়ে আরেকটি জিনিস নিতো।) কিন্তু এ পদ্ধতিটি কষ্টসাধ্য হওয়ায় সব যুগের ও স্থানের জন্য একটি ব্যাপক নীতি হিসেবে ব্যবহারযোগ্য করা সম্ভব ছিলো না। (এ কারণে পর্যায়ক্রমে এর বিলুপ্তি ঘটে।)

এরপর আরও একটি পদ্ধতির আবির্ভাব ঘটে। যাকে পণ্যনির্ভর মুদ্রাব্যবস্থা نظام النقود السلعية Commodity money System) বলা হয়। এ পদ্ধতিতে মানুষ বহুল ব্যবহৃত কিছু পণ্যকে অধিকাংশ লেনদেনের ক্ষেত্রে মূল্য হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। আর এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক ব্যবহৃত এবং সব থেকে বেশি প্রয়োজনীয় পণ্যকে বিশেষভাবে নির্বাচন করা হয়। যেমন; খাদ্যশস্য, লবণ, চামড়া ইত্যাদি। কিন্তু এসব পণ্যের মাধ্যমে লেনদেন করতে সেগুলোকে বহন ও স্থানান্তরের সমস্যা ও কষ্টের ব্যাপারটি অস্পষ্ট নয়। তাই যখন জনবসতির আধিক্য ঘটলো, প্রয়োজন বেড়ে গেলো এবং বেশি লেনদেন হতে লাগলো, তখন মানুষ এমন একটি মুদ্রা নির্বাচনের প্রয়োজন অনুভব করলো, যেটি সহজে বহন করা যাবে এবং মানুষও এর ওপর আস্থা রাখবে।

তৃতীয় পর্যায়ে এসে মানুষ সোনা-রুপাকে তাদের মধ্যকার লেনদেনে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। বিভিন্ন অলঙ্কার ও আসবাব তৈরিতে তার সত্তাগত মূল্য থাকা এবং সেটি বহন ও জমা করা সহজ হওয়ায় তাকে নির্বাচন করা হয়। এমনকি এই দুটি খনিজ পদার্থ পণ্যের মূল্যের জন্য মানদণ্ডে পরিণত হয়। সব দেশ বা সব এলাকার মানুষই এর ওপর আস্থাশীল

হয়। মুদ্রার এই পদ্ধতিকে খনিজ মুদ্রা পদ্ধতি (نظام النقود المعدنية, Metalic Money System) বলা হয়। পরবর্তী সময়ে এই পদ্ধতির ওপর অনেক পরিবর্তন ও সংস্করণ অতীত হয়েছে। আমরা যার সারসংক্ষেপ নিচে উল্লেখ করছি।

১. প্রথম পর্যায়ে মানুষ এমন সোনা-রুপাকে কারেন্সি হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে; যার আকৃতি, ওজন ও স্বচ্ছতার মধ্যে ভিন্নতা ছিলো। তার কোনোটি স্বর্ণ-রুপার টুকরো ছিলো, কোনোটি অলঙ্কার বা আসবাবের আকৃতিতে বা অন্য কোনো ধরনের হতো। কিন্তু মানুষ কেবল ওজনের হিসাবে তার মাধ্যমে লেনদেন করতো।

২. এরপর কিছু দেশের মানুষ ছাঁচে ঢালাইকৃত স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহার করতে শুরু করলো। আবার কোনো কোনো দেশে ঢালাইকৃত রৌপ্যমুদ্রার ব্যবহারও শুরু হয়। যেগুলো আকৃতি, ওজন ও স্বচ্ছতার দিক থেকে এক ধরনের হতো। এর ওপর প্রাতিষ্ঠানিক সিল মারা থাকতো, যা ভালো ও বিনিময়যোগ্য হওয়ার চিহ্ন ছিলো। তার ওপর যে মূল্য (Face Value) লেখা হতো, সেটি তার বিপরীতে থাকা সোনা বা রুপার সমপর্যায়ের মূল্য হতো (Gold or Silver Content)। ছাঁচে ঢালাইকৃত স্বর্ণমুদ্রার মূল্য ছাঁচে ঢালাইহীন স্বর্ণের কোনো টুকরোর ওজন পরিমাণ হলে উভয়ের মূল্য এক হতো। এই পদ্ধতিকে স্বর্ণমান বা রৌপ্যমান পদ্ধতি (نظام قاعدة التبر أو نظام قاعدة الورق, Gold Specie Standard) বলা হতো। বলা হয়ে থাকে যে, খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে সর্বপ্রথম চীনারা এই নীতির প্রবর্তক।

এ পদ্ধতির লেনদেনে স্বাধীনতা ছিলো যে, পরস্পরের মধ্যকার লেনদেনের ক্ষেত্রে ইচ্ছেমতো স্বর্ণের টুকরো, ঢালাইকৃত বা অলঙ্কারের মাধ্যমে লেনদেন করবে আর এই স্বাধীনতা রাষ্ট্রের বাইরে আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। রাষ্ট্র এই দায়িত্ব নিয়েছিলো যে, জনগণের কেউ যখন কোনো স্বর্ণ বা রুপার টুকরো এনে সেটিকে মুদ্রায় পরিণত করতে আগ্রহী হবে, রাষ্ট্র সেটিকে ঢালাই করে দেবে। ফলে মানুষ তাদের সোনা বা রুপার টুকরো নিয়ে রাষ্ট্রের কাছে আসতো। আর রাষ্ট্র সেগুলোকে ঢালাইকৃত মুদ্রায় রূপান্তরিত করে তার মালিকের কাছে ফেরত দিতো। অনুরূপভাবে কেউ ঢালাইকৃত স্বর্ণমুদ্রা এনে

সেটিকে টুকরোয় রূপান্তরিত করার ইচ্ছে প্রকাশ করলে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সেটিকে স্বর্ণের টুকরো করে তার মালিককে ফেরত দেওয়া হতো।

৩. কোনো কোনো রাষ্ট্র দুটি ধাতুকে (সোনা-রুপা) একই সময়ে ঢালাইকৃত কারেন্সি হিসেবে চালু করে এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে উভয়ের জন্য নির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণ করে। স্বর্ণমুদ্রাকে বড়ো কারেন্সি এবং রৌপ্যমুদ্রাকে ছোটো কারেন্সি হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। এই পদ্ধতিকে দ্বিধাতুমান (نظام المعدن الثنائي, Bi metalism.) পদ্ধতি বলা হয়।

কিন্তু এ পদ্ধতিটি ভিন্ন একটি সমস্যা সৃষ্টি করলো। আর সেটি হলো, বিভিন্ন রাষ্ট্রের নির্ধারিত স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার মূল্যের মধ্যে ভিন্নতা। ফলে মানুষ মুদ্রার ব্যবসায় উৎসাহী হলো। উদাহরণস্বরূপ আমেরিকায় একটি স্বর্ণমুদ্রা যদি পনেরোটি রৌপ্যমুদ্রার সমপরিমাণ হতো, তাহলে একই সময়ে ইউরোপে একটি স্বর্ণমুদ্রা সাড়ে পনেরোটি (১৫.৫) রৌপ্যমুদ্রার সমপরিমাণ হতো। আর এই ভিন্নতা আমেরিকার ব্যবসায়িদেরকে স্বর্ণমুদ্রা জমা করে ইউরোপে নিতে উদ্বুদ্ধ করলো। যেন সেখান থেকে তারা বেশি রৌপ্যমুদ্রা অর্জন করে সেগুলোকে আমেরিকায় আনতে পারে। এরপর সেগুলোকে আবারো স্বর্ণমুদ্রায় রূপান্তরিত করে দ্বিতীয়বার ইউরোপে রপ্তানি করতে পারে। ব্যবসার এ পদ্ধতির ধারাবাহিকতা চলতে থাকলো। এ পদ্ধতির ব্যবসার ফলাফল স্বরূপ আমেরিকার স্বর্ণমুদ্রা ইউরোপে চলে যেতে লাগলো। যেন রৌপ্যমুদ্রা আমেরিকা থেকে সব স্বর্ণমুদ্রাকে বের করে দিলো। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা যখন তাদের দেশের স্বর্ণ-রৌপ্যমুদ্রার মধ্যকার মূল্যে পরিবর্তন করে একটি স্বর্ণমুদ্রাকে ষোলোটি রৌপ্যমুদ্রার সমমূল্যে নির্ধারণ করে, তখন উলটো ঘটনা ঘটলো। আর স্বর্ণমুদ্রা রৌপ্যমুদ্রাকে তাড়িয়ে দিলো।

৪. এরপর স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রা যেটিই হোক না কেন, পণ্যনির্ভর মুদ্রা অপেক্ষা সেগুলোর বহন সহজসাধ্য ছিলো। কিন্তু অন্য দিকে একই অবস্থায় সেগুলো চুরি করাও সহজ ছিলো। তাই সম্পদশালীদের পক্ষে নিজ বাড়িতে এ ধরনের বড়ো অংকের মুদ্রা জমা করে রাখা কঠিন ছিলো। ফলে কিছু কিছু স্বর্ণকারের কাছে তারা এ ধরনের মুদ্রাকে আমানত রাখতে শুরু করলো। আর স্বর্ণকারেরা লোকদের থেকে এ ধরনের মুদ্রা গ্রহণের সময় আমানত রিসিট (Receipts) এবং

প্রমাণপত্রস্বরূপ তাদেরকে একটি রশিদ দিতো। এ ধরনের স্বর্ণকারের প্রতি যখন মানুষের আস্থা বেড়ে গেলো। তখন ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এইসব প্রমাণপত্র বা রিসিটকে তারা মূল্য হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করলো। ক্রেতা নগদে মূল্য পরিশোধের পরিবর্তে বিক্রেতাকে এ ধরনের রিসিট দিতো। আর রিসিট ইস্যুকারী স্বর্ণকারের প্রতি আস্থা থাকার কারণে বিক্রেতা সেটি গ্রহণ করতো।

এ হলো কাগুজে নোট বা ব্যাংক-নোট সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থা। কিন্তু শুরুতে এর প্রাতিষ্ঠানিক কোনো আকার এবং সেগুলো গ্রহণে কোনো ধরনের বাধ্যবাধকতা ছিলো না বরং সেগুলো গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের মূলকেন্দ্রবিন্দু ছিলো ক্রেতা বা বিক্রেতার পক্ষ থেকে সেটি ইস্যুকারী স্বর্ণকারের ওপর আস্থা।

৫. খ্রিস্টাব্দ সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে যখন বাজারে এ ধরনের রিসিটের ব্যবহার খুব বেশি বেড়ে গেলো। তখন সেগুলো উন্নীত হলো একটি প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে। যার নাম হলো ব্যাংক-নোট। বলা হয়ে থাকে যে, সুইডেনের স্টকহোম ব্যাংক সর্বপ্রথম এ ধরনের কাগজের বা ব্যাংক-নোটের প্রচলন ঘটায়।

সে সময় এ ধরনের নোট ইস্যুকারী ব্যাংকের কাছে প্রতিটি ব্যাংক-নোটের বিপরীতে শতভাগ স্বর্ণ বিদ্যমান থাকতো। আর ব্যাংক এ সিদ্ধান্তে দৃঢ় থাকতো যে, তার কাছে থাকা স্বর্ণের পরিমানের চেয়ে বেশি কোনো নোট সে ইস্যু করবে না এবং সে কাগুজে নোটের বাহকের এমন স্বাধীনতা ছিলো যে, তার ইচ্ছেমতো যে-কোনো সময় ব্যাংকের কাছে গিয়ে সেটিকে স্বর্ণের টুকরোয় পরিণত করবে। আর এ কারণেই এই পদ্ধতিকে স্বর্ণপিণ্ডমান (قاعدة سبيكة الذهب, Gold bullion Standard) বলা হয়।

৬. ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে যখন অধিকহারে ব্যাংক-নোটের ব্যবহার বেড়ে গেলো। তখন রাষ্ট্র সেটিকে আইনস্বীকৃত মুদ্রায় (ثمنًا قانونيًا, Legal Tender) পরিণত করলো। আর ধাতবমুদ্রার মতো প্রত্যেক ঋণদাতাকে সেটি গ্রহণে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হলো। এরপর ব্যবসায়িক ব্যাংকগুলোকে এ ধরনের নোট ইস্যু করতে নিষেধ করা হলো এবং কেবল রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয়

ব্যাংকের কাছেই সেটি ইস্যু করার অধিকার সংরক্ষিত করা হলো।

৭. এরপর যুদ্ধ ও যুদ্ধহীন অবস্থায় আমদানির স্বল্পতার কারণে, বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নশীল প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হলো। সুতরাং তাদের কাছে থাকা স্বর্ণের পরিমাণ অপেক্ষা বেশি নোট ইস্যু করতে বাধ্য হলো। যেন সেগুলোকে প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে। ফলে আস্তে আস্তে নোটের বিপরীতে থাকা স্বর্ণের পরিমাণ কমতে থাকলো। এমনকি প্রথম দিকে নোটের বিপরীতে যেখানে শতভাগ স্বর্ণ ছিলো পর্যায়ক্রমে সেটির পরিমাণ কমতে কমতে একেবারেই নিম্ন পর্যায়ে পৌঁছলো। আর এমনটি হওয়ার কারণ হলো, যেসব ব্যাংক এ ধরনের নোট ইস্যু করতো, তারা নিশ্চিত ছিলো যে, একই সময়ে সব নোট স্বর্ণে পরিণত করার দাবি আসবে না। অন্যভাবে বললে এভাবে বলতে হয় যে, বাজারে এমন অনেক নোটের প্রচলন ঘটেছে, যার বিপরীতে শতভাগ স্বর্ণ ছিলো না। কিন্তু তারপরও ব্যবসায়িরা এগুলো এ কারণে গ্রহণ করতো যে, ব্যাংকের কাছে গিয়ে এগুলোকে স্বর্ণে পরিণত করার দাবি করামাত্র, তাদের কাছে থাকা স্বর্ণের মাধ্যমে সেগুলোকে স্বর্ণে পরিণত করে দিতে পারার ব্যাপারে তাদের আস্থা ছিলো। যদিও ব্যাংকের কাছে থাকা স্বর্ণের পরিমাণ তার পক্ষ থেকে ইস্যুকৃত নোট অপেক্ষা কম ছিলো। এই নোটকে 'আস্থা নোট' (نقود الثقة, Fiduciary Money) বলে নামকরণ করা হতো।

অন্যদিকে (আমদানির স্বল্পতা আর অধিক নোটের প্রয়োজন বৃদ্ধি পাওয়ায়) যেসব রাষ্ট্র তখনো পর্যন্ত ধাতবমুদ্রার সঙ্গে মিল রেখে কার্যক্রম চালিয়েছে তারা আগের তুলনায় পার্সেন্ট কমাতে বা আসল ধাতুর স্থানে অসম্পন্ন ধাতু ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। ফলে পরিস্থিতি এমন হলো যে, নোটের গায়ে লিখিত মূল্য (Face Value) তার বিপরীতে থাকা সোনা বা রুপার মূল্য (Intrinsic Value) অপেক্ষা কয়েকগুণ বেড়ে গেলো। এই ধরনের নোটকে 'চিহ্নযুক্ত নোট' (نقودًا رمزية, Token Money) বলা হতো। যে কারণে এই নামকরণ করা হয়েছে তা হলো, এই নোটগুলোর গায়ে লিখিত মূল্য তার মূলধাতুর জন্য শুধু একটি আলামত। যা তার পূর্বের সত্তাগত আসল মূল্যের পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধিত্ব করে।

৮. পর্যায়ক্রমে 'আস্থা নোট' ("نقود الثقة"Fiduciary Money.)-এর পরিমাণ এতো বেড়ে গেলো, যা রাষ্ট্রে থাকা স্বর্ণের পরিমাণ অপেক্ষা অনেকগুণ বেশি হলো। এমনকি রাষ্ট্র এই আশঙ্কা করলো যে, তার কাছে থাকা স্বর্ণ দিয়ে কাঙ্খিত পরিমাণ নোটকে স্বর্ণে পরিণত করা সম্ভব হবে না। কোনো কোনো রাষ্ট্রে এ আশঙ্কাটি বাস্তবে দেখা দিলো। ফলে অনেক সময় বিভিন্ন ব্যাংক তার গ্রাহকদের চাহিদা পূরণে সক্ষম হলো না।

এ সময় অনেক রাষ্ট্র নোটকে স্বর্ণে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে খুব কঠিন শর্ত আরোপ করলো। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধের পর ইংল্যান্ড সম্পূর্ণরূপে নোটকে স্বর্ণে পরিণত করা নিষিদ্ধ করে। এরপর ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে আবার সেটির বৈধতার দিকে ফিরে আসে। তবে সে ক্ষেত্রে শর্তারোপ করে যে, যারা নোটকে স্বর্ণে পরিণত করতে চাবে, তাদেরকে কমপক্ষে একহাজার সাতশো পাউন্ড পরিমাণ স্বর্ণের দাবিদার হতে হবে। (তখন খুব কম মানুষ এতো বেশি পরিমাণ স্বর্ণের মালিক ছিলো।) যে শর্তটি জনগণকে এমন পরিস্থিতিতে উপনীত করলো যে, তারা নোটকে স্বর্ণে পরিণত করতে সক্ষম নয়। (কারণ তাদের কাছে এতো বেশি স্বর্ণের পরিমাণ নোট নেই) কিন্তু এ আইনটিকে মানুষ বেশি গুরুত্বের দৃষ্টিতে দেখলো না এ কারণে যে, আইনস্বীকৃত নোট তাদেরকে নিজ দেশ ও বাইরের রাষ্ট্রে সে উপকারিতাই দিতো, যা ধাতবমুদ্রা থেকে পেতো।

৯. এরপর ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেন সরকার উক্ত আইনস্বীকৃত নোটকে স্বর্ণে পরিণত করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলো। এমনকি কেউ একহাজার সাতশত পাউন্ড স্বর্ণের মূল্য পরিমাণের চেয়েও বেশি মূল্যের নোটকে পরিবর্তন করতে চাইলে, তাকেও স্বর্ণে পরিণত করে দেওয়া হবে না। আর জনগণকে এই আইনস্বীকৃত নোটকে স্বর্ণের বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য করা হলো। তারা এর মাধ্যমেই সব ধরনের লেনদেন করবে। কিন্তু রাষ্ট্র পরস্পরের মধ্যকার অধিকার সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রে প্রচলিত নোটকে যদিও স্বর্ণে পরিণত করা নিষিদ্ধ করেছিলো। কিন্তু প্রত্যেক রাষ্ট্র এটি বাধ্যতামূলক করে নিয়েছিলো যে, তার নোট যদি অন্য রাষ্ট্রে চলে যায় এবং সে রাষ্ট্র এর বিনিময়ে স্বর্ণ দাবি করে, তাহলে তারা সেটিকে স্বর্ণে পরিণত

করে দেবে। উদাহরণস্বরূপ আমেরিকার কাছে যদি ইউরোপের স্টারলিং পাউন্ড চলে যায়, তাহলে ইউরোপ, আমেরিকার দাবির মুখে সেটিকে স্বর্ণে পরিণত করতে বাধ্য থাকবে। এই পদ্ধতিকে 'স্বর্ণ বিনিময় মানদণ্ড' (قاعدة التعامل بالذهب, Gold Exchange Standard.) বলা হয়।

১০. বছরের পর বছর এই নীতির ওপর কার্যক্রম চলতে থাকলো। এমনকি আমেরিকার ডলারের মূল্য কমে যাওয়ার কারণে যখন কঠিন সঙ্কটের সম্মুখীন হলো এবং ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বর্ণের পরিমাণ অনেক কমে গেলো। তখন আমেরিকা সরকার এ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলো যে, অন্য রাষ্ট্রের কারেন্সিকেও স্বর্ণে পরিণত করার আইন রহিত করা হবে। আর এটি ছিলো ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের পনেরোই আগস্ট। তারা এই আইন বাস্তবায়ন করে। এর মাধ্যমে ব্যাংক-নোটকে স্বর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত রাখার শেষ রূপটিও শেষ হয়ে যায়। এরপর ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক অর্থতহবিল (الصندوق المالي العالمي, International Monetary Fund) কর্তৃক স্বর্ণের বিকল্প পদ্ধতিস্বরূপ মুদ্রা ইস্যু করার একটি বিকল্প (حقوق السحب الخاصة, Special Drawing Rights) পদ্ধতি আবিষ্কার করলো। সে পদ্ধতির সারকথা ছিলো এই, আন্তর্জাতিক অর্থতহবিল (الصندوق المالي العالمي, International Monetary Fund)-এর সদস্যদের এই অধিকার থাকবে যে, বিভিন্ন রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের ঋণ পরিশোধের জন্য সেখান থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। আর সে ক্ষেত্রে ০.৮৮৮৬৭১ গ্রাম স্বর্ণকে উক্ত পরিমাণের মানদণ্ড হিসেবে নির্ধারণ করা হলো। (এই পরিমাণ স্বর্ণ ক্রয়ে যে পরিমাণ কারেন্সির প্রয়োজন পড়ে সে পরিমাণ কারেন্সি ইস্যু করতে পারবে) আর এ পরিমাণ ঋণ গ্রহণের অধিকারকে রিজার্ভ স্বর্ণের বিকল্প হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে।

এভাবে ব্যাংক-নোটগুলো একেবারেই স্বর্ণের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গেলো। (এবং স্বর্ণের সঙ্গে নোটের কোনো সম্পর্ক বাকি থাকলো না) আর 'প্রতীকি মুদ্রা' (نقودًا رمزية, Token Money) সম্পূর্ণরূপে স্বর্ণের স্থান দখল করে নিলো। সুতরাং বর্তমানের কারেন্সি কোনোভাবেই সোনা বা রুপার প্রতিনিধিত্ব করে না। বরং একটি মেনে নেওয়া ক্রয়ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই পদ্ধতিটি যেহেতু স্থায়ী এবং স্বতন্ত্র পদ্ধতির

মতো জায়গা করে নেয়নি। সম্ভবত এ কারণে অনেক রাষ্ট্রে এ দাবির পক্ষে আন্দোলন চলছে যে, পূর্বের মতো স্বর্ণের অর্থনীতি চালু করা হোক। এমনকি পুনরায় স্বর্ণের বারের মুদ্রা চালুর দাবি উঠছে। কারণ কোনো রাষ্ট্র নিজেকে সম্পূর্ণরূপে স্বর্ণ থেকে অমুখাপেক্ষি মনে করছে না। ফলে সতর্ক রিজার্ভস্বরূপ প্রতিটি রাষ্ট্রই তার আমদানির বেশিরভাগ স্বর্ণ জমা করতে আগ্রহী রয়েছে, যেন যুগের পরিবর্তনের সময় এবং পরিস্থিতি ঘুরে দাঁড়ালে সেগুলোর মাধ্যমে উপকৃত হওয়া যায়। কিন্তু এই মজুদ করা স্বর্ণ যতই বড়ো হোক না কেন সেগুলো নিছক সতর্ক রিজার্ভ। ব্যাংক-নোট হিসেবে প্রচলিত কারেন্সির সঙ্গে তার কোনো ধরনের আইনি সম্পর্ক নেই। চাই সে কারেন্সি কাগুজে নোটের আকৃতিতে হোক বা ধাতবরূপে হোক।

এ হলো বিশ্বে কারেন্সি পদ্ধতির পরিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।[১] যেটি অধ্যয়নে এ বিষয়টি সামনে আসে যে, কারেন্সি কখনো একই বাস্তবতা ও আইনের ওপর স্থির ছিলো না। বরং তার ওপর একাধিক যুগের চক্র ঘুরেছে এবং বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন এসেছে।

এ কথায় কোনো সন্দেহ নেই যে, এই নোটগুলো তার সূচনালগ্নে ঋণের প্রমাণপত্রস্বরূপ ছিলো। এ কারণে অনেক আলেম এই ফতোয়া দিয়েছেন যে, এগুলো ঋণের প্রমাণপত্র। কোনো ধরনের পণ্য বা মূল্য নয়। আল্লামা সায়্যেদ আহমাদ বেগ আল-হুসাইনি রহ. তার "بهجة المشتاق في بيان حكم زكاة الأوراق" নামক কিতাবে বলেন—

« ولذلك لو بحثنا عن ماهية كلمة « بنك نوت » لوجدناها من الاصطلاح الفرنسي، وقد نص لاروس، وهو أكبر وأشهر قاموس للغة الفرنساوية الآن، في تعريف أوراق البنك، حيث قال: ورقة البنك هي ورقة عملة قابلة لدفع قيمتها عينًا لدي الاطلاع لحاملها، وهي يتعامل بها كما يتعامل بالعملة المعدنية نفسها، غير أنه ينبغي أن تكون مضمونة

[১] উল্লিখিত ইতিহাসটি নীচের কিতাবগুলো থেকে সংগৃহীত : ১. An outline of Money, by Geffrey Growther. ২. Money And Man, by Elgin Groseclose, Ivth. Ed. University of Okiahoma Press, Norman ১৯৭. ৩. Modern Economic Theory, by K.K. Dewett New Delhi, ৪. Encyclopaedia Britannica Banking and Credit Money Currency. ৫. حكم التعامل بالذهب والفضة، للدكتور محمد هاشم عوض

ليثق الناس بالتعامل بها». اهـ. » فقوله : «قابلة لدفع قيمتها عينًا لدي الاطلاع لحاملها» لم يجعل شكًا في أنها سندات ديون» ، ولا عبرة لما توهمه عبارته من يتعامل بها كما يتعامل بالعملة المعدنية» ؛ لأن معنى تلك العبارة أن الناس يأخذونها بدل العملة، ولكن مع ملاحظة أن قيمتها تدفع لحاملها، وأنها مضمونة بدفع قيمتها، وهذا صريح في أن تلك الأوراق هي سندات ديون».

'এ কারণে আমরা যদি 'ব্যাংক-নোট' শব্দের বাস্তবতা অনুসন্ধান করি, তাহলে দেখতে পাই যে, সেটি ফরাসি ভাষার একটি পরিভাষা। বর্তমানে ফরাসি ভাষার সব থেকে বড়ো ও প্রসিদ্ধ 'লারুস'-এ ব্যাংক-নোটের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, ব্যাংক-নোট হলো এমন একটি কারেন্সি নোট। যার বাহক দাবি করামাত্র সে নোটের বাস্তবিক মূল্য দিতে বাধ্য থাকবে। আর এই নোটগুলোর সঙ্গে ধাতব মুদ্রার মতো লেনদেন করা হবে। অবশ্য এই নোটগুলো 'মাজমুন' হয়ে থাকে। আর মাজমুন হলো ওই জিনিস যার বিপরীতে অন্য জিনিস দায়বদ্ধ রাখা হয়। যেন মানুষ এগুলোর লেনদেনের ব্যাপারে আস্থা রাখে।

সুতরাং এই সংজ্ঞাতে 'চাহিবামাত্র এর বাহককে বাস্তবিক মূল্য দিতে বাধ্য থাকবে।' বাক্যটি কোনো ধরনের সন্দেহ ছাড়া এ কথা প্রমাণ করছে যে, এই নোটগুলো ঋণের প্রমাণপত্র। অবশ্য ওই সংজ্ঞায় দ্বিতীয় যে অংশটি রয়েছে যে, 'আর এই নোটগুলোর মাধ্যমে সে ধরনের লেনদেন করা হবে, যেমনটি করা হয় ধাতব মুদ্রার দ্বারা' এ অংশটি উক্ত নোটগুলো ঋণের প্রমাণপত্র না হওয়ার বিষয়ে কিছুটা সন্দেহ সৃষ্টি করা কোনো বিবেচনায় আসবে না। কেননা, এ অংশের উদ্দেশ্য শুধু এই যে, মানুষ সেগুলোকে কারেন্সির মতো লেনদেনের ক্ষেত্রে গ্রহণ করে নিয়েছে। কিন্তু শুধু এ বিষয়টি যে 'তার বাহককে মূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে এবং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তার মূল্য উসুলের দায়ভার নিয়েছে' এ কথাকে স্পষ্ট করে যে, এই নোটগুলোই হলো ঋণের প্রমাণপত্র।'[২]

---

[২] আল্লামা সাগানি রহ.-এর 'বুলুগুল আমানি শরহু ফাতহে রাব্বানি' কিতাব থেকে উদ্ধৃত। খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ২৪৮।

অনুরূপভাবে আগের শতাব্দীতে হিন্দুস্তানের অনেক আলেম এই ফতোয়া দিয়েছেন যে, এই নোটগুলো ঋণের প্রমাণপত্র। সুতরাং সেটির মাধ্যমে সে সময় পর্যন্ত জাকাত আদায় হবে না, যতক্ষণ ফকির সেটি নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করবে না এবং এই নোটের মাধ্যমে সোনা-রুপা ক্রয় করা জায়েজ নেই।[৩]

কিন্তু সে যুগেই আলেম ও ফকিহদের একটি অংশের এই অভিমত ছিলো যে, এই ব্যাংক-নোটগুলো প্রচলিত মূল্য হিসেবে সম্পদ। 'মুসনাদে আহমাদ'-এর বিন্যাসকারী ও ব্যাখ্যাকার আল্লামা আহমাদ সাআতি রহ. তৃপ্তিদায়ক আলোচনা করেছেন। তার উল্লিখিত কিতাবের জাকাত অধ্যায়ে তিনি বলেন—

«فالذي أراه حقًا، وأدين الله عليه : أن حكم الورق المالي كحكم النقدين في الزكاة سواء بسواء؛ لأنه يتعامل به كالنقدين تمامًا؛ لأن مالكه يمكنه صرفه وقضاء مصالحه به في أي وقت شاء. فمن ملك النصاب من الورق المالي، ومكث عنده حولا كاملاً وجبت عليه زكاته ...» إلخ.

'আমি যেটিকে সঠিক বলে মনে করি এবং বিষয়টির ব্যাপারে আল্লাহর কাছে এমন বিশ্বাস রাখি যে, জাকাতের ক্ষেত্রে ব্যাংক-নোটের হুকুম হলো হুবহু সোনা-রুপার হুকুমের মতো। কারণ, সম্পূর্ণ স্বর্ণ-রুপার মতো মানুষের মাঝে সেগুলোর লেনদেন করা হয়। কারণ তার মালিকের এই স্বাধীনতা রয়েছে যে, তার ইচ্ছেমতো যে-কোনো সময় সেগুলো ব্যয় করতে পারবে। সুতরাং কেউ এমন ব্যাংক-নোটের মালিক হওয়ার পর পূর্ণ এক বছর অতিক্রান্ত হলে, তার ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে।'[৪]

হিন্দুস্তানের আরও কিছু আলেম একই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। যেমন : আল্লামা শায়খ আবদুল হাই লাখনোবি রহ.-এর বিশেষ ছাত্র এবং 'ইতরে হিদায়া' ও 'খুলাসাতুত তাফাসির'-এর লেখক মাওলানা ফাতাহ মুহাম্মাদ লাক্ষবি রহ.। তার সন্তান মুফতি সাইদ আহমাদ লাক্ষবি রহ. 'ইতরে হিদায়া'-এর শেষে

---

[৩] ইমদাদুল ফাতাওয়া, হাকিমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ আলি থানবি রহ.। খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫। এবং তৃতীয় খণ্ড।

[৪] শরহু ফাতহে রাব্বানি। অধ্যায় : জাকাত, পরিচ্ছেদ : সোনা-রুপার জাকাত, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ২৫১।

পিতার অভিমতের ব্যাখ্যা করেছেন এবং বলেছেন যে, আল্লামা আবদুল হাই লাক্ষবি রহ. এই অভিমতের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

তাঁর অভিমতের সারাংশ এই যে, ব্যাংক-নোটে দুটি দিক রয়েছে—

১. ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা এবং সব ধরনের আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে এ নোটগুলোকে বিনিময় করা হয় হুবহু মুদ্রার মতো। বরং ঋণ ও পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সেটি গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সুতরাং বর্তমানের আইন অনুযায়ী কোনো ঋণদাতার জন্য এমন সুযোগ নেই যে, সে এ ধরনের নোট গ্রহণ করবে না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এই নোটগুলো প্রচলিত মুদ্রায় পরিণত হয়েছে।

২. এই নোটগুলো রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আস্থাপত্র। সেগুলো নষ্ট হয়ে গেলে রাষ্ট্র তা পরিবর্তন করে দিতে বাধ্য। সুতরাং এ দিক থেকে উক্ত নোটগুলো প্রস্তুতকৃত প্রচলিত মুদ্রার বিপরীত অবস্থানে থাকে। কেননা, প্রচলিত মুদ্রা নষ্ট হলে রাষ্ট্র সেটির পরিবর্তে কিছু আদায় করে না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সেটিকে ঋণের প্রমাণপত্র হিসেবে বিবেচনা করা বা অন্য কোনো আর্থিক প্রমাণপত্র বলে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।

কিন্তু আমরা যখন দ্বিতীয় দিকটির প্রতি গভীর দৃষ্টি দিই, তখন দেখতে পাই যে, নোটের এই দ্বিতীয় দিকটি তাকে মুদ্রা হওয়া থেকে বের করে না। কারণ রাষ্ট্রের আসল উদ্দেশ্য ছিলো, এই নোটগুলোও প্রচলিত মুদ্রা হিসেবে মানুষের মধ্যে প্রচলিত হবে। এ কারণে ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে সেটি গ্রহণে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু পূর্বের ঢালাইকৃত মুদ্রা (স্বর্ণের মুদ্রা) এবং অন্যান্য ধাতবমুদ্রা সত্তাগত মাল হওয়ার কারণে সেগুলোর একটি মূল্য ছিলো। সেগুলোর মূল্যবান হওয়া রাষ্ট্রীয় ঘোষণার ওপর নির্ভরশীল ছিলো না। এবং চিহ্নযুক্ত মুদ্রায় পরিণত করারও কোনো প্রয়োজন ছিলো না। কেননা, সেগুলো সোনা-রুপা, তামা, পিতল বা লোহা জাতীয় ধাতু দ্বারা তৈরি করা হতো। যেগুলো সত্তাগতভাবে মূল্যবান জিনিস। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সেগুলোর মুদ্রা হওয়াকে বাতিল করলেও তার ধাতুগত মূল্য অবশিষ্ট থাকতো।

আর এই ব্যাংক-নোটগুলো সত্তাগতভাবে কোনো মূল্যবান বস্তু নয় বরং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ঘোষণার কারণেই তার মধ্যে মূল্য এসেছে। রাষ্ট্র যদি

তার মূল্যকে বাতিল করে দেয়, তাহলে সেটি বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং ধাতবমুদ্রা মানুষের যতটা আস্থা অর্জন করতে পেরেছে ব্যাংক-নোট ততটা আস্থা অর্জন করতে পারেনি। এ কারণে সেটি নষ্ট হলে রাষ্ট্র তার বিনিময় আদায় করার বাধ্যবাধকতা নিয়েছে; এ ছাড়া বাকিগুলোর বিনিময় আদায় করার বাধ্যবাধকতা নেয়নি এ কারণে যে, রাষ্ট্রের কাছে সেগুলো প্রচলিত মুদ্রা নয়। বরং এমনটি করেছে এই নোটগুলোর প্রতি মানুষের আস্থা অর্জনের জন্য এবং কোনো ধরনের ঝুঁকি ছাড়াই তারা যেন এগুলো লেনদেন করে।

সুতরাং এই নোটগুলোর আস্থাপত্র হওয়ার বিষয়টি এমন নয় যে, তা নোটের মুদ্রা হওয়া বাতিল করে দেবে। কেননা, আস্থাপত্র হওয়ার বিষয়টি শুধু এটা বুঝায় যে, রাষ্ট্র তার বিনিময় আদায় করার ওয়াদা দিয়েছে। আর জনগণের পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে এই ওয়াদার কোনো প্রভাব নেই। রাষ্ট্র যদি এগুলোকে প্রচলিত মুদ্রায় পরিণত না করতো, তাহলে জনগণকে এগুলো গ্রহণে বাধ্য করতো না। বরং এই দিকটি উক্ত নোটগুলোকে অন্যান্য মুদ্রা অপেক্ষা বেশি আস্থাভাজনে পরিণত করেছে। কেননা, ধাতব মুদ্রা হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হলে রাষ্ট্র তার বিনিময় আদায় করে না। কিন্তু এই কাগুজে নোটগুলো নষ্ট হলে রাষ্ট্রের কাছ থেকে পরিবর্তন করে নেওয়া সম্ভব।[৫]

৩. আলোচিত মাসআলায় আমাদের অভিমত

কাগুজে নোটের বিষয়ে উল্লিখিত অভিমত দুটির মাঝে যদি আমরা বিচার করি, তাহলে আমি মনে করি যে, দুটি অভিমতই তার যুগের ভিন্নতার সঙ্গে সঠিক। মুদ্রার ইতিহাস আলোচনায় আমরা এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছি যে, এই মুদ্রার ক্রমবিকাশ কীভাবে ঘটেছে। সুতরাং এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, প্রথম পর্যায়ে এগুলো ঋণের প্রমাণপত্র ছিলো। ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় উল্লেখ করা হয়েছে—

«أن البنكنوت ظهر في العالم قبل الشيكات المصرفية، ويمكن اعتباره كسند عند الدائن لدين له على البنك، وأن حقوق هذا الورق تنتقل إلى رجل آخر بتسليمه إليه، فيصير حامله دائنًا للبنك بطريقة تلقائية،

[৫] ইতরে হিদায়া, পৃষ্ঠা : ২১৮-২২৭।

وهذا صار أداء الحقوق المالية بهذه الأوراق كأداءها بالنقود، وإن أداء الم بالغ الكثيرة بالنقود المسكوكة عسير جدًا، فإنها تحتاج إلى عد ونقد، وربما يحتاج نقلها وحملها إلى تكاليف معتد بها، باستعمال هذه الأوراق قد قلل من مشقة العد، وأذهب المشاق الأخري رأسا»

'ব্যাংকচেকের আগেই বিশ্বে ব্যাংক-নোটের আবির্ভাব ঘটেছে। আর এই ব্যাংক-নোটগুলোকে ঋণদাতাকর্তৃক ব্যাংককে ঋণ দেওয়ার প্রমাণপত্রস্বরূপ ধরে নেওয়া যায়। আর এই নোটগুলো অন্য কাউকে দিলে নোটের সঙ্গে সম্পৃক্ত সব ধরনের অধিকার সেই ব্যক্তির কাছে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে। তাই স্বয়ংক্রিয়ভাবে উক্ত নোটের বাহক ব্যাংকের ঋণদাতায় পরিণত হবে। এ কারণে তার মাধ্যমে কোনো আর্থিক অধিকার আদায় করার অর্থ হলো প্রকৃত কারেন্সির মাধ্যমে আদায় করা। আর ঢালাইকৃত ধাতবমুদ্রার মাধ্যমে বড়ো ধরনের কোনো মূল্য পরিশোধ করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কেননা, সেগুলো গণনা ও পরখ করার প্রয়োজন পড়ে এবং কখনো কখনো সেগুলোকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিতে যথেষ্ট কষ্টের শিকার হতে হয়। তবে এই ব্যাংক-নোট ব্যবহারের কারণে গণনা ও অন্যান্য কষ্টের পরিমাণ তুলনামূলক কমেছে।'[৬]

কিন্তু নোটের ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনের আলোচনায় আমরা এ বিষয়টি লক্ষ করেছি যে, ভবিষ্যতে সেটি এই অবস্থায় অটল থাকবে না। প্রাথমিক পর্যায়ে সেগুলো ছিলো কিছু স্বর্ণকারের পক্ষ থেকে ব্যক্তি কেন্দ্রিক রশিদ। তার নির্দিষ্ট কোনো আকৃতি বা একক প্রকাশক ছিলো না। আর কারও পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে সেটি গ্রহণ করার ওপর কোনো বাধ্যবাধকতা ছিলো না। এরপর যখন তার ব্যাপক প্রচলন ঘটলো, তখন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সেগুলোকে আইনস্বীকৃত নোটে (Legal Tender) পরিণত করলো। আর কেন্দ্রিয় ব্যাংক ছাড়া অন্যান্য ব্যাংককর্তৃক সেগুলো ইস্যু করতে নিষেধ করা হলো। আর তখনই নিচের বিষয়গুলোর ভিত্তিতে অন্যান্য আর্থিক প্রমাণপত্র থেকে তার বাস্তবতা ভিন্ন হয়ে গেলো—

১. এগুলো আইনস্বীকৃত মুদ্রায় পরিণত হয়েছে এবং অন্যান্য মুদ্রার মতো এগুলো গ্রহণে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হলো। অথচ ঋণ

---

[৬] Encyclopeadia Britannica ১৯৫০, V. ৩ p. 88 Banking And Credit.

আদায়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য ঋণের প্রমাণপত্র গ্রহণে বাধ্য করা হয় না। যেমন : ব্যাংকচেক। অথচ এগুলোর লেনদেনও ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।

২. কোনো সীমারেখা ছাড়া (Unlimited Legal Tender) এগুলো আইনস্বীকৃত মুদ্রায় পরিণত হয়েছে। অথচ ধাতব মুদ্রা আইনস্বীকৃত সীমাবদ্ধ মুদ্রার (Limited Legal Tender) অবস্থানে রয়েছে। সুতরাং ঋণের পরিমাণ যত বেশিই হোক না কেন, ব্যাংক-নোটের মাধ্যমে সেটি পরিশোধ করা সম্ভব। ঋণদাতা সেটি গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে পারবে না। তবে ধাতব মুদ্রার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, ঋণদাতা বড়ো অংকের ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে সেগুলো গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে। সুতরাং বিষয়টি একথা প্রমাণ করে যে, ব্যাংক-নোট লেনদেন, মানুষের আস্থা অর্জন এবং আইনের দিক থেকে ধাতব মুদ্রা অপেক্ষা অনেক ঊর্ধ্বে চলে গেছে।

৩. ঋণের প্রমাণপত্র যে-কোনো ব্যক্তি ইস্যু করতে পারে। সে ক্ষেত্রে কোনো ধরনের আইনি বা শরয়ি বিধিনিষেধ নেই। যেমন : কোনো ঋণী তার ঋণদাতার নামে প্রমাণপত্র ইস্যু করে দিলো, ফলে সে ঋণদাতা সেটিকে অন্য ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে ব্যবহার করতেও কোনো বাধা নেই। কিন্তু ব্যাংক-নোট কেবলমাত্র একটি প্রতিষ্ঠানই ইস্যু করতে পারে। আর সেটি হলো, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। যেমন খনিজ (সোনা-রুপা) মুদ্রার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

৪. সব রাষ্ট্র ও এলাকাতে আইনিভাবে ও প্রচলনে ব্যাংক-নোটকে ক্যাশ, মুদ্রা ও কারেন্সি শব্দে অভিহিত করা হয়। অথচ অন্য কোনো আস্থাপত্রের ক্ষেত্রে এই শব্দগুলো ব্যবহার করা হয় না।

৫. ব্যাংক-নোটকে মানুষ তেমন আস্থার সঙ্গে লেনদেন করে থাকে, যেমন আস্থার সঙ্গে প্রচলিত ধাতব মুদ্রার লেনদেন করে। লেনদেনের সময় কারও মনে এই কল্পনা জন্মায় না যে, সে ঋণের লেনদেন করছে। তাছাড়া বর্তমানে এমন কাউকে পাওয়া যাবে না, যে এই নোটের বিপরীতে থাকা স্বর্ণ, রুপা বা অন্যান্য ধাতব পদার্থ পাওয়ার আশা রাখে।

৬. ব্যাংক-নোটের ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনের আলোচনায় এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্তমানে প্রকৃত অর্থে এগুলোর বিপরীতে কোনো স্বর্ণ ও রুপা নেই এবং এগুলোকে সোনা-রুপায় পরিবর্তন করাও সম্ভব না। এমনকি আন্তরাষ্ট্রীয় লেনদেনের ক্ষেত্রেও এগুলোকে সোনা-রুপায় পরিবর্তন করার সুযোগ নেই। জিওফ্রে গ্রোথার বলেন—

The Promise to Pay Which appears on their face is now utterly meaningless. Not even in amounts of L১.৭০০ can notes now be converted into gold. The note is no more than a piece of paper, of no intrinisic value whatever and if it were presented for redemption, the Bank of England could honour its Promise to pay one Pound only by giving Silver coins or another note but it is money throughout the British Isles

'কারেন্সি নোটের ওপর যে কথাটি লেখা থাকে, 'চাহিবা মাত্র ইহার বাহককে দিতে বাধ্য থাকবে।' বর্তমানে এই বাক্যের কোনো অর্থ বা উদ্দেশ্যই নেই। কেননা, এমন কোনো ব্যাংক-নোট নেই, যা স্বর্ণে পরিণত করা সম্ভব হবে। এমনকি আগের নিয়ম অনুযায়ী একহাজার সাতশো পাউন্ডও স্বর্ণে রূপান্তরিত করা যাবে না। সুতরাং বর্তমানের ব্যাংক-নোটগুলো শুধু কাগজের টুকরো হিসেবে রয়েছে। তার সত্তাগত কোনো মূল্য নেই। আজ ইংল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে তাদের বর্ণিত স্বর্ণের মূল্য পরিমাণ নোট নিয়ে সেটিকে স্বর্ণে পরিণত করার দাবি জানালে ব্যাংক তাকে কাগুজে নোট বা অন্য কোনো মুদ্রা ছাড়া কিছুই দিতে পারবে না। কিন্তু ইংলেন্ডের সব এলাকাতেই এই নোটকে ক্যাশ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। (এ কারণে সেটির বিনিময় দাবি করার কোনো প্রয়োজন অনুভূত হয় না।)[৭]

সারকথা হলো, বর্তমানে ব্যাংক-নোটের ওপর লেখা এই কথার উদ্দেশ্য শুধু এই যে, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তার বাহকের জন্য এই নোটের গায়ের মূল্যের (Face Value) দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে। আর তার গায়ের মূল্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্রয়ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে। এ কারণে ব্যাংক স্বর্ণ, রুপা বা অন্য কোনো ধাতব পদার্থ দিতে বাধ্য নয়। বরং অনেক সময় এভাবে তারা এ ওয়াদা পূরণ করে যে, সেটির পরিবর্তে সমমূল্যের অন্য একটি নোট

[৭] Geoffrey Growther : An Outline of money p১৬

দিয়ে দেয়। সুতরাং এটি কোনো ঋণ পরিশোধ করা নয়। বরং একটি ব্যাংক-নোটকে অন্য একটি নোটের মাধ্যমে পরিবর্তন করে দেওয়া। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যার দায়ভার নিয়েছে। এই নোটগুলো প্রচলিত মুদ্রা না হওয়ার কারণে এমনটি করে না, বরং এই নোটের প্রতি মানুষের আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাংক এমনটি করে থাকে।

আমাদের আলোচিত অংশ থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে, ফিকহি দৃষ্টিতে বর্তমানে এই নোটগুলো ঋণের প্রমাণপত্রের অবস্থানে নেই। বরং সেগুলো এখন প্রতীকী মুদ্রায় পরিণত হয়েছে। ফকিহগণ যেগুলোকে 'প্রচলিত ধাতব মুদ্রা'[৮] বলে ব্যক্ত করে থাকেন। কেননা, প্রচলিত ধাতব মুদ্রার গায়ের মূল্য তার প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা কয়েকগুণ বেশি হয়ে থাকে। অনুরূপ অবস্থা হলো প্রচলিত কারেন্সির, সেগুলোর গায়ের মূল্য প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা কয়েকগুণ বেশি। আর এই নোট এবং প্রচলিত ধাতব মুদ্রার মধ্যে কোনো ধরনের পার্থক্য ছাড়াই মানুষের মধ্যে তার ব্যাপক প্রচলন ঘটেছে। এমনকি বর্তমানে খনিজ (সোনা-রুপা) মুদ্রার কার্যক্রম একেবারেই নগণ্য পর্যায়ে নেমে এসেছে। সুতরাং এ ধরনের ব্যাংক-নোটের মাধ্যমে জাকাত আদায় না হওয়া, বাকির বিনিময়ে বাকি হওয়ার কারণে সেগুলোর একটির বিনিময়ে অন্যটির—হোক সেটি প্রতীকী পর্যায়ে—লেনদেন অবৈধ বলা এবং চুক্তির মজলিসে পণ্য ও মূল্য কবজার শর্তটি না পাওয়ার কারণে সেগুলো দিয়ে সোনা-রুপা ক্রয় করা নাজায়েজ হওয়ার ব্যাপারে ফিকহি হুকুম দেওয়া অত্যন্ত দুরূহ। আর এমন ক্ষেত্রে শরিয়তের চাহিদা থাকে সহজতা অবলম্বন করা এবং মানুষের কাছে সহজে বোধযোগ্য ব্যাপক প্রচলিত পদ্ধতির ওপর আমল করা। এমন সূক্ষ্ম পর্যালোচনা উদ্দেশ্য নয়, বর্তমানে যা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া জীবনে আর কোনো কার্যকারী ক্রিয়া রাখে না এবং সে ব্যাপারে কোনো আওয়াজই শোনা যায় না। আল্লাহ-ই ভালো জানেন।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে খুব ভালোভাবে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে যে, বর্তমানের ব্যাংক-নোটগুলো কারেন্সির হুকুমে। আমরা এখন তার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিধানের আলোচনার দিকে দৃষ্টি দেবো। মহান আল্লাহ সাহায্যকারী।

---

[৮] ফকিহগণ 'ফুলুসে নাফেকা' শব্দটি ব্যবহার করতেন। 'প্রচলিত ধাতব মুদ্রা' বলে এরই তরজমা করা হয়েছে।

কাগুজে নোট এবং জাকাত

যখন কারও কাছে (সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন ভরি রুপা সমপরিমাণ) কারেন্সি থাকবে, তখন সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে। যারা ঋণের ওপর জাকাত ওয়াজিব হওয়ার অভিমত পোষণ করেছেন এটি শুধু তাদের অভিমতের ভিত্তিতে নয়। কারণ, বর্তমানে এগুলো ঋণের প্রমাণপত্রের অবস্থানে নেই। বরং প্রচলিত মুদ্রার হুকুমে। আর জাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে প্রচলিত মুদ্রা ব্যবসায়িক পণ্যের মতো। সেটি রুপার নেসাবের সমমূল্যে হলে তার ওপর জাকাত ওয়াজিব হয়।

অনুরূপভাবে জাকাত আদায়ের উদ্দেশ্যে ফকিরকে এগুলো দেওয়া যাবে এবং ফকির সেগুলো গ্রহণ করামাত্রই জাকাত আদায় হয়ে যাবে। সেগুলো ব্যয় করা বা ধাতব মুদ্রায় রূপান্তরিত করার অপেক্ষা করতে হবে না। যেমনিভাবে ধাতব মুদ্রা ফকিরদের দেওয়ামাত্র জাকাত আদায় হয়ে যায়, সেগুলো ব্যয় করা বা সোনা-রুপায় রূপান্তরিত করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় না।

কাগুজেমুদ্রাকে কাগুজেমুদ্রার বিনিময়ে লেনদেন করা

কাগুজেমুদ্রার বিনিময়ে লেনদেন দুটি পদ্ধতিতে হতে পারে। যথা—

১. দেশীয় কাগুজেমুদ্রার মাঝে বিনিময় করা। আর সেটি হলো উভয় পক্ষের কাগুজে মুদ্রা একই রাষ্ট্রের কাগুজে মুদ্রা হওয়া।

২. ভিন্ন রাষ্ট্রের কাগুজেমুদ্রার মাঝে বিনিময় করা। আর সেটি এভাবে যে, ভিন্ন দেশের কাগুজেমুদ্রার মধ্যে বিনিময় করা। দুটি পদ্ধতি নিয়েই আমরা পৃথক আলোচনা করবো।

দেশীয় কাগুজে মুদ্রার বিনিময়

পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, বর্তমানে প্রচলিত কাগুজে মুদ্রার লেনদেন হুবহু ধাতব মুদ্রার হুকুমে। সুতরাং ধাতব মুদ্রার পারস্পরিক লেনদেনের সব বিধান এখানে প্রযোজ্য হবে। অতএব এই কাগুজে মুদ্রাগুলোকে যদি সমমূল্যে বিক্রয় করা হয় এভাবে যে, উভয় বিনিময় (পণ্য-মূল্য) সমান সমান, তাহলে সর্বসম্মত

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এমন লেনদেন জায়েজ হবে। তবে সে ক্ষেত্রে চুক্তির মজলিস থেকে পৃথক হওয়ার আগে যে-কোনো এক পক্ষের বিনিময়কে কবজা করার শর্ত রয়েছে।[৯] লেনদেনকারীদের কোনো একজন যদি বিনিময় কবজা করার আগে চুক্তির মজলিস ত্যাগ করে, তাহলে হানাফি মাজহাব ও মালিকি মাজহাবের কিছু আলেমের অভিমত অনুযায়ী বিক্রয়চুক্তি বাতিল হবে। কেননা, তাদের অভিমত অনুযায়ী কবজা করা ছাড়া ধাতব মুদ্রা নির্দিষ্ট করলেও সেগুলো নির্দিষ্ট হয় না। ফলে এ ক্ষেত্রে তাদের দুজনের ওপরই ঋণ রয়ে যায়। আর ঋণের বিনিময়ে ঋণের বিক্রয়ের ক্ষেত্রে চুক্তির মজলিসে কবজা না করার কারণে সেটি ফিকহি পরিভাষায় 'বাইয়ে কালি বিল কালি' এবং সেটি নাজায়েজ।'[১০]

উল্লিখিত হুকুম সে ক্ষেত্রে, যেখানে একই রাষ্ট্রের কারেন্সির মধ্যে সমান সমান করে বিনিময় করা হয়। আর যদি কম বেশিতে বিক্রয় করা হয় এভাবে যে, উভয় পক্ষের কোনো একটি অন্যটির মূল্য অপেক্ষা বেশি যেমন : এক টাকাকে দুইটাকার বিনিময়ে বিক্রয় করা, এক ডলারকে দুই ডলারের বিনিময়ে বিক্রয় করা, তাহলে সে ক্ষেত্রে কমবেশিতে ধাতব মুদ্রা বিক্রয়ের হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর এ ব্যাপারে ফকিহদের প্রসিদ্ধ মতানৈক্য রয়েছে। আর সেটি হলো—একটি ধাতব মুদ্রাকে দুটি ধাতব মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করা শরিয়তের দৃষ্টিতে সুদ হওয়ার কারণে হারাম হবে। ইমাম মালিক রহ. ও হানাফি মাজহাবের ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু হাসান শাইবানি রহ. এই অভিমত পোষণ করেছেন। আর এটিই হাম্বালি মাজহাবের দুটি অভিমতের মধ্যে প্রসিদ্ধ অভিমত। উভয় পক্ষের বিনিময় অনির্দিষ্ট হলে ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ রহ.ও এই অভিমত পোষণ করেছেন।

ইমাম মালিক ইবনু আনাস রহ.-এর কাছে কমবেশি বা বাকিতে বিক্রয় হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে মূল কারণ হলো সেটি 'মুদ্রা জাতীয়' হওয়া। চাই সেটি মৌলিকভাবে মুদ্রাজাতীয় হোক যেমন : সোনা-রুপা। অথবা পারিভাষিকভাবে মুদ্রাজাতীয় হোক। যেমন : সোনা-রুপা ছাড়া অন্য ধাতব মুদ্রা বা কাগুজে নোট।

সুতরাং উভয় বিনিময় যদি এক জাতীয় হয়, তাহলে সেখানে কমবেশি করা ও

---

[৯] তবে মুফতি তকি উসমানি পরবর্তী সময়ে এই অভিমত পোষণ করেছেন যে, যে-কোনো এক পক্ষের বিনিময় নয় বরং উভয় পক্ষের বিনিময়ই চুক্তির মজলিসে হস্তগত করতে হবে। দেখুন—ফিকহুল বুয়ু ২/৭৩৩

[১০] দুররুল মুখতার ও ফাতাওয়া শামি, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৮৪।

বাকিতে লেনদেন করা জায়েজ নেই। ইমাম মালিক রহ.-এর আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা[১১] কিতাবে বর্ণিত হয়েছে—

ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود، حتي يكون لها سكة وعين، لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة؛ لأن مالكًا قال: لا يجوز فلس بفلسين، ولا تجوز الفلوس بالذهب والفضة ولا بالدنانير نظرة.

'মানুষ যদি তাদের পারস্পরিক লেনদেনে এমনভাবে চামড়ার প্রচলন ঘটায় যে, যার কারণে অন্যান্য মুদ্রার মতো তার একটি অবস্থান সৃষ্টি হয়, তাহলে এমন অবস্থায় উক্ত চামড়াকে স্বর্ণ-রুপার বিনিময়ে বাকিতে বিক্রয় করা জায়েজ মনে করি না। কেননা, ইমাম মালিক রহ. বলেছেন, একটি মুদ্রাকে দুটি মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করা জায়েজ নেই এবং মুদ্রাকে সোনা-রুপা ও দিনারের বিনিময়ে বাকি বিক্রয় করা জায়েজ নেই।'[১২]

আর হানাফিদের কাছে যদিও হারামের কারণ হলো এমন বস্তু হওয়া যা ওজনের মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়। আর প্রচলিত মুদ্রার মধ্যে সেটি পাওয়া যায় না। কিন্তু তারপরও তাদের বক্তব্য হলো, এগুলো সমান সমান ও সমজাতীয় হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত। কারণ, মানুষের পরিভাষায় সেগুলোর উন্নত অনুন্নত হওয়ার ব্যাপারটি একেবারেই বাদ দিয়েছে। সুতরাং একটি প্রচলিত মুদ্রাকে যদি দুটি মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করা হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে বিক্রয়চুক্তিতে শর্তের কারণে একটি মুদ্রা কোনো ধরনের বিনিময় ছাড়া হচ্ছে। আর এমনটি হলে সেটি সুদে পরিণত হবে। এ বিধান ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকরী হবে, যতক্ষণ তার মধ্যে মুদ্রা হওয়ার বিষয়টি বিদ্যমান থাকবে। অর্থাৎ সেগুলো নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এই হুকুম বিদ্যমান থাকবে। এরপর ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, এ মুদ্রাগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত প্রচলিত মুদ্রা হিসেবে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার থেকে মুদ্রা হওয়ার বিষয়টি রহিত করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, মানুষের পরিভাষা ও প্রচলনের কারণেই সেগুলো মূল্যবান মুদ্রায় পরিণত হয়েছে। সুতরাং সর্বসম্মত পরিভাষা ছাড়া এই পরিভাষা বাতিল হবে না। তাই লেনদেনে শুধু ক্রেতা-বিক্রেতার জন্য এমন সুযোগ নেই যে, উক্ত মুদ্রা হওয়ার বিষয়টি বাতিল করে সেগুলোকে নির্দিষ্ট

---

[১১] আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা-এটি ইমাম মালিক রহ.-এর রচিত নয় বরং তার পরবর্তী মালিকি ফকিহ ইমাম সাহনুন রহ. তার উসতাজ ইবনুল কাসিম রহ. থেকে—যিনি ইমাম মালিক রহ.-এর শাগরিদ ছিলেন—লিপিবদ্ধ করেন।

[১২] মুদাওয়ানাতুল কুবরা, ইমাম মালিক রহ., খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১০৪।

করবে। অতএব কোনো অবস্থাতেই একটি প্রচলিত মুদ্রাকে দুটি মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করার কোনো সুযোগ নেই।

ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ রহ. বলেন, ক্রেতা-বিক্রেতার পক্ষ থেকে সেগুলো নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে তার মুদ্রা হওয়ার বিষয়টিকে বাতিল করার সুযোগ আছে। আর তখন সেগুলো নির্দিষ্ট পণ্যের মতো হয়ে যাবে এবং কমবেশিতে তার লেনদেন জায়েজ হবে।[১৩]

এখন রয়েছে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ.-এর অবস্থান। উক্ত মাসআলাতে তার থেকে দু-ধরনের মত রয়েছে।

ক. একটি প্রচলিত মুদ্রাকে দুটি মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করা জায়েজ আছে। কেননা, তার কাছে হারাম হওয়ার কারণ হলো, ওজন করে মাপ হয় এমন জিনিস হওয়া। আর মুদ্রাগুলো গণনাকেন্দ্রিক হওয়ায় সে কারণটি পাওয়া যায় না।

খ. উক্ত পদ্ধতিতে বিক্রয় করা জায়েজ নেই। কারণ সেখানে সুদের হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেননা, সেগুলোর আসল অবস্থা হলো ওজন করে মাপা হয় এমন হওয়া। সুতরাং মুদ্রা হিসেবে ঢালাই করার কারণে তার সে আসল অবস্থার হুকুম পরিবর্তন হবে না। যেমন : রুটির ক্ষেত্রে তার হুকুম পরিবর্তন হয় না। (রুটির হুকুম হলো ওজনভিত্তিক বস্তুর হুকুমের মতো। কারণ তার আসল হলো আটা বা ময়দা। আরও দুটি ওজন করে বিক্রয় করা হয়) আল্লামা ইবনু কুদামা রহ. উল্লেখ করেছেন যে—

أن اختيار القاضي أن ما كان يقصد وزنه بعد عمله كالإسطال ففيه الربا، وما لا فلا

আল্লামা কাজি রহ.-এর গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো যেসব ওজনভিত্তিক কাঁচামাল দ্বারা অন্য কিছু তৈরির পরও সেগুলোকে ওজন হিসেবে ব্যবহার করা হয়, সেসব বস্তুর ক্ষেত্রে ওজনের কারণে সুদ হবে। আর যেসব জিনিসের ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে ওজন হিসেবে ব্যবহার করা হয় না সেগুলোর মধ্যে সুদ হবে না। যেমন : স্টীলের পাত্র।'[১৪]

---

[১৩] ইনায়া (ফাতহুল কাদিরের সঙ্গে প্রকাশিত সংস্করণ) খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৬২।

[১৪] আল-মুগনি, শরহে কাবিরের সঙ্গে প্রকাশিত সংস্করণ। আল্লামা ইবনু কুদামা রহ.-এর রচিত। খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১২৮-১২৯। ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়া, খণ্ড : ২৯, পৃষ্ঠা : ৪৬০।

উক্ত ব্যাখ্যার দাবি হলো ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ.-এর কাছে প্রচলিত কারেন্সিকে কমবেশিতে বিক্রয় করা জায়েজ আছে। কারণ, সত্তাগতভাবে কাগজ কোনো ওজননির্ভর জিনিস নয়। কিন্তু ধাতবমুদ্রা তার বিপরীত অবস্থানে। অর্থাৎ সত্তাগতভাবে সেগুলো ওজননির্ভর জিনিস। (আল্লাহ্ ভালো জানেন)

এ বিষয়ে ফকিহদের দ্বিতীয় অভিমত হলো, একটি মুদ্রাকে দুটি মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করা এবং সে ক্ষেত্রে যে-কোনো ধরনের কমবেশি করা জায়েজ আছে। এটি ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর মাজহাব। কেননা, তার কাছে সুদ হওয়ার কারণ হলো, সৃষ্টিগতভাবে জিনিসটি মুদ্রা হওয়া। যেটি স্বর্ণ-রুপার সঙ্গে বিশেষিত। আর প্রচলিত মুদ্রা তার হুকুমে নয়। সুতরাং এ ধরনের মুদ্রার লেনদেনের ক্ষেত্রে, তা প্রচলিত হলেও তার মতে সুদ হবে না। কাজেই এমন মুদ্রার মাঝে কমবেশিতে বিনিময় করা জায়েজ আছে।[১৫]

অনুরূপভাবে ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ রহ.-এর নিকট ক্রেতা-বিক্রেতা যদি এগুলোকে নির্দিষ্ট করে বিক্রয় করে তাহলে একটি মুদ্রাকে দুটি মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করা জায়েজ আছে। কারণ, সেখানে মুদ্রা হওয়ার বিষয়টি থাকে না এবং তা সাধারণ পণ্যের মতো হয়ে যায়।

এই মাসআলাতে অগ্রগণ্য অভিমত

ফকিহদের এই মতনৈক্য সে যুগে ছিলো, যখন সোনা-রুপা সব জিনিসের ক্ষেত্রে মানদণ্ড মনে করা হতো এবং সেগুলোর মাধ্যমে লেনদেনের ব্যাপক প্রচলন ছিলো। আর অন্যান্য মুদ্রার মাধ্যমে লেনদেনের পরিমাণ একেবারেই কম ছিলো। কিন্তু বর্তমানে সোনা-রুপার ধাতব মুদ্রার যুগ শেষ হয়ে গেছে। সারা বিশ্বের কোথাও তেমন মুদ্রা পাওয়া যায় না। সব ধরনের লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাংক-নোট পরিপূর্ণভাবে তার স্থান দখল করে নিয়েছে। এই প্রবন্ধের শুরুতে যার বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

সুতরাং আমার মতামত হলো বর্তমান পরিস্থিতিতে মুদ্রার সঙ্গে মুদ্রার বিনিময়ের ক্ষেত্রে ইমাম মালিক অথবা ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর অভিমত গ্রহণ করা উচিত।

---

[১৫] নেহায়াতুল মোহতাজ, আল্লামা রামলি রহ., খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪১৮। তোহফাতুল মোহতাজ, আল্লামা ইবনু হাজার হাইতামি রহ., খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৭৯। আল্লামা শিরওয়ানি রহ.-এর টীকাসহ।

কেননা, শাফিয়ি মাজহাব ও ইমাম আবু হানিফা এবং আবু ইউসুফ রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী যদি বর্তমানে মুদ্রার হুকুম কার্যকর করা হয়, তাহলে চৌকাঠসহ সুদের দরজা খুলে যাবে। আর এর অন্তরালে সব ধরনের সুদি লেনদেন হালাল হয়ে যাবে। কারণ, ঋণদাতা যদি সুদ নেওয়ার ইচ্ছে করে, তাহলে তার প্রচলিত কারেন্সিকে অন্যের কাছে বেশি দামে বিক্রয় করবে।

প্রবল ধারণা হয় যে, সেসব ফকিহগণ যদি আমাদের যুগে জীবিত থাকতেন এবং আমাদের মতো মুদ্রার ক্রমবিকাশ প্রত্যক্ষ করতেন, তাহলে একটি কারেন্সিকে দুটি কারেন্সির বিনিময়ে বিক্রয় হারাম হওয়ার ফতোয়া দিতেন। আমাদের পূর্ববর্তী অনেক ফকিহ থেকে এ বিষয়টিকে বাস্তবে প্রত্যক্ষ করেছি। 'মা ওরাউন নাহর' এলাকার ফকিহগণ আদালি ও গাতারিফা মুদ্রার মধ্যে খাদের পরিমাণ বেশি দিলে সেগুলোর লেনদেনে কমবেশি করাকে হারাম হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন। সেগুলোর মধ্যে রুপার পরিমাণ একেবারেই কম ছিলো। অথচ এমন ক্ষেত্রে হানাফি মাজহাবের আসল হুকুম হলো এমন মুদ্রা লেনদেনের ক্ষেত্রে কমবেশি করা জায়েজ আছে। কারণ, সে ক্ষেত্রে খাদযুক্ত মুদ্রাকে অন্য মুদ্রায় থাকা রুপার পরিমাণের বিনিময়ে মেনে নিয়ে অতিরিক্ত খাদকে অন্য মুদ্রায় থাকা বেশি রুপার বিনিময়ে ধরা হবে। কিন্তু 'মা ওরাউন নাহরের' আলেমগণ এমন ক্ষেত্রে কমবেশি হারাম হওয়ার ফতোয়া দিলেন। আর তারা নিজেদের ফতোয়ার স্বপক্ষে এ কথার মাধ্যমে কারণ দর্শালেন যে—

أنها أعز الأموال في ديارنا، فلو أبيح التفاضل فيها ينفتح باب الربا

> 'আমাদের এলাকায় এ মুদ্রাগুলোকে সব থেকে উৎকৃষ্ট সম্পদ মনে করা হয়। সুতরাং এগুলোর লেনদেনে কমবেশি করার অনুমতি দিলে সুদের দরজা খুলে যাবে।'[১৬]

এরপর যদি ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ রহ.-এর দলিলের সঙ্গে ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর দলিলকে তুলনা করা হয়, তাহলে ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর দলিল প্রাধান্য পায়। কারণ, ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ রহ.-এর কথা অনুযায়ী ক্রেতা-বিক্রেতার মুদ্রার মূল্যমান বাতিল করার ব্যাপারে ভালো কোনো উদ্দেশ্যও কল্পনা করা যায় না। কেননা, এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম, যারা মুদ্রার মূল্যমানের দিকটিকে বাদ দিয়ে সেটিকে শুধু লোহা বা তামার ধাতু হিসেবে

---

[১৬] হিদায়া, ফাতহুল কদিরের সঙ্গে প্রকাশিত। পরিচ্ছেদ : সরফ, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩৮২।

ক্রয় করতে আগ্রহী হবে। বরং মুদ্রা হওয়ার কারণে মানুষ তার প্রতি আগ্রহী হয়। সুতরাং ক্রেতা-বিক্রেতা যদি মুদ্রার মূল্যমান বাতিল করার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে, তাহলে সেটি সুদ গ্রহণের একটি বাহানা হবে মাত্র। আর এমন বাহানাকে শরিয়ত গ্রহণ করে না। বিশেষকরে আমাদের যুগের কথা তো আরও মারাত্মক। কেননা, এখন সুদ তো প্রচলিত নোটের মধ্যেই কল্পনা করা হয়। কারণ, সারা বিশ্ব থেকে সোনা-রুপার মুদ্রা হারিয়ে গেছে এবং বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, তবে ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ রহ.-এর অভিমতকে সে ক্ষেত্রে কার্যকরী বলা যায়, যেখানে কারেন্সির মাধ্যমে কোনো ধরনের বিনিময় উদ্দেশ্য থাকে না। বরং কেবল সেগুলো জমা করা মূল উদ্দেশ্য থাকে। যেমনটি আমাদের যুগে অনেকের অভ্যাস রয়েছে যে, ইতিহাসের স্মৃতিচারণের উদ্দেশ্যে তারা বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিভিন্ন ধরনের কারেন্সি জমা করে। সুতরাং এ ধরনের কারেন্সির ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ রহ.-এর মতামতটি কল্পনা করা যায়। ফলে এধরনের কারেন্সির ক্ষেত্রে আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ রহ.-এর কথার ওপর ভিত্তি করে কমবেশিতে বিনিময় করার সুযোগ রয়েছে বলে মনে হয়। আর যেসব কারেন্সি দিয়ে কোনো কিছুর বিনিময় করার উদ্দেশ্য থাকে, মৌলিক উপাদান হিসেবে জমা করা উদ্দেশ্য থাকে না। এ ধরনের কারেন্সির পারস্পরিক লেনদেনে (কমবেশি করার ক্ষেত্রে) নমনীয় হওয়ার সুযোগ নেই। কারণ, সেটি হলো সুদের সব থেকে বড়ো উপকরণ। মহান আল্লাহ্ সর্বাধিক অবগত।

সুতরাং আমাদের যুগের জন্য সহিহ্ ও অগ্রগণ্য অভিমত হলো, কাগুজে নোটের পারস্পরিক লেনদেন জায়েজ আছে উভয় পক্ষের পরিমাণ সমান হওয়ার শর্তে। কমবেশিতে জায়েজ নেই।

তবে এ ক্ষেত্রে সংখ্যার দিক থেকে সমান হওয়া উদ্দেশ্য নয়। বরং সেগুলো গায়ের মূল্যের দিক থেকে সমান হতে হবে, ফলে পঞ্চাশ টাকা গায়ের মূল্যের একটি নোটকে এমন পাঁচটি নোটের বিনিময়ে বিক্রি করা জায়েজ হবে, যার প্রত্যেকটির গায়ের মূল্য দশ টাকা। কারণ, এই পাঁচটি নোটের মোট গায়ের মূল্য পঞ্চাশ টাকার সমপরিমাণ। কেননা, এই নোটগুলোর সত্তা, ওজন বা সংখ্যার বিনিময় উদ্দেশ্য হয় না। বরং তার সমপরিমাণের মূল্য উদ্দেশ্য হয়। সুতরাং তার মূল্যের দিক থেকে সমান হওয়া আবশ্যক। নোটের এই মাসআলাটি হুবহু সে মাসআলার মতো, যেখানে ফকিহগণ ধাতব মুদ্রাকে সংখ্যাভিত্তিক বলেছেন, অথচ আসলের দিক থেকে ধাতব হওয়ার কারণে সেগুলো ওজনভিত্তিক জিনিস। এমনটি করার

একমাত্র কারণ হলো, সেগুলোর সত্তার বিনিময় মূল উদ্দেশ্য হয় না। বরং তার গায়ে লিখিত প্রতিনিধিত্বকারী মূল্য উদ্দেশ্য হয়। সুতরাং যদি এমন একটি মুদ্রা হয়, যেটি দশটি মুদ্রার সমপরিমাণ, তাহলে সেটিকে এমন দশটি মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করা জায়েজ আছে, যার প্রত্যেকটির মূল্য একমুদ্রা সমপরিমাণ। এমনকি যারা একটি মুদ্রাকে দুটি মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করাকে হারাম বলেছেন, তাদের কাছেও এমন লেনদেন জায়েজ আছে। কারণ, মূল্যের দিক থেকে সেগুলো সমান। অথবা দশমুদ্রা সমমূল্যের মুদ্রাটি যদিও সংখ্যার দিক থেকে একটি মুদ্রা। কিন্তু হুকুমের দিক থেকে সেটি দশটি মুদ্রার মতো, ফলে কাগুজে নোটের ব্যাপারটিও অনুরূপ। সেখানে বাহ্যিক সংখ্যার প্রতি লক্ষ করা হবে না। হুকুমের দিক থেকে তার সংখ্যার প্রতি লক্ষ করা হবে, তার গায়ে লেখা মূল্যটি যার প্রকাশ ঘটাচ্ছে। মহান আল্লাহ্ সর্বাধিক অবগত।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের কারেন্সির মধ্যে বিনিময়

গবেষণা করে জানা যায় যে, এক রাষ্ট্রের প্রচলিত কারেন্সি একই শ্রেণিভুক্ত। আর বিভিন্ন রাষ্ট্রের কারেন্সি হলো বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত। এমনটি হওয়ার কারণ হলো, বর্তমান সময়ে কারেন্সির বিনিময়ের মাধ্যমে তার সত্তা উদ্দেশ্য থাকে না। বরং সেটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্রয়ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে। আর এই ক্রয়ক্ষমতার প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি রাষ্ট্রের ভিন্নতার কারণে ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন : পাকিস্তানের টাকা, সৌদি আরবের রিয়াল, আমেরিকার ডলার ইত্যাদি। কাজেই প্রত্যেক দেশের কারেন্সির ক্রয়ক্ষমতা সে দেশের সুচক এবং আমদানি-রফতানির ওপর নির্ভর করে ভিন্ন হয়ে থাকে। আর এ ক্ষেত্রে এমন কোনো পদ্ধতি নেই, যার মাধ্যমে এসব ক্রয়ক্ষমতার মাঝে একটি স্থিতিশীল অবস্থান নির্ধারণ করা যায়। বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করে প্রতিদিন এমনকি প্রতি মুহূর্তে এই প্রতিনিধিত্ব ক্ষমতা পরিবর্তন হতে থাকে। এ কারণে, ভিন্ন দেশের কারেন্সির মধ্যে এক জাতীয়করণের জন্য স্থিতিশীল কোনো উপকরণ পাওয়া যায় না। তবে একই দেশের কারেন্সির ব্যাপারটি এর বিপরীত অবস্থানে। কারণ সেখানে প্রচলিত বিভিন্ন কারেন্সির মধ্যে অপরিবর্তনশীল স্থিতিশীল উপকরণ পাওয়া যায়। যেমন : পাকিস্তানের পয়সা ও রুপিয়ার বিষয়টি। তাদের মাঝে এক ও শতের সম্পর্ক রয়েছে। আর এটি এমন এক সম্পর্ক, সূচকের পরিবর্তনে যার

মাঝে কোনো ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে না। কিন্তু পাকিস্তানের রুপিয়া এবং সৌদি আরবের রিয়ালের বিষয়টি হলো, তাদের মধ্যে স্থিতিশীল কোনো সম্পর্ক নেই। বরং কোনো একটির সূচকের পরিবর্তনের কারণে প্রতিটি মুহূর্তে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক পরিবর্তন হতে থাকে। সুতরাং এখান থেকে বোঝা গেলো যে, ভিন্ন দেশের কারেন্সি ভিন্ন জাতীয় হিসেবে বিবেচিত। এ কারণে সেগুলোর নাম, গঠন-প্রকৃতি ও তার একক ভিন্ন হয়ে থাকে।

ভিন্ন দেশের কারেন্সি যখন ভিন্নজাতীয় হিসেবে বিবেচিত হলো, তখন সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমবেশিতে সেগুলো বিক্রি করা জায়েজ আছে। ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর কাছে তো এ কারণে জায়েজ আছে যে, একজাতীয় কারেন্সির ক্ষেত্রেও একটিকে দুটির বিনিময়ে বিক্রি করা তার কাছে জায়েজ আছে। সুতরাং ভিন্ন দেশের কারেন্সির ক্ষেত্রে কমবেশিতে বিক্রি করা জায়েজ হওয়ার ব্যাপারটি আরও যুক্তিসঙ্গত। আর হাম্বালি মাজহাবের একটি সিদ্ধান্তও অনুরূপ। যেমনটি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। ইমাম মালিক রহ.-এর কাছে উক্ত ব্যাপারটি জায়েজ হওয়ার কারণ হলো, তিনি এ ধরনের কারেন্সিকে সুদি মাল হিসেবে গণ্য করেছেন। সুতরাং যখন সেগুলোর প্রকার ভিন্ন হবে, তখন সেগুলোকে কমবেশিতে বিক্রি করা জায়েজ আছে। ইমাম আবু হানিফা ও তার সঙ্গীদের কাছে এমন বিক্রি জায়েজ হওয়ার কারণ হলো, মুদ্রাগুলো সমজাতীয় সমান টুকরো হওয়ার কারণে তারা একটি মুদ্রাকে দুটি মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করাকে হারাম বলেছেন। এভাবে বিক্রি করলে একটি মুদ্রা কোনো ধরনের বিনিময়হীন রয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভিন্ন দেশের কারেন্সি যখন ভিন্নজাতীয় প্রমাণিত হচ্ছে। তখন সেগুলো সমজাতীয় থাকলো না। সুতরাং সেখানে বিনিময়হীন অতিরিক্ত কিছু থাকার বিষয়টি সামনে আসে না। সুতরাং তখন সৌদি আরবের একটি রিয়ালকে একাধিক পাকিস্তানি রুপিয়ার বিনিময়ে বিক্রি করা জায়েজ আছে।

এখন এখানে একটি প্রশ্নের সৃষ্টি হয় যে, অনেক সময় ভিন্ন দেশের কারেন্সির লেনদেনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। সুতরাং সে ক্ষেত্রে উক্ত নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা কমবেশিতে বিক্রি করা জায়েজ আছে কি না? (যেমন : এক ডলার=পনেরো টাকা নির্ধারণ করে দিলো।) আমার অভিমত অনুযায়ী এ প্রশ্নের উত্তর হলো, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কমবেশিতে বিক্রি করাকে সুদ বলা যাবে না। কারণ, ইতোপূর্বে আমরা বলে এসেছি যে, এগুলো ভিন্নজাতীয় কারেন্সি হিসেবে বিবেচিত। তবে সে

ক্ষেত্রে বাজারমূল্য নির্ধারণের মাসআলা প্রযোজ্য হবে। সুতরাং পণ্যের ক্ষেত্রে যারা বাজার মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়াকে জায়েজ বলেছে, তাদের কাছে এ ধরনের মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া জায়েজ আছে। আর বাজারের এই নির্ধারিত মূল্যের বিরোধিতা করা উচিত নয়। তার কারণ হলো, গুনাহ নয় এমন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য করা ওয়াজিব।[১৭] অথবা এ কারণে যে, যারা কোনো রাষ্ট্রে বসবাস করে, তারা প্রত্যেকে মৌখিক বা কার্যত সে রাষ্ট্রের সব আইন মেনে চলতে অঙ্গিকারাবদ্ধ হয়। আর তখনই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো অপরাধে বাধ্য না করলে তার ওপর রাষ্ট্রের সব আইন মেনে চলা ওয়াজিব হয়ে যায়।[১৮] হ্যাঁ তবে এটাও বলা যাবে না যে, এটি সুদি লেনদেন।

পরস্পরে মুদ্রার দখল বুঝে না নিয়েই অন্যের কাছে তা বিক্রি করে দেওয়া

এরপর প্রচলিত এসব কাগুজে নোট যদিও কমবেশিতে লেনদেন করা জায়েজ নেই। তবে সেগুলোর লেনদেন বায়ে সরফ নয়। ফলে চুক্তির মজলিসেই সেগুলো গ্রহণ করা শর্ত নয়। তবে ইমাম আবু হানিফা ও তার সঙ্গীদের অভিমত অনুযায়ী সেগুলো লেনদেনের ক্ষেত্রে এক পক্ষকে কবজা করা শর্ত। কারণ, তাদের অভিমত অনুযায়ী নোট নির্ধারণ করলে সেটি নির্ধারিত হয় না। সুতরাং চুক্তির উভয় পক্ষ যদি কোনো একটি গ্রহণ করা ছাড়া চুক্তির মজলিস ত্যাগ করে, তাহলে ঋণের বিনিময়ে ঋণ রেখে মজলিস ত্যাগ করা আবশ্যক হয়।[১৯] আর অন্য তিন ইমামের অভিমত অনুযায়ী বিনিময়ের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের কোনো একটি নির্দিষ্ট থাকলে চুক্তির মজলিসে কবজা করা শর্ত নয়। কারণ, তাদের অভিমত অনুযায়ী-কারেন্সি নির্ধারণের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে যায়।[২০]

---

[১৭] এ নীতিটিকে অনেক ফকিহ স্পষ্টভাষায় উল্লেখ করেছেন। দেখুন, শরহে সিয়ারে কাবির, আল্লামা সারাখসি রহ. খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬৮। রদ্দুল মুহতার, পরিচ্ছেদ : দুই ইদ, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৮৩। পরিচ্ছেদ : ইস্তেসকা, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৮৫। অধ্যায় : হজর ইবাহাত, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪০৭।

[১৮] আহকামুল কুরআন, মুফতি মুহাম্মাদ শফি রহ., খণ্ড : ৫. পৃষ্ঠা : ৪৩।

[১৯] দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতারের সঙ্গে প্রকাশিত সংস্করণ, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৭৯-১৮০।

[২০] আল-মুগনি, আল্লামা ইবনু কুদামা রহ., পরিচ্ছেদ : সরফ, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৬৯।

এখন প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, বাকিতে কারেন্সি বিক্রয় করা জায়েজ আছে কি না? যেমন : বর্তমান সময়ে ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের মাঝে এটির প্রচলন রয়েছে। তারা এ শর্তে এক দেশের কারেন্সি দেয় যে, গ্রহীতা নির্দিষ্ট সময় পর অন্য দেশের কারেন্সি দেবে। যেমন : জায়েদ এ শর্তে আমরকে সৌদি আরবে এক হাজার রিয়াল দিলো যে, নির্দিষ্ট সময় পর তার পরিবর্তে আমর পাকিস্তানে চার হাজার রুপিয়া দেবে। (এ ধরনের লেনদেন জায়েজ আছে কি না?)

হানাফি মাজহাবের ফকিহগণের অভিমত অনুযায়ী এমন বিক্রি জায়েজ আছে। কারণ, তাদের অভিমত অনুযায়ী কারেন্সি লেনদেনের সময় সেটি বিক্রেতার মালিকানায় থাকা শর্ত নয়, ফলে ভিন্নজাতীয় হওয়ার ক্ষেত্রে সেগুলোকে বাকিতে বিক্রি করা জায়েজ আছে। এ সম্পর্কে আল্লামা শামসুল আইম্মা সারাখসি রহ. বলেন—

وإذا اشتري الرجل فلوسا بدراهم ونقد الثمن، ولم تكن الفلوس عند البائع، فالبيع جائز؛ لأن الفلوس الرائجة ثمن كالنقود. وقد بينا أن حكم العقد في الثمن وجوبها ووجودها معا، ولا يشترط قيامها في ملك بائعها لصحة العقد، كما لا يشترط ذلك في الدراهم والدنانير.»

‘কেউ যদি দিরহামের বিনিময়ে খুচরা পয়সা ক্রয় করে এবং তার মূল্য পরিশোধ করে দেয়। আর পয়সা বিক্রেতার মালিকানায় তখন পয়সা না থাকে, তাহলেও এ বিক্রি জায়েজ হবে। এ কারণে যে, প্রচলিত মুদ্রা ধাতব মুদ্রার হুকুমে। আর ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, ধাতব মুদ্রার বিক্রয়চুক্তির ক্ষেত্রে সেগুলো জিম্মায় ওয়াজিব হওয়া এবং পাওয়া যাওয়া শর্ত। তবে চুক্তি সহিহ হওয়ার জন্য সেটি বিক্রেতার মালিকানায় থাকা শর্ত নয়। যেমন : দিরহাম ও দিনার বিক্রির ক্ষেত্রে শর্ত নয়।’[২১]

সুতরাং তখন উক্ত বিক্রয়চুক্তিটি বাকি বিক্রি হলো, যা ভিন্নজাতীয় জিনিসের ক্ষেত্রে জায়েজ আছে। আবার এ মাসআলাটিকে বায়ে সালামের ভিত্তিতেও উপস্থাপন করা যেতে পারে। কারণ, অধিকাংশ ফকিহের অভিমত অনুযায়ী পয়সার ক্ষেত্রে বায়ে সালাম করা জায়েজ আছে। কারণ, সেগুলো পার্থক্যহীন এমন পরিসংখ্যনীয় জিনিস, যেগুলোকে নির্দিষ্টভাবে আয়ত্ব করা যায়। এমনকি ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর কাছেও এগুলোর বায়ে সালাম জায়েজ আছে যিনি একটি মুদ্রাকে দুটি মুদ্রার

[২১] মাবসুত, ইমাম সারাখসি রহ., খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ২৪।

বিনিময়ে বিক্রি করা হারাম বলেছেন।[২২] অনুরূপভাবে যেসব সংখ্যাভিত্তিক জিনিসে মারাত্মক ব্যবধান হয় না, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ.-এর অভিমত অনুযায়ীও সেগুলোর ক্ষেত্রে বায়ে সালাম করা জায়েজ আছে।[২৩]

অবশ্য সে ক্ষেত্রে বায়ে সালামের শর্ত রক্ষা করতে হবে, সেসব শর্ত সম্পর্কে ফকিহদের মতানৈক্য রয়েছে। যেগুলো সবার কাছে পরিচিত। মহান আল্লাহ্ সর্বাধিক অবগত।

«تعاشروا كالاخوان،

تعاملوا كالأجانب»

'আচরণ করো ভাইয়ের মতো,

তবে লেনদেন করো অপরিচিতের মতো।'

কাগুজে নোটের ক্রয়ক্ষমতা এবং সেটিকে সূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

‘কাগুজে নোটের ক্রয়ক্ষমতা এবং সেটিকে সূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা’ এটি আরবি মাকালা ‘مسئلة تغير قيمة العملة وربطها بقائمة الأسعار।’-এর অনুবাদ। ১৪০৯ হিজরির জুমাদাল উলা মাসের ১-৬ তারিখ অনুযায়ী ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ১০-১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত কুয়েতে অনুষ্ঠিত ‘মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি’র পঞ্চম অধিবেশনে এটি উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তী সময়ে بحوث في قضايا فقهية معاصرة -এর প্রথম খণ্ডে এটি প্রকাশ করা হয়।

—আবদুল্লাহ মায়মান

মাকতাবাতুল ইসলাম মাকতাবাতুল ইসলাম

কাগুজে নোটের ক্রয়ক্ষমতা এবং সেটিকে সূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা

প্রথমত : মূল মাসআলাটির বিবরণ

কাগুজে নোটের মূল্য পরিবর্তন হওয়া এবং মূল্য সূচকের [Price Index] সঙ্গে সেটিকে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি সমকালীন মুদ্রানীতির কারণে সৃষ্ট একটি মাসআলা যা প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। আগের যুগে মুদ্রার নির্দিষ্ট পরিমাণের সঙ্গে কাগুজে নোটের সম্পর্ক ছিলো। যেমন : স্বর্ণ, রুপার মুদ্রা। স্বর্ণ, রুপার মূল্য কমবেশির সঙ্গে কারেন্সির মূল্য কমবেশি হতো। কিন্তু বর্তমানে কাগুজে নোটগুলো সৃষ্টিগত কোনো ধাতব মুদ্রার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। বরং সেগুলো ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নির্ধারণ করে দেওয়া নির্দিষ্ট ক্রয়ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং সৃষ্টিগত কোনো ধাতব মুদ্রার মূল্য কমবেশি হলে তার মূল্য পরিবর্তন হয় না। বরং পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি ও হ্রাসের কারণে কাগুজে নোটের মূল্য পরিবর্তন হয়। ফলে যখনই বাজারে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়, তখন কাগুজে নোটের ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। যেন তার মূল্য কমে গেলো। আর যখনই পণ্যের মূল্য কমে যায়, তখন কাগুজে নোটের ক্রয়ক্ষমতা বেড়ে যায়। যেন তার মূল্য বৃদ্ধি পেলো।

সমকালীন অর্থনীতির পরিভাষায় বললে এভাবে বলতে হয় যে, বর্তমান সময়ে কাগুজে নোটের মূল্যটি দেশে বিরাজমান মুদ্রাহ্রাস ও মুদ্রাস্ফীতির ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং যখনই মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে, তখন তার মূল্য কমে যাবে। আর যখন মুদ্রাহ্রাস বৃদ্ধি পাবে, তখন তার মূল্য বেড়ে যাবে।

মূল আলোচ্য বিষয় শুরু করার আগে মুদ্রাহ্রাস ও মুদ্রাস্ফীতির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া প্রাসঙ্গিক মনে করছি। যেন মূল আলোচ্য বিষয়ে অনুপ্রবেশের আগে সেটিকে বুঝতে সহায়তা করে।

আধুনিক অর্থনীতির পরিভাষা অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতি (Inflation) বলা হয়, নির্দিষ্ট কোনো দেশের এমন অর্থব্যবস্থাকে যেখানে ক্রয়যোগ্য পণ্য ও সেবা অপেক্ষা প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থার আবশ্যকীয় ফলাফল হলো, পণ্য ও সেবার মূল্য বেড়ে যাবে। ফলে ব্যাপক মূল্য বৃদ্ধির মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। কারণ, দেশের প্রচলিত মুদ্রা সে দেশের পণ্য ও সেবার সামগ্রিক চাহিদার প্রতিনিধিত্ব করে। আর দেশে বিদ্যমান পণ্য ও সেবা সামগ্রিক যোগানের প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং অর্থনীতির মৌলিক নীতি অনুযায়ী যখনই পণ্য বা সেবার যোগান অপেক্ষা চাহিদা বৃদ্ধি পাবে, তখনই মূল্য বৃদ্ধি পাবে।

আর মুদ্রাহ্রাস (Deflation) হলো, নির্দিষ্ট কোনো দেশের প্রচলিত মুদ্রা অপেক্ষা পণ্য ও সেবা বেড়ে যাওয়া। আর এটির ফলাফল হলো, পণ্য ও সেবার মূল্যসূচক নেমে যাবে। ফলে ব্যাপক দরপতন সৃষ্টি হবে। কারণ, চাহিদার তুলনায় পণ্যের পরিমাণ বেশি হয়ে গেছে। ফলে তার বাজার মূল্য কমে গেছে। মুদ্রাহ্রাসের সময় অল্প কাগুজে নোটের মাধ্যমে অনেক পণ্য ক্রয় করা যায়। যেমন : মুদ্রাহ্রাসের সময় একশো টাকার বিনিময়ে নিচের পণ্যগুলো এই পরিমাণ ক্রয় করা সম্ভব হতে পারে।

মুদ্রা হ্রাসের সময় ১০০ টাকার পণ্য সামগ্রী

১	গম	২০ কেজি
২	লবণ	২০ কেজি
৩	কাপড়	১০ মিটার

তবে মুদ্রাস্ফীতির সময় উক্ত টাকার বিনিময়ে এ পরিমাণ পণ্য ক্রয় করা যাবে না। বরং মুদ্রাহ্রাসের সময়ের চেয়ে কম পণ্য ক্রয় করতে হবে। যেমন : মুদ্রাস্ফীতির সময় উক্ত টাকার বিনিময়ে নিচের পণ্যগুলো এই পরিমাণ ক্রয় করা যাবে।

মুদ্রাস্ফীতির সময় ১০০ টাকার পণ্য সামগ্রী

১	গম	১০ কেজি
২	লবণ	১০ কেজি
৩	কাপড়	৫ মিটার

উভয় অবস্থাতেই টাকার পরিমাণ ছিলো একশো। কিন্তু প্রথম অবস্থায় দ্বিতীয় অবস্থা অপেক্ষা দ্বিগুণ ক্রয়ক্ষমতা ছিলো। আর বর্তমান সময়ে প্রচলিত কারেন্সি যেহেতু ক্রয়ক্ষমতা ছাড়া ভিন্ন কিছুর প্রতিনিধিত্ব করে না যেটিকে তার প্রকৃত মূল্য বলে অভিহিত করা যায়। এ কারণে, অর্থনীতিবীদরা এ ব্যবধানকে কাগুজে মুদ্রার মূল্য পরিবর্তন বলে নাম দিয়েছে। উল্লিখিত উদাহরণে আমরা লক্ষ করেছি যে, মুদ্রাস্ফীতির সময় কারেন্সির ক্রয়ক্ষমতা শতকরা ৫০% কমে গেছে। এটাকেই অর্থনীতিবীদরা এভাবে ব্যক্ত করেন যে, ১০০ টাকার মূল্য ৫০% কমে গেছে। কারণ, মুদ্রাহ্রাসের সময় সেটি দ্বারা যে পরিমাণ পণ্য বা সেবা ক্রয় করা যেতো মুদ্রাস্ফীতির সময় তার অর্ধেক পণ্য বা সেবা ক্রয় করা যাবে। অথবা আমরা এ কথা বলতে পারি যে, ক্রয়ক্ষমতার দিক থেকে মুদ্রাস্ফীতির সময়ের ১০০ টাকা মুদ্রাহ্রাসের সময়ের পঞ্চাশ টাকার সমান হয়ে গেছে।

সুতরাং এখন প্রশ্ন আসে যে, হক আদায় ও দায়িত্ব মুক্তির ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতির সময়ের একশো টাকাকে কি মুদ্রাহ্রাসের সময়ের একশো টাকার সমান মনে করা হবে? না কি সেটিকে ৫০ টাকার সমান বলে মনে করা হবে? অর্থাৎ মুদ্রাহ্রাসের সময় যে ব্যক্তি কারও থেকে ১০০ টাকা ঋণ নেবে। মুদ্রাস্ফীতির সময় সে কি ওই একশো টাকা পরিশোধ করবে? না কি তার মূল্য কমে যাওয়া এবং তার ক্রয়ক্ষমতা ৫০% কমে যাওয়ার কারণে ২০০ টাকা পরিশোধ করবে? অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে, এ অবস্থাতে শুধু ১০০ টাকা পরিশোধ করলে ঋণদাতার ওপর জুলুম করা হবে। কারণ, ঋণদাতা ঋণগ্রহীতাকে যে পরিমাণ ক্রয়ক্ষমতার টাকা দিয়েছিলো, সে তার অর্ধেক ক্রয়ক্ষমতা সম্পন্ন টাকা পরিশোধ করছে। এজন্যই অনেক অর্থনীতিবিদ উক্ত সমস্যা নিরসনে এ প্রস্তাব দিয়েছেন যে, কাগুজে মুদ্রার মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূল্যসূচকের (Price index) সাহায্য নেওয়া হোক। যেখানে সকল হক ও ঋণ মূল্যসূচক অনুযায়ী কাগুজে নোটের মূল্যমানের ভিত্তিতে আদায় করা হবে। আর মূল্যসূচক (Price index) হলো এমন একটি সূচক যেটিতে দেশে সর্বাধিক প্রচলিত পণ্য সেবাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং সেখানে উক্ত পণ্য বা সেবার অর্থ বছরের শুরুর মূল্য নির্ধারণ করে

নথিভুক্ত করা হয়। এরপর অর্থ বছরের শেষে তার প্রচলিত মূল্যটি নথিভুক্ত হয়। এখন বিশেষ হিসাবের সাহায্যে এ মূল্য দুটির মধ্যকার ব্যবধানের মাধ্যমে সূচকের পরিবর্তন নির্ধারণ করা হয়। যেটিকে অর্থনীতির পরিভাষায় কাগুজে মুদ্রার মূল্য পরিবর্তন বলে অভিহিত করা হয়। তাই এই সূচক পরিবর্তনের পরিমাণ যখন শতকরা ১০% হবে তখন অর্থ বছরের শুরুতে কাগুজে মুদ্রার মাধ্যমে দায়িত্বে আরোপিত পাওনা বছরের শেষে শতকরা ১০% বাড়িয়ে পরিশোধ করতে হবে। সুতরাং এমন ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি অর্থ বছরের শুরুতে ১০০ টাকা ঋণ নিয়েছে, বছর শেষে তাকে ১১০ টাকা পরিশোধ করতে হবে। সেলারি পরিশোধ ও ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে অনেক দেশে এই পদ্ধতিটিকে চালু করা হয়েছে। অতএব শরয়ি দৃষ্টিতে এই পদ্ধতির ব্যবহার জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে আমরা আলোচনা করবো। মহান আল্লাহ্ তাওফিকদাতা।

দ্বিতীয়ত : ঋণকে মূল্যসূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা

ঋণকে মূল্যসূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্য হলো, ঋণী ঋণদাতাকে শুধু ঋণ নেওয়া পরিমাণ টাকা পরিশোধ করবে না; বরং মূল্যসূচকে বৃদ্ধি পাওয়া পরিমাণ টাকাকে ঋণের সঙ্গে যোগ করে দেবে। উদাহরণস্বরূপ কেউ যদি এক হাজার টাকা ঋণ নিয়ে থাকে। আর ঋণ পরিশোধের সময় মূল্যসূচকে শতকরা ১০% মূল্য বৃদ্ধি পায়, তাহলে ঋণদাতাকে এগারো শত টাকা পরিশোধ করবে।

কোনো কোনো অর্থনীতিবীদ এই সূচক পদ্ধতির ব্যবহার জায়েজের পক্ষে এভাবে দলিল দিয়ে থাকনে যে, এই বর্ধিত টাকা বাস্তবে কোনো বর্ধিত টাকা নয়; বরং সেটি হলো, ঋণদাতা তাকে যে পরিমাণ অর্থ ঋণ দিয়েছিলো হুবহু সে পরিমাণ অর্থ তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কেননা, ঋণ দেওয়ার সময় এক হাজার টাকার ক্রয়ক্ষমতা ঋণ পরিশোধের সময় অপেক্ষা বেশি ছিলো। যেটি পরিশোধের সময় শতকরা ১০% কমে গেছে। এখন ঋণগ্রহীতা যদি হুবহু এক হাজার টাকা ফেরত দেয়, তাহলে ঋণদাতার ওপর জুলুম করা হবে। কারণ, সে যে পরিমাণ অর্থ ঋণ দিয়েছিলো তার কাছে পরিপূর্ণ সে পরিমাণ অর্থ ফেরত যাচ্ছে না; বরং তার চেয়ে কম অর্থ যাচ্ছে। সুতরাং আমরা যদি ঋণগ্রহীতার ওপর এ বিষয়টি আবশ্যক করে দিই যে সে ১১০০ টাকা ফেরত দেবে, তাহলে সেটি হবে পরিপূর্ণরূপে ঋণ নেওয়া অর্থ ফেরত দেওয়া। কারণ, এখন ১১০০ টাকার ক্রয়ক্ষমতা ঋণ গ্রহণের

সময়ের ক্রয়ক্ষমতার সমপরিমাণ। তাই অতিরিক্ত অর্থটি হলো কাগুজে মুদ্রার মূল্য কমে যাওয়ার কারণে ঋণদাতার ক্ষতিপূরণস্বরূপ। সেটি মূল ঋণ নেওয়া অর্থের ওপর কোনো ধরনের বাড়িয়ে দেওয়া অর্থ নয়। সুতরাং শরয়ি দৃষ্টিতে এই বৃদ্ধিকে হারাম সুদ হিসেবে দেখার কোনো সুযোগ নেই।

তবে সঠিক কথা হলো, কোনো অবস্থাতেই এ দলিলটি শরয়ি নীতি অনুযায়ী হয় না। কারণ, শরয়ি দৃষ্টিতে ঋণকে তার সমপরিমাণ দিয়েই পরিশোধ করতে হবে। এটি এমন একটি সিদ্ধান্ত যেখানে কারও কোনো দ্বিমত নেই। এমনকি ঋণকে যারা মূল্যসূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করাকে জায়েজ বলেছেন, তাদের কাছেও হুকুমটি অনুরূপ। সুতরাং এখন আমাদের সামনে শুধু সমান হওয়ার বিষয়টি নির্ধারণ করার ব্যাপারটি বাকি রয়েছে। তাই এখানে একটি মৌলিক প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, সমান হওয়ার বিষযটি কি পরিমাণের দিক থেকে হতে হবে। অর্থাৎ কায়েল, ওজন ও সংখ্যার দিক থেকে না কি মূল্যের দিক থেকে সমান হতে হবে? কুরআন-হাদিসের দলিল এবং মানুষের লেনদেন পর্যবেক্ষণ করার দ্বারা যে বিষয়টি বেরিয়ে আসে তা হলো, ঋণের ক্ষেত্রে যে সমান হওয়ার কথা বলা হয়েছে সেটি হলো পরিমাণ ও ওজনের দিক থেকে সমান হতে হবে। মূল্যের দিক থেকে সমান হওয়া জরুরি নয়। বেশ কিছু দলিল এ দাবিটিকে সমর্থন করে। যথা—

১. উদাহরণস্বরূপ কেউ যদি কারও থেকে পাঁচ টাকা সমমূল্যের এক কেজি গম ধার নেয়। এরপর উক্ত গমের মূল্য দুই টাকা হওয়ার পর সে ধারদাতাকে গম পরিশোধ করে, তাহলে এ ক্ষেত্রে সে শুধু এক কেজি পরিমাণ গমই পরিশোধ করবে। অথচ গমের মূল্য পাঁচ টাকা থেকে দুই টাকায় নেমে এসেছে। এ বিধানটি বর্তমান ও অতীতের ফকিহদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। এ ক্ষেত্রে কোনো একজন এমন অভিমত পোষণ করেননি যে, গমের মূল্য কমে যাওয়ার পর ধারদাতাকে শুধু এক কেজি গম ফেরত দেওয়ার মাধ্যমে তার প্রতি অবিচার করা হচ্ছে। বিধায় উক্ত এক কেজি গমের সঙ্গে মূল্য কমে যাওয়া পরিমাণ গম মিলিয়ে ধার পরিশোধ করতে হবে। এটি হলো সব থেকে স্পষ্ট দলিল যে, ঋণের ক্ষেত্রে যে সমান হওয়ার কথা বলা হয়েছে সেটি হলো পরিমাণের দিক থেকে সমান হওয়া। মূল্যের দিক থেকে সমান হওয়া উদ্দেশ্য নয়।

   এ কথার উত্তরে অনেক সময় এ কথা বলা হয় যে, গম এমন একটি পণ্য যার সত্তাগত একটি মূল্য রয়েছে। সুতরাং সত্তাগত মূল্যহীন কাগুজে মুদ্রাকে তার

সঙ্গে মেলানো যাবে না। কিন্তু এ উত্তরটি মূল আলোচনাকে ভেস্তে দেওয়ার শামিল। কেননা, এখানে প্রশ্ন হলো ঋণের ক্ষেত্রে সমান হওয়ার বিষয়টি নির্ধারণ করা। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত সমান হওয়ার ব্যাপারটি পরিমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, মূল্যের দিক থেকে সমান হওয়া উদ্দেশ্য হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত এখানে গম ও কাগুজে মুদ্রার মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হবে না। কারণ, এগুলোর প্রত্যেকটির পরিমাণ ও মূল্য রয়েছে। অতএব গমের ক্ষেত্রে সমান হওয়ার উদ্দেশ্যটি যদি পরিমাণের দিক থেকে হয়ে থাকে, তাহলে কাগুজে মুদ্রার ক্ষেত্রেও অনুরূপ সমান হবে। আর গমের ক্ষেত্রে মূল্যের ব্যবধানকে যদি অকার্যকর বলে আখ্যা দেওয়া হয়, তাহলে কাগুজে মুদ্রার ক্ষেত্রেও হুবহু অনুরূপ বলে আখ্যা দেওয়া হবে।

২. সবার কাছে এ বিষয়টি স্বীকৃত যে, ঋণের ক্ষেত্রে সমান হওয়ার বিধানের উদ্দেশ্য হলো সুদ থেকে বেঁচে থাকা। আর সুদকেন্দ্রিক হাদিসসমূহে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিপূর্ণ স্পষ্টতার সঙ্গে সমান হওয়ার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন—

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال : كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم، وهو الخلط من التمر، فكنا نبيع صاعين بصاع، فبلغ ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم، فقال : (لا صاعين تمرا بصاع، ولا صاعين حنطة بصاع، ولا درهما بدرهمين.

'বুখারি ও মুসলিম শরিফে আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমরা ভালো মন্দ মেশানো খেজুর পেতাম। তখন আমরা দুই 'ছ' (নিম্নমানের) খেজুরকে এক 'ছ' (ভালো) খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করে দিতাম। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়টি জানতে পেরে বললেন, দুই 'ছ' খেজুরকে এক 'ছ'র বিনিময়ে, দুই 'ছ' গমকে এক 'ছ' গমের বিনিময়ে, এক দিরহামকে দুই দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করো না।'[২৪]

এ বিষয়টি জানা কথা যে, বিক্রিত দুই 'ছ' খেজুর অপেক্ষা তার বিপরীতে

[২৪] জামেউল উসুল. আল্লামা ইবনু আসির রহ.-এর রচিত। খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৪৬। বুখারি ২০৮০, মুসলিম ১৫৯৫।

থাকা এক 'ছ' খেজুরের মূল্য বেশি। কিন্তু তারপরও তিনি পরিমাণ ও মাপের দিক থেকে সমান হওয়া ছাড়া এমন পদ্ধতির লেনদেনে রাজি হলেন না। আর উভয় খেজুরের মধ্যকার মূল্যের ব্যবধানকে তিনি অকার্যকর বলে সাব্যস্ত করলেন—

عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءهم بتمر جنيب، فقال : أكل تمر خيبر هكذا؟ قال : إنا لنأخذ الصاع بالصاعين، والصاعين بالثلاث، قال : لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا.

'অনুরূপ ইমাম বুখারি ও মুসলিম রহ. আবু সাইদ খুদরি ও আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে খায়বারের আমেল (জাকাত, ইত্যাদি আদায়কারী) হিসেবে পাঠালেন। সে পাকা খেজুর নিয়ে আসলো। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, খায়বারের সব খেজুর কি এমন? উত্তরে সে বললো, (না) আমরা দুই 'ছ' নিম্নমানের খেজুরের বিনিময়ে এক 'ছ' ভালো খেজুর এবং তিন 'ছ' নিম্নমানের খেজুরের বিনিময়ে দুই 'ছ' ভালো খেজুর নিয়ে থাকি। উত্তর শোনার পর মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এমন করো না। ভালো মন্দ মিশ্রিত খেজুরকে প্রথমে দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করার পর উক্ত দিরহাম দিয়ে ভালো খেজুর ক্রয় করবে।'[২৫]

উল্লিখিত বর্ণনা এ কথার ওপর স্পষ্ট দলিল যে, সুদি জিনিসের মধ্যে সমান সমান হওয়া দ্বারা পরিমাণের দিক থেকে সমান হওয়া উদ্দেশ্য। মূল্যের দিক থেকে সমান হওয়া উদ্দেশ্য নয়। কারণ, ভালো মন্দ মিশ্রিত খেজুর অপেক্ষা পাকা খেজুর অনেক উঁচু মানের এবং বেশি মূল্যের খেজুর। আর গুণগত দিক থেকেও সেটি অনেক ভালো। কিন্তু উভয় খেজুরের পারস্পরিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালো মন্দের বিষয়টিকে অকার্যকর হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন এবং পরিমাপের দিক থেকে সমান হওয়ার বিষয়টিকে আবশ্যক করেছেন।

---

[২৫] জামেউল উসুল, আল্লামা ইবনু আসির রহ.-এর রচিত। খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৫০। বুখারি ২২০১, মুসলিম ১৫৯৩।

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا.

'ইমাম মুসলিম আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রুপার বিনিময়ে রুপা বিক্রি করার ক্ষেত্রে ওজন করে এবং সমান সমান করে বিক্রি করো। কোনো ব্যক্তি বাড়িয়ে দিলে বা বাড়িয়ে নিতে চাইলে সে বর্ধিত অংশ সুদ হিসেবে গণ্য হবে।[২৬]

ইমাম মালিক রহ. উক্ত বর্ণনাটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন—

الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما.

'দিনারের বিনিময়ে দিনার এবং দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম বিক্রির ক্ষেত্রে কোনো কমবেশি করা জায়েজ নেই।'[২৭]

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.

'ইমাম মুসলিম ও অন্যান্য ইমাম উবাদা ইবনু সামেত রা. থেকে বর্ণনা করেন, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে, রুপাকে রুপার বিনিময়ে, গমকে গমের বিনিময়ে, জবকে জবের বিনিময়ে, খেজুরকে খেজুরের বিনিময়ে, লবণকে লবণের বিনিময়ে বিক্রি করার ক্ষেত্রে সমান সমান এবং নগদ হতে হবে। আর যখন এগুলোকে ভিন্নজাতীয় জিনিসের বিনিময়ে বিক্রি করবে, তখন যেমন ইচ্ছে (কমবেশি করে) তেমন করে নগদে বিক্রি করবে।'[২৮]

ইমাম আবু দাউদ রহ. উবাদা ইবনু সামেত রা. থেকে বর্ণনা করেন, মহানবি

[২৬] মুসলিম ১৫৮৮

[২৭] জামেউল উসুল, আল্লামা ইবনু আসির রহ.-এর রচিত। খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৫২। মুয়াত্তা ২/৬৩৩, ৩১।

[২৮] মুসলিম ১৫৮৭

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدْيٌ بِمُدْيٍ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى.

'স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে, রুপাকে রুপার বিনিময়ে ঢালাইকৃত হোক বা টুকরো হোক, সমান সমান করে বিক্রি করো। গমকে গমের বিনময়ে দুই মুদের বিনিময়ে দুই মুদ, যবকে যবের বিনিময়ে দুই মুদের বিনিময়ে দুই মুদ, খেজুরকে খেজুরের বিনিময়ে দুই মুদের বিনিময়ে দুই মুদ, লবণকে লবণের বিনিময়ে দুই মুদের বিনিময়ে দুই মুদ দিয়ে সমান সমান বিক্রি করো। যে ব্যক্তি বাড়িয়ে দেবে বা বাড়িয়ে নিতে চাবে সে সুদ নিলো।'[২৯]

ইমাম মুসলিম রহ. ফাজালাহ ইবনু উবায়েদ রা. থেকে বর্ণনা করেন—

قَالَ : قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّم : الذَّهَب بِالذَّهَب وزنا بِوَزْن « لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ.»

'মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে ওজন করে বিক্রি করতে হবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'ওজন করে সমান করা ছাড়া স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রি করো না।'[৩০]

এইসব হাদিসের প্রত্যেকটি এ কথা বলছে যে, সুদি জিনিসের বিনিময়ের ক্ষেত্রে শরিয়তের কাছে গ্রহণযোগ্য সমতা হলো পরিমাণের দিক থেকে সমতা। মূল্যের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য নয় যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো সুদি মাল হয়। হাদিসে বর্ণিত বিনিময়সমূহ ছিলো নগদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। সুতরাং আসল সুদি কারবার চলে সেই ঋণ সম্পর্কে কী ধারণা, যেখানে সবধরনের বিনিময়হীন অতিরিক্ত এবং অতিরিক্তের সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয় থেকে দূরে থাকা হয়।

৩. এখানে এমন একটি হাদিস রয়েছে যেটি বিশেষভাবে ঋণের ক্ষেত্রে সমান হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করে। সে হাদিসটি হলো ইমাম আবু দাউদ ও অন্যান্য ইমাম কর্তৃক আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণিত হাদিস। তিনি বলেন—

---

[২৯] জামেউল উসুল, আল্লামা ইবনু আসির রহ.-এর রচিত। খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৫৪। আবু দাউদ : ৩৩৪৯।

[৩০] মুসলিম : ১৫৯১।

كُنْتُ أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ —صلى الله عليه وسلم— وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ —صلى الله عليه وسلم— « لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ.»

'বাকি নামক জায়গায় আমি উট বিক্রি করতাম। ফলে অনেক সময় দিনারের বিনিময়ে বিক্রি করে দিরহাম গ্রহণ করতাম। আবার কখনো দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিনার গ্রহণ করতাম। অর্থাৎ দিনারের বিনিময়ে দিরহাম গ্রহণ করতাম আবার দিরহামের বিনিময়ে দিনার দিতাম। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাফসা রা.-এর ঘরে থাকা অবস্থায় আমি তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল, আপনার থেকে একটি বিষয় জানতে চাই। আমাকে একটু সময় দিন। বাকি নামক জায়গায় আমি উট বিক্রি করি, ফলে অনেক সময় দিনারের বিনিময়ে বিক্রি করে দিরহাম গ্রহণ করি। আবার কখনো দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিনার গ্রহণ করি। দিনারের বিনিময়ে দিরহাম গ্রহণ করি। আবার দিরহামের বিনিময়ে দিনার দিয়ে থাকি। এ কথা শুনে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি লেনদেনের দিনের বাজার মূল্যে লেনদেন করে থাকো এবং কোনো কিছু বাকি না রেখে যদি মজলিস ত্যাগ করো, তাহলে এমন লেনদেনে কোনো সমস্যা নেই।'[৩১]

বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমে এভাবে দলিল দেওয়া হয় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনু উমর রা.-এর লেনদেনকে সে ক্ষেত্রে বৈধ বলেছেন, যখন লেনদেনের দিনের বাজার মূল্যে তারা লেনদেন করবে। যে দিন ঋণ আরোপ হয়েছিলো, সে দিনের বাজার মূল্যে লেনদেন করবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দিনারের মাধ্যমে লেনদেন হলো। সে সময় যার

[৩১] আবু দাউদ, অধ্যায় : বুয়ু, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৫০, হাদিস নং ৩৩৫৪। তিরমিজি : ১২৪২।

মূল্য ছিলো দশ দিরহাম। এরপর ক্রেতা যখন মূল্য পরিশোধ করতে চাইলো তখন তার কাছে দিরহাম ছাড়া আর কিছু নেই। আর সেদিন এক দিনারের বাজার মূল্য হলো এগারো দিরহাম, তাহলে তাকে এগারো দিরহাম পরিশোধ করতে হবে।

এ কারণে বকর ইবনু আবদুল্লাহ আল মুজানি ও মাসরুক আল ইজলি আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা.-এর কাছে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তাদের একজন শ্রমিক তাদের কাছে কিছু দিরহাম পাবে। তবে তাদের কাছে দিনার ছাড়া আর কিছু ছিলো না। (তারা এখন কি করবে?) আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. উত্তরে বললেন যে, বাজার মূল্যে তার পারিশ্রমিক পরিশোধ করে দাও। সুতরাং এখান থেকে স্পষ্ট হলো যে, পরিশোধের দিনের মূল্যটিই গ্রহণযোগ্য। দায়িত্বে ঋণ আরোপের দিনের মূল্য গ্রহণযোগ্য নয়। ঋণের ক্ষেত্রে সমান হওয়া দ্বারা যদি মূল্যের দিক থেকে সমান হওয়া উদ্দেশ্য হতো, তাহলে দায়িত্বে ঋণ আরোপের দিনের মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হতো। সুতরাং এটি একটি স্পষ্ট প্রমাণ।

৪. কুরআন-হাদিসের আলোকে সব ফকিহদের স্বীকৃত মাসআলা হলো, ঋণ চুক্তির মধ্যে পরিমাণের দিক থেকে প্রকৃত সমান বিনিময় আদায় করা ওয়াজিব। অনুমান বা ধারণা করে সমান বিনিময় আদায় করা যথেষ্ট নয়। এমনকি কেউ যদি এ শর্তে এক ছ গম ঋণ দেয় যে, অনুমান করে সে এক ছ গম পরিশোধ করবে। পরিমাপের মাধ্যমে নয়, তাহলে এমন চুক্তি করা জায়েজ হবে না। কেননা, সুদি জিনিসের মধ্যে ধারণা বা অনুমান করে লেনদেন করা জায়েজ নেই। এ কারণে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'বায়ে মুজাবানাহ'কে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। আর 'বায়ে মুজাবানাহ' বলা হয় গাছে থাকা খেজুরের বিনিময়ে কর্তিত খেজুর বিক্রয় করা। এখানে হারাম হওয়ার একমাত্র কারণ হলো, কায়েল বা পাত্রে ওজন করে কর্তিত খেজুরের পরিমাণ জানা সম্ভব। তবে গাছে থাকা খেজুরের পরিমাণ অনুমান ও ধারণা করা ছাড়া আর কোনোভাবেই জানা সম্ভব নয়। তাই মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমানকে শর্তহীনভাবে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। চাই সেটি যত সূক্ষ্ম ও সঠিক অনুমান হোক না কেন। সুতরাং সুদি জিনিসের পারস্পরিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে একক পদ্ধতি হলো বাস্তবিক সমানের ভিত্তিতে সেগুলোর বিনিময় করতে হবে। অনুমানভিত্তিক

সমান হওয়ার ওপর নির্ভর করে নয়। সমান হওয়ার বিষয়টি যখন প্রমাণিত হলো, তখন এটি জেনে রাখতে হবে যে, ঋণকে সূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে যে সমানের উদ্ভাবন করা হয়েছে বাস্তবিক অর্থে সেটি কোনো সমান নয়। সেটি হলো অনুমান ও ধারণা নির্ভর সমান। কারণ, সূচকে কমবেশি হওয়ার ব্যাপারটি হলো ধারণা নির্ভর বিষয়। সেটি এমন একটি নির্দিষ্ট হিসাবের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়, যেটি অনুমান ও ধারণা বৈ কিছুই নয়। এ বিষয়টি জানতে আমাদেরকে সূচক প্রতিষ্ঠার নিয়ম এবং কাগুজে মুদ্রার মূল্য নির্ধারণে তার ব্যবহার সম্পর্কে জানতে হবে।

মূল্যসূচক তৈরির পদ্ধতি এবং কাগুজে মুদ্রার মূল্য নির্ধারণে তার ব্যবহার

এ বিষয়ে শরয়ি হুকুম জানতে আমাদেরকে সূচক পদ্ধতি এবং কারেন্সির মূল্য নির্ধারণে তার ব্যবহারবিধি জানতে হবে। অর্থনীতিবিদগণ ঋণকে সূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার দ্বারা যা উদ্দেশ্য নিয়েছেন তার সারাংশ আপনাদের সামনে পেশ করছি।

এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, ধাতব পদার্থের মুদ্রা হোক বা কাগুজে নোট হোক। সেটির আসল সত্তা মূল উদ্দেশ্য হয় না। সরাসরি সেটি ক্ষুধা নিবারণ করতে পারে না, শরীর ঢাকতে পারে না, ইচ্ছে পূরণ করে না ও কোনো সমস্যা দূর করে না। বরং এগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মানুষ তাদের জীবন পরিচালনায় প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবা ক্রয় করবে। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি কাগুজে মুদ্রার দুটি মূল্য রয়েছে। একটি হলো গায়ের মূল্য (Price Value)। যেটি তার ওপর লেখা থাকে। আর অন্যটি হলো তার প্রকৃত মূল্য (Real Value) সেটি হলো প্রয়োজনের সময় এর মাধ্যমে মানুষ যে উপকার পেয়ে থাকে তা অন্যভাবে বললে এ কথা বলতে হয় যে, প্রকৃত মূল্য হলো, সেসব পণ্য ও সেবার সমষ্টি যেগুলোকে এই নোটের মাধ্যমে ক্রয় করা যায়। আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ এই পণ্যের সমষ্টিকে 'পণ্যের ঝুড়ি' "سلة البضائع" (basket of goods) নাম দিয়েছেন। সুতরাং কাগুজে মুদ্রার প্রকৃত মূল্য হলো, এই পণ্যের ঝুড়ি যেটিকে ওই কাগুজে মুদ্রার মাধ্যমে ক্রয় করা যায়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জায়েদ যদি দশ হাজার টাকা মাসিক বেতনের একজন

চাকরিজীবি হয়, তাহলে তার মাসিক বেতনের ফেস ভ্যালু হলো এই দশ হাজার টাকা। এরপর সে ওই দশ হাজার টাকাকে নিচের পণ্যগুলো ক্রয়ে ব্যয় করবে।

পণ্যসামগ্রীর ঝুড়ি

ক্রমিক	পণ্যসামগ্রী	পরিমাণ
১	গম	৪০ কেজি
১	কাপড়	২০ মিটার
৩	গোশত	২০ কেজি
৪	চা	৫ কেজি
৫	বাড়ি ভাড়া	দুই রুম বিশিষ্ট ফ্লাট
৬	শিক্ষা	দুই সন্তানের
৭	ডাক্তারি চেকআপ ফি	মাসে একবার

এই পণ্য ও সেবাগুলোর সমষ্টিকে 'পণ্যের ঝুড়ি' (سلة البضائع, Basket of goods) নামে নামকরণ করা হয়েছে। চাকরিজীবি জায়েদ তার বেতনকে যখন প্রতি মাসে এই পণ্যের ঝুড়ি ক্রয়ে ব্যয় করবে, তখন (বর্ণিত পরিমাণ অনুপাতে) এই পণ্যের ঝুড়িটিই তার মাসিক বেতনের প্রকৃত মূল্য। ঝুড়িতে অন্তর্ভুক্ত পণ্য ও সেবার সূচক পরিবর্তনের কারণে তার এই দশ হাজার টাকা পরিবর্তন হবে। আর এই পণ্য ও সেবাগুলোর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন হয়ে থাকে। তবে অর্থনীতিবিদগণ ঝুড়িতে অন্তর্ভুক্ত পণ্য ও সেবার মূল্য পরিবর্তনকে একটি মধ্যমপন্থায় নির্ধারণ করেছেন।

এরপর ঝুড়িতে অন্তর্ভুক্ত সব পণ্য ও সেবা সমান গুরুত্বের নয়। তার কোনোটি অপরটি অপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, কাপড় অপেক্ষা গম বেশি গুরুত্ব রাখে। চা অপেক্ষা কাপড় বেশি গুরুত্ব রাখে। আর এ কথায় কোনো সন্দেহ নেই যে, যে পণ্যের গুরুত্ব কম সেটি অপেক্ষা যেটির গুরুত্ব বেশি সেটির মূল্য পরিবর্তন মানুষের জীবনে বেশি প্রভাব ফেলবে। সুতরাং যদি গমের মূল্য বৃদ্ধি পায়, তাহলে চায়ের মূল্য বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট সমস্যা অপেক্ষা এটি বেশি সমস্যা সৃষ্টি করবে। বিধায় কারেন্সির প্রকৃত মূল্যের পরিবর্তন জানতে অর্থনীতিবিদগণ প্রত্যেক পণ্যের একটি গুরুত্ববহ সম্ভাব্য নম্বর দিয়েছেন। যেন সূচক পরিবর্তনের

একটি মধ্যমপন্থা আবিষ্কার করা যায়। সুতরাং গুরুত্বের ওপর নির্ভর করে প্রত্যেক পণ্যকে তারা একটি নম্বর দিয়েছেন। এই নম্বরকে 'পণ্যের গুরুত্ববহ নম্বর' (وزن البضاعة, Weight of commodity) নামে নামকরণ করা হয়েছে। অনেক সময় এই গুরুত্বকে নির্ণয় করা হয় প্রতি মাসে উপার্জিত অর্থ থেকে প্রতিমাসে এসব পণ্য ক্রয়ের পেছনে ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে। সুতরাং জায়েদ যদি তার উপার্জিত অর্থের শতকরা ৫০% অর্থকে পরিবারের খাবার ক্রয়ের পেছনে ব্যয় করে, তাহলে খাবারের গুরুত্ববহ নম্বর হবে শূন্য দশমিক পঞ্চাশ (০.৫০)। আর তার উপার্জিত অর্থের ২০% কাপড়ের পেছনে ব্যয় করলে কাপড়ের গুরুত্ববহ নম্বর হবে শূন্য দশমিক বিশ (০.২০)। এভাবে গুরুত্ববহ নম্বর দেওয়া হয়।

১ নং	২ নং	৩ নং	৪ নং	৫ নং	৬ নং
পণ্য	গুরুত্ববহ নম্বর	১৯৮০ সনে পণ্যের মূল্য	১৯৮৭ সনে পণ্যের মূল্য	১৯৮০ ও ১৯৮৭ সনের মাঝে পণ্যের পরিবর্তিত মূল্যের অনুপাত	পরিবর্তনের অনুপাতকে পণ্যের গুরুত্ববহ নম্বর দিয়ে গুণ করে তার ফলাফল
খাবার	০.৫০	৩০ কিলো ৫০ টাকা	৩০ কিলো ১০০ টাকা	২.০ (দ্বিগুণ)	১.০
কাপড়	০. ২০	প্রতি মিটার ১০ টাকা	প্রতি মিটার ৩০ টাকা	৩.০ (তিনগুণ)	০.৬
আবাসস্থান	০.৩০	মাসিক ৫০০ টাকা	মাসিক ১৫০০ টাকা	৩.০ (তিনগুণ)	০.৯
					২.৫

নকশায় উল্লিখিত প্রত্যেক পণ্যের গুরুত্ববহ নম্বরকে তার পরিবর্তিত অনুপাতের নম্বরের সঙ্গে গুণ করে যে ফল বের হবে সেটি হবে প্রত্যেক পণ্যের গুরুত্বের গড় (Weighted Average)।

আমরা যে নকশাটি প্রস্তুত করেছি সেখানে দেখা যাচ্ছে যে, পণ্যের ঝুড়িতে কেবল তিনটি পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সে তিনটি হলো, খাবার, কাপড় ও বাসস্থান।

নকশার নম্বরগুলোর প্রতি লক্ষ করুন। তার (১) পণ্য। (২) পণ্যের গুরুত্ববহ নম্বর। (৩) ১৯৮০ সনে পণ্যের মূল্য। (৪) ১৯৮৭ সনে পণ্যের মূল্য। (৫) ১৯৮০ থেকে ১৯৮৭ সন পর্যন্ত পণ্যের পরিবর্তিত মূল্যের অনুপাত। (৬) পণ্যের পরিবর্তিত মূল্যের অনুপাতকে গুরুত্ববহ নম্বরের সঙ্গে গুণ।

উল্লিখিত নকশায় এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে, প্রত্যেক পণ্যের মধ্যম শ্রেণির গুরুত্ববহ নম্বর অনুযায়ী ১৯৮০ সন থেকে ১৯৮৭ সন পর্যন্ত ২.৫ পার্সেন্ট হারে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আর কাগুজে মুদ্রার প্রকৃত মূল্য যেহেতু পণ্যের ঝুড়ি। সেহেতু ২.৫ পার্সেন্ট হারে কাগুজে মুদ্রার প্রকৃত মূল্য কমে গেছে। এ কথার উদ্দেশ্য হলো, ১৯৮০ সনে একশো টাকা দিয়ে একজন ব্যক্তি যে পরিমাণ পণ্য ক্রয় করতে পারতো, ১৯৮৭ সনে দুইশো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে তাকে ওই পণ্য ক্রয় করতে হবে।

আমরা যদি এমন একটি উদাহরণ মেনে নিই যেখানে ১৯৮০ সনে একজন ৫,০০০ টাকা বেতন পাচ্ছে। আর ১৯৮৭ সনে তার বেতন বেড়ে ১০,০০০ টাকা হলো, তাহলে তার বেতনের আসল মূল্যকে এভাবে হিসাব করা হবে।

সন	বেতনের বাহ্যিক মূল্য	সূচকে মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ	বেতনের প্রকৃত মূল্য
১৯৮০	৫,০০০	১.০	৫,০০০
১৯৮৭	১০,০০০	২.৫	৪,০০০

আমরা এই নকশাতে দেখতে পেলাম যে, একজনের মাসিক বেতন বেড়ে যদিও দশ হাজারে পৌঁছেছে। কিন্তু ১৯৮০ সনের সূচকের প্রতি লক্ষ করলে তার প্রকৃত মূল্য দাঁড়িয়েছে চার হাজারে। কারণ, ১৯৮০ সনের হিসাবে ১৯৮৭ সনে দশ হাজার টাকার প্রকৃত মূল্য দাঁড়িয়েছে চার হাজার টাকা।

সুতরাং আমরা যদি ঋণকে সূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করি এবং এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করি যে, প্রকৃত মূল্যের ভিত্তিতে ঋণ পরিশোধ করতে হবে, তাহলে তার ফলাফল হবে, ১৯৮০ সনে যে ব্যক্তি চার হাজার টাকা ঋণ দিলো, ১৯৮৭ সনে তাকে দশ হাজার টাকা পরিশোধ করতে হবে। কারণ, উভয়টির প্রকৃত মূল্য এক।

কাগুজে মুদ্রার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণের জন্য এই পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টি দিলে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় যে, এ পদ্ধতির প্রতিটি পর্যায় অনুমান ও ধারণানির্ভর। এ পদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, নিচের ক্ষেত্রসমূহে সেটি অনুমান ও ধারণা নির্ভর।

এক. মূল্যসূচকে অন্তর্ভুক্ত পণ্য নির্ধারণ

সর্বসম্মত কথা হলো, প্রত্যেকের বিশেষ কিছু প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং ব্যক্তি ভিন্নতার কারণে প্রয়োজনীয় পণ্যের ভিন্নতা হয়ে থাকে। ফলে প্রত্যেকের পণ্যের ঝুড়ি অন্যের পণ্যের ঝুড়ি অপেক্ষা ভিন্ন হবে। কিন্তু সূচক নির্ধারণের জন্য নির্ধারিত পণ্যের ঝুড়ি শুধু একটি হয়ে থাকে। অধিক ব্যবহারের ভিত্তিতে সেখানে পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। ফলে অনেক সময় সেখানে এমন পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়, কিছু মানুষ যেগুলোর প্রতি কখনোই মুখাপেক্ষী হয় না। তাই এসব মানুষের ক্ষেত্রে সূচকটি প্রকৃত সূচক নয়। অতএব কিছু কিছু পণ্যকে সূচকে অন্তর্ভুক্ত করা অনুমান ও ধারণা বৈ আর কিছু নয়।

দুই. পণ্যের গুরুত্ববহ নম্বর নির্ধারণ

দ্বিতীয় অনুমানটি পাওয়া যায় পণ্যের গুরুত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে। ভোক্তাদের দিক থেকে তার গুরুত্বের বিষয়ে। এ কথায় কোনো সন্দেহ নেই যে, ব্যক্তি ভিন্নতার কারণে পণ্যের গুরুত্বের মাঝে ভিন্নতা আসে। ফলে অনেক সময় কোনো একটি পণ্য কারও জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়। আবার অন্যের ক্ষেত্রে সেটি একেবারেই গুরুত্বহীন হয়ে থাকে। কিন্তু সূচকের নিয়ম অনুযায়ী সব ভোক্তাদের জন্য এক পর্যায়ের গুরুত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। আর সেটি করা হয়েছে একটি মধ্যম পর্যায় নির্ধারণের লক্ষ্যে। ফলে এটি একটি অনুমান ও ধারণা বৈ কিছুই নয়।

তিন. পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা

তৃতীয় অনুমান পাওয়া যায় বিভিন্ন সনের মধ্যে পণ্যের মূল্য নির্ধারণের

ক্ষেত্রে। কেননা, একথাটি স্পষ্ট যে, স্থানের ভিন্নতার কারণেও পণ্যের মূল্য ভিন্ন হয়ে থাকে। তবে সূচকে শুধু এক জায়গার মূল্য অন্তর্ভুক্ত করা ছাড়া আর কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং একটি দেশের জন্য সূচক নির্ধারণ করা একটি মধ্যম পর্যায়ের মূল্য নির্ধারণ ছাড়া আর কিছু নয়। যেটি একটি অনুমাননির্ভর বিষয়।

এখান থেকে স্পষ্ট হলো যে, সূচকের প্রত্যেকটি পর্যায় অনুমাননির্ভর। এখন এ পদ্ধতিকে যদি চূড়ান্ত পর্যায়ের সূক্ষ্মতার সঙ্গে করা হয়, তাহলে সেটির ফলাফল এই হবে যে, সেটি সঠিকতার নিকটবর্তী, তবে একেবারে সঠিক নয়। আর শরয়ি দৃষ্টিতে যেহেতু অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে ঋণ পরিশোধ করা জায়েজ নেই, তাই কোনো অবস্থাতেই ঋণকে সূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা জায়েজ হবে না।

তৃতীয়ত : নোটের মূল্য পরিশোধে ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর অভিমত

ঋণকে মূল্যসূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে অনেক অর্থনীতিবিদ ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর একটি অভিমতকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন। যাতে তিনি বলেছেন, ঋণ পরিশোধের সময় নোটের মূল্য পরিবর্তন হলে সেখানে নোটের প্রকৃত মূল্য দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা যাবে। এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ. বলেছেন—

> وفي المنتقي : إذا غلت الفلوس قبل القبض أو رخصت، قال أبو يوسف : قولي وقول أبي حنيفة في ذلك سواء وليس له غيرها، ثم رجع أبو يوسف، وقال: عليه قيمتها من الدراهم يوم وقع البيع ويوم وقع القبض.
>
> ‘মুন্তাকা কিতাবে বর্ণিত আছে, কবজা করার আগে যদি কারেন্সির মূল্য বেড়ে যায় বা কমে যায়। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন, এ ক্ষেত্রে আমার ও ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর একই অভিমত। আর সেটি হলো, বিক্রেতা নির্ধারিত কারেন্সি ছাড়া আর কিছুই পাবে না। এরপর ইমাম আবু ইউসুফ রহ. তার ওই অভিমত থেকে ফিরে এসে বলেন, বিক্রয় ও পণ্য কবজা করার দিনে কারেন্সির যে মূল্য ছিলো ক্রেতাকে সেটিই পরিশোধ করতে হবে।’

এরপর আল্লামা তমরতকি রহ. থেকে বর্ণনা করেন—

وفي البزازية معزيا إلى المنتقي، غلت الفلوس أو رخصت، فعند الإمام الأول (أي أبي حنيفة) والثاني (أي أبي يوسف) أولا : ليس عليه غيرها، وقال الثاني (أي أبو يوسف) ثانيا : عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض، وعليه الفتوي.

'মুন্তাকা কিতাবের উদ্ধৃতিতে বাজ্জাজিয়া কিতাবে বর্ণিত আছে, কারেন্সির মূল্য কমে যাক বা বেড়ে যাক; ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ রহ.-এর প্রথম অভিমত হলো, তাকে নির্ধারিত কারেন্সি পরিশোধ করতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন, বিক্রয় ও পণ্য কবজার করার দিনের মূল্যে ক্রেতা ওই কারেন্সির মূল্য পরিশোধ করবে। আর এটির ওপরই ফতোয়া।'

এরপর আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ. তার থেকে বর্ণনা করেন—

هكذا في الذخيرة والخلاصة بالعزو إلى المنتقي، وقد نقله شيخنا في بحره وأقره. فحيث صرح بأن الفتوي عليه في كثير من المعتبرات فيجب أن يعول عليه إفتاء وقضاء.

'জখিরা ও খুলাসা কিতাবে মুন্তাকা কিতাবের উদ্ধৃতিতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আমাদের শায়খ রহ. বাহরুর রায়েক কিতাবে এটি উদ্ধৃত করে সেটিকে ঠিক বলেছেন। সুতরাং তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এটির ওপর ফতোয়া। ফলে ফতোয়া ও বিচারের ক্ষেত্রে এটির ওপর ফতোয়া দেওয়া আবশ্যক।'[৩২]

এই উদ্ধৃতির মাধ্যমে অনেক আধুনিক অর্থনীতিবিদ এমন দলিল দিয়েছেন যে, যখন কারেন্সির মাধ্যমে কোনো ঋণ আরোপ হবে, তখন কারেন্সির মূল্য কমবেশি হলে কারেন্সির মূল্যের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। এই অভিমতটি ঋণকে সূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার দর্শনের অনেকটা কাছাকাছি।

তবে এভাবে দলিল পেশ করা সহিহ নয়। আর বাস্তবতা হলো ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর উল্লিখিত অভিমতটি ঋণকে সূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার দর্শনের সঙ্গে কোনো ধরনের সম্পর্ক রাখে না। কেননা, এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, মুদ্রাস্ফীতি,

[৩২] রসায়েলে ইবনু আবিদিন রহ. খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬০।

মুদ্রাহ্রাস, সূচক পদ্ধতি, সূচকের মাধ্যমে কারেন্সির মূল্য নির্ধারণ করা, এগুলোর কোনোটিই ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর যুগে কল্পনাতেও ছিলো না। তাই ইমাম আবু ইউসুফ রহ. যখন কারেন্সির প্রকৃত মূল্যের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধের কথা বলেছেন, তার এই কথার এমন উদ্দেশ্য আবিষ্কার করা সম্ভব নয় যে, তিনি সূচকের মাধ্যমে নির্ধারিত মূল্য উদ্দেশ্য নিয়েছিলেন। অথবা আধুনিক অর্থনীতিবিদদের পরিভাষা অনুযায়ী নোটের প্রকৃত মূল্য (Real Value) উদ্দেশ্য নিয়েছিলেন এমনটি কল্পনা করার সুযোগ নেই।

বাস্তবতা এই যে, আগের যুগের কারেন্সিগুলো স্বর্ণ, রুপার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলো। তার ভিত্তিতে কারেন্সির মূল্য নির্ধারণ করা হতো।[৩৩] তখনকার কারেন্সিকে স্বর্ণ, রুপার মুদ্রার বিকল্প মনে করা হতো। সে সময়ের দশ পয়সা রুপার এক দিরহামের সমান ছিলো। সুতরাং সে সময়ের এক পয়সা একটি রুপার দিরহামের দশ ভাগের এক ভাগের সমান ছিলো। কিন্তু বর্তমান সময়ের কারেন্সিগুলো তার সত্তার দিক থেকে নির্ধারিত মূল্যমানের নয়; বরং মানুষের প্রচলনের কারণে তার একটি কৃত্রিম মূল্য হয়েছে। অতএব এমনটি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যে, বর্তমান সময়ে মানুষ যে দিরহামকে দশ পয়সার সমান মনে করছে, ভবিষ্যতে সে পরিভাষাকে পরিবর্তন করে তারা এক পয়সাকে এক দিরহামের বিশভাগের এক ভাগ হিসেবে সাব্যস্ত করবে। এটি হলো কারেন্সির মূল্য কমে যাওয়ার উদ্দেশ্য। যেমন করে এমনটি হওয়া সম্ভব যে, বর্তমান সময়ে যে দিরহামকে দশ পয়সার সমান মনে করা হচ্ছে ভবিষ্যতে সেটিকে পাঁচ পয়সার সমান মনে করা হবে। এটি হলো কারেন্সির মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্য।

সুতরাং এমন ক্ষেত্রে যদি কারেন্সির মূল্য কমবেশি হয়, তাহলে ঋণী কি হুবহু সে পরিমাণ কারেন্সির মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ করবে, যেটি চুক্তির মাধ্যমে তার ওপর ওয়াজিব হয়েছিলো? না কি ঋণ পরিশোধের দিনে সে পরিমাণ কারেন্সির প্রকৃত মূল্য অনুযায়ী ঋণ পরিশোধ করবে? এ মাসআলার সমাধানের ক্ষেত্রে আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অভিমত হলো, চুক্তির দিনে তার ওপর যে পরিমাণ সংখ্যার কারেন্সি ওয়াজিব হয়েছিলো

---

[৩৩] অন্য এক মাসআলায় আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ. বলেন, এ বিষয়টিকে আরও একটি জিনিস প্রমাণ করে যে, কারেন্সির মূল্য কমবেশি হওয়াকে তারা এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, এটি তখন প্রকাশিত হবে যখন খাদ মিশ্রিত স্বর্ণ, রুপার মুদ্রার মূল্যকে অন্যের সঙ্গে নির্ধারণ করা হবে। রসায়েলে ইবনু আবিদিন, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬২।

হুবহু সে সংখ্যার কারেন্সি পরিশোধ করবে। প্রকৃত মূল্যের কোনো ধর্তব্য নেই। এটিই হলো মালিকি, শাফিয়ি ও হাম্বালি মাজহাবের প্রসিদ্ধ অভিমত।[৩৪]

সুতরাং কেউ যদি এমন সময় কারও থেকে একশো পয়সা ঋণ নেয়, যখন এক পয়সাকে এক দিরহামের দশভাগের একভাগ মনে করা হতো, তাহলে সে এমন পয়সা ঋণ নিয়েছে যার দশটি পয়সা এক দিরহামের সমান। এরপর মানুষের পরিভাষা বা প্রচলনের পরিবর্তন ঘটলো, ফলে এক পয়সাকে এক দিরহামের বিশ ভাগের একভাগ মনে করা হয়। এমন ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহদের অভিমত হলো, সে শুধু একশো পয়সাই পরিশোধ করবে। যদিও পরিশোধের সময় এই একশো পয়সা মাত্র পঞ্চাশ দেরহামের সমান হচ্ছে।

কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ রহ. অধিকাংশ ফকিহদের থেকে ভিন্নমত পোষণ করে বলেছেন, দিরহামের ওপর ভিত্তি করে তাকে পয়সার প্রকৃত মূল্যের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। সুতরাং বর্ণিত উদাহরণে যে ব্যক্তি একশো পয়সা ঋণ নিলো, এখন তাকে দুইশো পয়সা পরিশোধ করতে হবে। কারণ, পয়সা হলো দিরহামের ক্ষুদ্রাংশ, ফলে যে ব্যক্তি একশো পয়সা ঋণ নিলো, সে যেন দশ দিরহামের ক্ষুদ্রাংশ ঋণ নিলো। আর এখন সে দশ দিরহামের ক্ষুদ্রাংশ দুইশো পয়সায় পরিণত হয়েছে। সুতরাং তাকে দুইশো পয়সা পরিশোধ করতে হবে।

আমার কাছে যেটি স্পষ্ট হয় (আল্লাহ ভালো জানেন) ইমাম আবু ইউসুফ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহদের মধ্যকার মতানৈক্যের মূল কারণ হলো পয়সার অবস্থান নির্ধারণ করা। কাজেই যা প্রকাশ পায় তা হলো, অধিকাংশ ফকিহগণ পয়সাকে দিনার, দিরহামের সঙ্গে সম্পৃক্তহীন প্রচলিত একটি স্বতন্ত্র পয়সা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। আর ইমাম আবু ইউসুফ রহ. পয়সাকে দিরহামের ক্ষুদ্রতম অংশের পরিভাষা বলে মনে করেছেন। সুতরাং তার কাছে ঋণ দ্বারা পয়সার সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়। বরং তা দ্বারা দিরহামের ক্ষুদ্রতম অংশ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। ওই পয়সাগুলো যার প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। এ কারণে, দিরহামের সেসব ক্ষুদ্রতম অংশকে পয়সার আকৃতিতে ফেরত দেওয়া আবশ্যক হবে, যদিও ঋণ নেওয়ার পয়সার সংখ্যা থেকে পরিশোধিত পয়সার সংখ্যা ভিন্ন হয়।

---

[৩৪] তানবিহুর রুকুদ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬০। জুরকানি আলা খলিল, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৬০। হাবি লিল ফাতাওয়া, ইমাম সুয়ুতি রহ. রচিত, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৯৭-৯৯। শরহুল কাবির আলাল মুকনা, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৫৮।

কারেন্সির মূল্য কমবেশি হওয়ার কারণে ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী যে ফলাফল প্রকাশ পায় তার দৃষ্টান্ত এই যে, পাকিস্তানি টাকার প্রাথমিক অবস্থায় এক টাকা চৌষট্টি পয়সার (১টাকা=৬৪ পয়সা) সমান ছিলো। (পয়সা কারেন্সির একটি প্রকার।) এরপর রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দশমাংশের নীতি জারি করা হলো। ফলে এমন ঘোষণা দেওয়া হলো যে, এক টাকা একশো পয়সার সমান হবে। সুতরাং এই ঘোষণার আগ পর্যন্ত এক পয়সা ছিলো এক টাকার ৬৪ ভাগের একভাগ। আর এই ঘোষণার পর এক পয়সা এক টাকার একশো ভাগের একভাগে পরিণত হলো। সুতরাং এ দিক থেকে তার মূল্য কমে গেলো। অতএব এই ঘোষণার আগে যে ব্যক্তি ৬৪ পয়সা ঋণ নিয়েছে এই ঘোষণার পর সে কি ৬৪ পয়সা পরিশোধ করবে? না কি একশো পয়সা পরিশোধ করবে?[৩৫] এ প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর হলো, এমন পরিস্থিতিতে তাকে একশো পয়সা পরিশোধ করতে হবে। কেননা, সে একটি টাকার ক্ষুদ্রাংশ ঋণ নিয়েছে। কাজেই তাকে এক টাকার ক্ষুদ্রাংশ ফেরত দিতে হবে। আর বর্তমানে সেটি একশোতে পৌঁছেছে।

সারকথা, ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর অভিমত সেসব পয়সার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যেগুলো অন্য কারেন্সির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেমন : কারেন্সির ক্ষুদ্রাংশ। তবে বর্তমানের প্রচলিত কারেন্সির বিষয়টি হলো, এগুলো অন্য কোনো কারেন্সির সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এবং সেটির ক্ষুদ্রাংশ হিসেবেও এর কোনো ধর্তব্য নেই। বরং সেটি হলো একটি স্বয়ংসম্পন্ন পরিভাষা নির্ভর কারেন্সি।

এ ছাড়াও ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী পয়সার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব। কারণ, সেগুলো একটি স্থিতিশীল মুদ্রার পরিমাণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যা হলো 'দিরহাম'। তবে প্রচলিত কারেন্সি তার থেকে ভিন্ন। আধুনিক অর্থনীতিবিদদের পরিভাষা অনুযায়ী প্রচলিত মুদ্রার প্রকৃত মূল্য জানা সম্ভব নয়। বরং অনুমান ও ধারণানির্ভর হয়ে তার একটি মূল্য নির্ধারণ করা হয়। যেমনটি ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। তাই আগের অবস্থার সঙ্গে প্রচলিত কারেন্সিকে মেলানো যাবে না।

---

[৩৫] বাস্তব অবস্থা এই যে, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এমন ঘোষণার সময় নতুন পয়সা তৈরি করেছে এবং সেটি এমন ছিলো যে, একশো পয়সা এক রুপির সমান। আর আগের পয়সাগুলো তার অবস্থায় প্রচলিত ছিলো, ফলে আমরা যে আলোচনায় রয়েছি তার সঙ্গে এটির মিল হয় না। তবে আমরা যদি এমনটি ধরে নিই যে, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নতুন কোনো পয়সা তৈরি করা হয়নি। বরং আগের প্রচলিত পয়সার মূল্য পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়েছে, তাহলে সেটি আমাদের আলোচনার সঙ্গে মিলবে।

চতুর্থত : কাগুজে মুদ্রার সমতা নির্ধারণে সামাজিক প্রচলনের ভূমিকা

অনেক আধুনিক অর্থনীতিবিদ ঋণকে সূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার বৈধতার পক্ষে এভাবে দলিল দিয়েছেন যে, ঋণের ক্ষেত্রে সমজাতীয় জিনিস দিয়ে পরিশোধ করা ওয়াজিব। তবে সমজাতীয়ের ব্যাখ্যার জন্য সামাজিক প্রচলনের দারস্থ হতে হবে। সুতরাং সামাজিক প্রচলন যেটিকে সমজাতীয় বলে ধর্তব্য মনে করবে শরিয়তের দৃষ্টিতে সেটি সমজাতীয় বলে বিবেচিত হবে। আর আধুনিক অর্থনীতির পরিভাষায় যেহেতু মুদ্রার মূল্য মূল্যসূচকের মাধ্যমে নির্ধারণ করাকে ঋণ নেওয়া মুদ্রার সমজাতীয় বলে বিবেচনা করা হয়েছে। ফলে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে শরিয়তেও সেটি সমজাতীয় বলে বিবেচিত হওয়া উচিত।

কিন্তু তাদের এই দলিলটিও গ্রহণযোগ্য নয়। তার প্রথম কারণ হলো, কুরআন-হাদিসের স্পষ্ট বর্ণনা না থাকলেই কেবল সামাজিক প্রচলনের দ্বারস্থ হতে হয়। আর ইতোপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি যে, সুদকে হারাম সাব্যস্তকারী হাদিস স্পষ্টভাবে সমজাতীয়ের ব্যাখ্যা দিয়েছে। আর সেটি হলো পরিমাণের দিক থেকে সমান হওয়া। সুতরাং এরপর সমতার ব্যাখ্যা জানতে সামাজিক প্রচলনের দ্বারস্থ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

দ্বিতীয় কারণ, অর্থনীতির পরিভাষা অনুযায়ী মুদ্রার প্রকৃত মূল্য আজ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য সামাজিক প্রচলনে পরিণত হয়নি। এমনকি অনেক অর্থনীতিবিদদের কাছেও সেটি গ্রহণযোগ্য নয়। এ কথা সবার জানা যে, বিশ্বের অধিকাংশ দেশসমূহ আজ পর্যন্ত ঋণকে সূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার দর্শনের সঙ্গে একমত পোষণ করেনি। মাত্র কয়েকটি রাষ্ট্রে এই দর্শনের বাস্তবায়ন ঘটেছে। (যেমন : ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া, ইজরাইল ইত্যাদি রাষ্ট্র) সারা বিশ্বের রাষ্ট্রের তুলনায় এই রাষ্ট্রগুলোর সংখ্যা একেবারেই কম। এরপর এ অল্প কিছু রাষ্ট্র যারা এই দর্শনকে গ্রহণ করেছে, তারাও তাদের সব ক্ষেত্রে এটিকে বাস্তবায়ন করেনি। বরং অর্থনীতির বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে এ দর্শন প্রয়োগ করেছে। কারণ, ব্যাপকভাবে সর্বক্ষেত্রে এ দর্শনের বাস্তবায়ন গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এমনকি অর্থনীতিবিদদের কাছেও সেটি গ্রহণযোগ্য হবে না। এ প্রসঙ্গে বেন হোরিম এবং এইচ লেভি এই মন্তব্য করেছেন—

إن استخدام قائمة الأسعار في جميع المعاملات المالية على وجه الشمول أمر لا يمكن حصولة فعلا.

'আর্থিক মুয়ামালার সর্বক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে সূচকের বাস্তবায়ন এমন একটি বিষয়, যার কার্যত বাস্তবায়ন আদৌ সম্ভব নয়।'[৩৬]

এটি একটি স্পষ্ট বিষয় যে, সারা বিশ্বে এমন কোনো রাষ্ট্র পাওয়া যাবে না, যেখানে ব্যাংকের কারেন্ট অ্যাকাউন্টকে সূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। চাই সেখানে মুদ্রাস্ফীতি যত বেশিই হোক না কেন। অধিকাংশ আর্থিক লেনদেনে সূচকের ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্রাজিল সবচে আগে। সম্ভবত মূল্যসূচক পদ্ধতি ব্যবহারে বিশ্বের সব রাষ্ট্রের তুলনায় সে অগ্রপথিক। কিন্তু সেখানেও আজ পর্যন্ত ব্যাংকের কারেন্ট অ্যাকাউন্টে এই পদ্ধতির বাস্তবায়ন করা হয়নি। সুতরাং যারা এই অ্যাকাউন্টে অর্থ জমা রাখবে সে জমাকৃত অর্থ ছাড়া আর কিছু ওঠাতে পারবে না। চাই সূচক বৃদ্ধি পাক বা কমে যাক। এটিই স্পষ্ট প্রমাণ যে, অর্থনীতির পরিভাষায় প্রকৃত মূল্যের দিক থেকে সমান হওয়ার ব্যাপারটি আজ অবধি ব্যাপক প্রচলনে পরিণত হয়নি। এমনকি মুদ্রাস্ফীতির ক্ষতি প্রতিহত করতে যেসব রাষ্ট্রে প্রকৃত মূল্যের দর্শন গ্রহণ করা হয়েছে সেখানেও এটির ব্যাপক প্রচলন ঘটেনি।

ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার দর্শনকে যেসব অর্থনীতিবিদ সমর্থন করেন, তাদের অধিকাংশকে স্পষ্টভাষায় একথা বলতে শুনেছি যে, ভোগের জন্য নেওয়া ঋণের ক্ষেত্রে তারা এই দর্শনকে বাস্তবায়ন করে না। অর্থাৎ কেউ যদি নিজের খাবার, পানীয় ও বাসস্থানের জন্য এক হাজার টাকা ঋণ নেয়, তাহলে সেসব অর্থনীতিবিদদের কাছেও এই ঋণকে সূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হবে না। তারা শুধু শিল্পঋণের ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত করাকে উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

এটি কি তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে ঘোষণা নয় যে, ভোগের জন্য গৃহীত ঋণের ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্যটি সমজাতীয় নয়? সুতরাং ভোগের জন্য গৃহীত ঋণের ক্ষেত্রে সেটি যদি সমজাতীয় না হয়, তাহলে শিল্প ঋণের ক্ষেত্রে কীভাবে সমজাতীয় হবে? কেননা, সমজাতীয় হওয়া এমন একটি বিষয়, ঋণের ভিন্নতার কারণে যার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসে না। অনুরূপভাবে আমরা দেখতে পাই যে, অর্থনীতিবিদগণ প্রকৃত মূল্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার দর্শনকে কেবল মুদ্রাস্ফীতির

---

[৩৬] Ben Horim and H. Levy , Financial Management in an inflationary Evironment, p. ৩৭- ৪০ , as quoted by Umar Chaper, in his paper , " Indexation theory , experience and issues from Islamic perspective" , p . ৩

ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করেন। এমন কাউকে পাওয়া যায় না, যিনি মুদ্রাহ্রাসের সময়ও এই দর্শনকে বাস্তবায়ন করতে চেয়েছেন। এ কথার অর্থ হলো, ধারণাকৃত প্রকৃত মূল্যকে কেবল সূচক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে। তবে ঋণ নেওয়ার পর যদি সূচকের পতন হয়, তাহলে চুক্তির দিনের নির্ধারিত পরিমাণ ঋণকেই পরিশোধ করতে হবে। কেননা, যে ব্যক্তি এক হাজার টাকা ঋণ দিয়েছে, সে কখনোই এমনটি করতে রাজি হবে না যে, সূচকের প্রতি লক্ষ করে এক হাজারের পরিবর্তে আটশত টাকা নেবে। সূচক পতনের ক্ষেত্রেও যদি প্রকৃত মূল্যের দর্শনকে বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে মুদ্রাহ্রাসের কারণে ক্ষতির আশঙ্কায় কেউ ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা রাখবে না।

এটিও একটি দলিল যে, প্রকৃত মূল্যের দর্শনটি কোনো মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত দর্শন নয়। বরং মুদ্রাস্ফীতির ক্ষতি প্রতিহত করার সাময়িক প্রতিষেধক হিসেবে এটির প্রকাশ ঘটেছে। তার আবশ্যকীয় সমস্যা ও অন্যান্য পরিণামের দিকে দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া এটি অস্তিত্বে এসেছে। সুদনির্ভর অর্থনীতির ক্ষেত্রে এ ধরনের দর্শনের অনুপ্রবেশের সুযোগ রয়েছে। তবে যে অর্থনীতি সুদকে পরিহার করে চলতে চায়, সেখানে সূচকের সঙ্গে ঋণ সম্পৃক্ত করার দর্শন একটি পরিত্যাজ্য দর্শন। কুরআন-হাদিস ও যুক্তির দলিলের সামনে সে দাঁড়াতে অক্ষম।

পাকিস্তানের ইসলামি নজরিয়াতি কাউন্সিলের সামনে এই দর্শনকে উপস্থাপন করলে সেখানে উপস্থিত সব আলেম ও অর্থনীতি বিশেষজ্ঞগণ এ কথার ওপর একমত হয়েছিলেন যে, ইসলামি শরিয়তে ঋণকে সূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার কোনো সুযোগ নেই।

অনুরূপভাবে ১৪০৭ হিজরি সনের শাবান মাসে ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক জেদ্দার পক্ষ থেকে আয়োজিত ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত সেমিনারে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণে শুধু এ বিষয়ের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছিলো। সেখানে বিভিন্ন দেশের আলেম ও অর্থনীতিবিদগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। ওই সেমিনারে অংশগ্রহণকারী সদস্যগণ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন সেটি এরূপ—

সিদ্ধান্তসমূহ

১. সুদ, জাকাত ওয়াজিব হওয়া, বায়ে সালাম[৩৭] ও মুদারাবায় মুলধন হওয়া এবং অংশীদারী কারবারে অংশ বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রচলিত কাগুজে মুদ্রা স্বর্ণ, রুপার স্থলাভিষিক্ত হবে। কাগুজে মুদ্রার মূল্য কমবেশি হওয়ার ক্ষেত্রে কাগুজে মুদ্রার প্রকৃত মূল্যের মাধ্যমে পাওনা পরিশোধের বিষয়ে ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর অভিমতটি প্রচলিত কাগুজে মুদ্রার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। কেননা, এই কারেন্সিগুলো স্বর্ণ ও রুপার স্থলাভিষিক্ত। আর এ দুটির মূল্য পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য না হওয়ার বিষয়টি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত।

২. সেমিনারে উপস্থিত আলেমগণ এ কথার প্রতি দৃঢ়তা প্রকাশ করেছেন যে, সুদ ও ঋণের হাদিসে বর্ণিত সমতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সমজাতীয় ও ওজনের দিক থেকে সমান হওয়া। অর্থাৎ ওজন, পরিমাপ ও সংখ্যা। মূল্যের দিক থেকে সমান হওয়া উদ্দেশ্য নয়। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে হাদিসের সেই ইঙ্গিত থেকে, যেখানে সুদি জিনিসের উত্তম ও অনুত্তম হওয়ার বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। আর ইজমায়ে উম্মতের সিদ্ধান্ত ও আলেমদের সর্বসম্মত আমল থেকেও এটি গৃহীত।

৩. দায়িত্বে আরোপিত ঋণ যে ধরনেরই হোক না কেন সেটিকে সূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা জায়েজ নেই। যেমন : বিক্রয়, ঋণ ইত্যাদি ঋণের চুক্তির সময় দু-পক্ষ এ শর্তারোপ করলো যে, বিক্রয় বা ঋণের কারণে তাদের ওপর আরোপিত ঋণ পরিশোধের সময় চুক্তির সময়ে প্রচলিত কাগুজে মুদ্রার প্রকৃত মূল্যের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে।

৪. ভোগ্য জিনিসের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, সেটিকে বস্তু হিসেবে নির্ধারণ করা হবে। আর বিবাদের সময় বাজারদর অনুযায়ী তার মূল্যের মাধ্যমে সমাধান করা হবে। সুতরাং আগের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ঋণকে সূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার কোনো প্রয়োজন নেই।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় যা কিছু আলোচনা করলাম শরয়ি দৃষ্টিতে এ ধরনের মাসাআলা বুঝতে সেটি পথ দেখাবে। আর অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে

---

[৩৭] 'বায়ে সালাম' এমন একটি ক্রয়-বিক্রয় যার মাধ্যমে বিক্রেতা এই দায়িত্ব গ্রহণ করে যে, সে ভবিষ্যতের কোনো একটি তারিখে নির্দিষ্ট জিনিস ক্রেতাকে সরবরাহ করবে এবং তার বিনিময়ে পূর্ণমূল্য বিক্রির সময়ই অগ্রিম নিয়ে নেয়।—সম্পাদক

আমি কিছুই আলোচনা করিনি। কারণ, সেটি আমাদের আলোচনার বাইরের বিষয়। তবে এখানে এ কথাটি উল্লেখ করার প্রয়োজন অনুভব করছি যে, ঋণকে সূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার দর্শনটি সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে আসছে এবং হতে থাকবে স্বয়ং অর্থনীতিবিদদের পক্ষ থেকে কঠিন সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছে। বর্তমানের অধিকাংশ অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা এটি মুদ্রাস্ফীতির প্রতিষেধক বলে মনে করছেন না। তারা এটিকে অচেতনকারী ও ঘুমপাড়ানি ওষুধ বলে মনে করছেন। যা রোগকে ঢেকে রাখে, সেটিকে একেবারে দূর করে না।

বাস্তবতা এই যে, সেটি মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা সমাধান করতে পারে না; বরং সেটিকে আরও দৃঢ় ও গতিশীল করে তোলে। অর্থনৈতিক জীবনে এই অচেতনকারী ওষুধের একটি স্বতন্ত্র ক্ষতি রয়েছে। এ কারণে অনেক রাষ্ট্র সেটিকে একেবারেই পরিহার করেছে। যেমন : ফ্রান্স। আলোচনার এই দিকটি যেহেতু আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়; তাই সেটিকে একেবারেই এড়িয়ে চলছি। আগ্রহী পাঠক এ বিষয়ে লিখিত গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করতে পারেন।

পঞ্চমত : বেতনকে মূল্যসূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা

বেতনকে মূল্যসূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার মাসআলাটি ঋণকে মূল্যসূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার মাসআলা থেকে ভিন্ন। সুতরাং বেতনটি ঋণে পরিণত হওয়ার আগ পর্যন্ত তার ভিন্ন হুকুম হবে। আর সেটি যদি ঋণে পরিণত হয়ে যায়, তাহলে সেটির হুকুম হবে ঋণকে সূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার হুকুমের মতো। এ কথার বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই যে, তিন পদ্ধতিতে বেতনকে সূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে—

১. কাগুজে মুদ্রার নির্ধারিত সংখ্যার হিসাবে বেতন বা সেলারি নির্ধারিত হবে। আর উভয়পক্ষ এই চুক্তি করবে যে, প্রতি বছর সূচকের বৃদ্ধি অনুযায়ী বেতন বৃদ্ধি পাবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কারও জন্য মাসিক তিন হাজার টাকা বেতন নির্ধারণ করলো। আর এই চুক্তি করলো যে, আগামী বছরের শুরুতে সূচকের বৃদ্ধি অনুযায়ী এই নির্ধারিত বেতন বৃদ্ধি পাবে। ফলে এই নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি বছর শেষ হওয়া পর্যন্ত মাসিক তিন হাজার টাকা বেতন পেতে থাকবে। বছরের মাঝে সূচকের প্রতি লক্ষ করা হবে না। এরপর যখন নতুন বছর আসবে এবং সূচক অনুযায়ী সেখানে

শতকরা পাঁচ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাবে, তখন ওই পরিমাণ অনুযায়ী তার বেতন বৃদ্ধি পাবে। ফলে এখন তার বেতন হবে তিন হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা।

অনেক দেশে এই পদ্ধতির বাস্তবায়ন রয়েছে। যেমন : পাকিস্তান। বেতনকে সূচকের সঙ্গে এভাবে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে শরিয়তের পক্ষ থেকে কোনো বাধা নেই। কারণ, এ পদ্ধতির সারকথা হলো, দু-পক্ষ এ সিদ্ধান্তে একমত হয়েছে যে, প্রতি বছর বা ছয়মাস পর এই পরিমাণ বেতন ও সেলারি বৃদ্ধি পাবে। যদিও চুক্তির সময় সে পরিমাণটি নির্দিষ্ট নয়। তবে সে মানদণ্ডটি নির্দিষ্ট আছে, যার ভিত্তিতে বর্ধিত অংশ নির্ধারণ করা হবে, ফলে বর্ধিত পরিমাণের মধ্যে অস্পষ্টতার সন্দেহ দূর হয়ে গেলো। অথবা এ কথা বলা হবে যে, প্রতি বছর সূচকের বৃদ্ধি অনুযায়ী বর্ধিত বেতন বা সেলারির নবায়ন হয়। আর এ ব্যাপারে কোনো শরয়ি নিষেধাজ্ঞা নেই।

২. বেতনকে সূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কারেন্সির মাধ্যমে বেতন নির্ধারিত হবে। তবে চুক্তির মধ্যে এই শর্তারোপ করবে যে, এই নির্দিষ্ট কাগুজে মুদ্রা নির্ধারিত বেতন নয়। বরং মাস শেষে মূল্যসূচক অনুযায়ী এই নির্দিষ্ট কাগুজে মুদ্রার যে মূল্য হবে সেটিই প্রকৃত বেতন হবে।

এটির উদাহরণ হলো, জায়েদ এক মাসের জন্য আমরকে নিয়োগ দিলো। আর এই চুক্তি করলো যে, সূচক অনুযায়ী মাস শেষে বর্তমানের এক হাজার কারেন্সির যে মূল্য হবে সেটিই হলো তার পারিশ্রমিক। আর মাসের মধ্যে সূচকে শতকরা দুই পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেলো, তাহলে মাস শেষে তাকে এক হাজার বিশ কারেন্সি দিতে হবে। কারণ, এই কারেন্সি মাসের শুরুর এক হাজার কারেন্সির সমমূল্যের। কিন্তু মাস শেষে যখন এক হাজার বিশ কারেন্সি নির্ধারিত হয়ে যাবে, তখন এই এক হাজার বিশ কারেন্সি স্থায়ী বেতন হিসেবে থেকে যাবে। সুতরাং মাস শেষে নিয়োগদাতা যদি এক হাজার বিশ কারেন্সি পরিশোধ না করতে পারে এমনকি আরও মাস বা বছর অতিবাহিত হয়ে গেলো, তাহলেও নিয়োগদাতার দায়িত্বে এক হাজার বিশ কারেন্সি ঋণ রয়ে যাবে। সূচকের পরিবর্তনের কারণে ঋণের পরিমাণে কোনো ধরনের পরিবর্তন হবে না। এমনকি এ সময়ের মধ্যে সূচক যদি শতকরা দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায়, তারপরও নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি এক হাজার বিশ কারেন্সি ছাড়া ওই দশ পার্সেন্ট বেশি বেতনের দাবি করতে পারবে না। কেননা, মাসের শুরুতে

তাদের মধ্যে এই চুক্তি হয়েছিলো যে, প্রথম মাস শেষে তাদের নির্ধারিত কারেন্সির যে মূল্য হবে সেটিই তার বেতন হবে। এ ক্ষেত্রে শুধু বেতনের বর্ধিত অংশ নির্ধারণের জন্য সূচকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সুতরাং মৌলিকভাবে একবার যখন বেতন নির্ধারিত হয়ে যাবে, তখন সূচকের ভূমিকা শেষ হয়ে গেলো। আর নিয়োগদাতার ওপর নির্ধারিত পারিশ্রমিক ঋণ হিসেবে সাব্যস্ত হয়ে গেলো। ফলে সূচকে যে ধরনেরই পরিবর্তন হোক না কেন এই ঋণে কোনো কমবেশি হবে না।

আমার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এমন পদ্ধতির শরয়ি হুকুম হলো, সেটি জায়েজ আছে। তবে তার জন্য শর্ত হলো যে, সূচক পদ্ধতি ও তার হিসেব সম্পর্কে উভয় পক্ষকে এমন জ্ঞান রাখতে হবে, যার কারণে কোনো ধরনের বিবাদের সৃষ্টি হবে না। কারণ, চুক্তির শুরুতেই উভয় পক্ষ এ সিদ্ধান্তে একমত হয়েছে যে, এক হাজার কারেন্সি আসল পারিশ্রমিক নয়। বরং মাস শেষে সূচক অনুযায়ী এক হাজার কারেন্সি যে পরিমাণ কারেন্সির সমমূল্যের হবে, সেটিই আসল পারিশ্রমিক। আর সে পদ্ধতিটি একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াধীন এবং উভয় পক্ষ সেটিকে জানে। সুতরাং পারিশ্রমিকের পরিমাণের এই অস্পষ্টতা কোনো বিবাদ সৃষ্টি করবে না। বিষয়টি এমন হলো যে, কোনো ব্যক্তি কাউকে এ শর্তে নিয়োগ দিলো যে, মাস শেষে দশ গ্রাম স্বর্ণের যে মূল্য হবে সেটি তার পারিশ্রমিক। আর মাস শেষে যখন এ বিষয়টি স্থির হয়ে যাবে যে, দশ গ্রাম স্বর্ণের মূল্য হলো দুইশো কারেন্সি। তখন স্পষ্ট হলো যে, তার মাসিক পারিশ্রমিক হলো দুইশো কারেন্সি। এরপর সেটিতে কোনো কমবেশি হবে না। চাই এরপর স্বর্ণের মূল্য কম হোক বা বেশি হোক।

৩. বেতনকে সূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার তৃতীয় পদ্ধতি হলো, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কারেন্সির মাধ্যমে বেতন নির্ধারিত হবে। আর উভয় পক্ষ এই চুক্তি করবে যে, এই পরিমাণ কারেন্সিই আসল পাওনা এবং এটির ওপর চুক্তি সম্পাদিত হবে। কিন্তু নিয়োগদাতার ওপর আবশ্যক হলো যে, পারিশ্রমিক পরিশোধের দিনের সূচক অনুযায়ী বেতন বৃদ্ধি করে দেবে।

এটির উদাহরণ হলো, জনৈক ব্যক্তি এক হাজার কারেন্সির বিনিময়ে একজনকে নিয়োগ দিলো। আর তাদের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত স্থির করলো যে, যখনই এই এক হাজার কারেন্সি পরিশোধ করবে, তখন সূচকের বৃদ্ধি অনুযায়ী বাড়িয়ে পরিশোধ করতে হবে। সুতরাং সে যদি মাস শেষে বেতন

পরিশোধ করে এবং সূচক অনুযায়ী সেদিন শতকরা দুই পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায়, তাহলে এক হাজারের সঙ্গে বিশ কারেন্সি বাড়িয়ে দিতে হবে। আর যদি এক বছর পর পরিশোধ করে, আর পরিশোধের দিন বৃদ্ধির পরিমাণ থাকে শতকরা দশ পার্সেন্ট, তাহলে এক হাজারের সঙ্গে একশো বাড়িয়ে দিতে হবে। অনুরূপ চলতে থাকবে।

আমার মতামত অনুযায়ী এ পদ্ধতির শরয়ি হুকুম হলো, ঋণকে সূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার হুকুমের মতো। আর তা হলো, শরয়ি দৃষ্টিতে এমন করা জায়েজ নেই। যেমনটি ইতোপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আল্লাহ ভালো জানেন।

এই পদ্ধতি ও দ্বিতীয় পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য হলো, দ্বিতীয় পদ্ধতিতে উভয় পক্ষের নির্ধারিত পারিশ্রমিককে নির্দিষ্ট করতে সূচকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সুতরাং মৌলিকভাবে যখন পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয়ে গেছে, তখনই সূচকের কার্যকারিতা শেষ হয়ে গেছে। আর স্থায়ীভাবে নির্ধারিত পারিশ্রমিকই দায়িত্বে ওয়াজিব হয়েছে। আর তৃতীয় পদ্ধতিতে নির্ধারিত পারিশ্রমিক হলো এক হাজার কাগুজে মুদ্রা। ফলে নিয়োগদাতার দায়িত্বে এক হাজার কারেন্সি ঋণ হয়ে গেছে। আর এই ঋণকে সূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। অতএব তার হুকুম হবে ঋণকে সূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার হুকুমের মতো।

এই তৃতীয় পদ্ধতির ক্ষেত্রে আমরা এ কথা বলতে পারি না যে, পারিশ্রমিক নির্ধারণে সূচক তার ভূমিকা পালন করছে। এভাবে যে, যখন ইচ্ছে তখন সূচকের সাহায্যে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে পরিশোধ করবে। কেননা, চুক্তির মজলিসে বা অন্য কোনো সময়ে পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট হওয়া শর্ত। আর সেটি এমন নির্দিষ্ট হতে হবে যে, এরপর আর কোনো কমবেশি হতে পারবে না। সুতরাং স্থায়ীভাবে পারিশ্রমিককে যখন এমন একটি জিনিসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হবে, যার কমবেশি হওয়ার কারণে পারিশ্রমিক কমবেশি হবে। তখন এটি হয়ে গেলো অস্পষ্ট পারিশ্রমিক, যা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে স্থির থাকে না। আর এমন অস্পষ্টতা শ্রম চুক্তিকে বাতিল করে দেয়।

—মুহাম্মাদ তকি উসমানি

কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করা

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

‘কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করা’ এটি আরবি মাকালা ‘أحكام البيع بالتقسيط’-এর অনুবাদ। ১৪১০ হিজরির শাবান মাসের ১৭-২৩ তারিখ অনুযায়ী ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের ১৪-২০ মার্চ পর্যন্ত সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ‘মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি’-এর ষষ্ঠ অধিবেশনে এটি উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তী সময়ে ‘بحوث في قضايا فقهية معاصرة’-এর প্রথম খণ্ডে এটি প্রকাশ করা হয়।

—আবদুল্লাহ মায়মান

মাকতাবাতুল ইসলাম
মাকতাবাতুল ইসলাম

কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করা

কিস্তিতে বিক্রয় করা এমন একটি পদ্ধতি, বর্তমান সময়ে সারা বিশ্বের ইসলামি রাষ্ট্রসমূহে যার ব্যাপক প্রচলন ঘটেছে। এটি এমন এক বিক্রয় পদ্ধতি মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ক্রয়, বাড়ি নির্মাণ ও আধুনিক দামি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে যার সম্মুখীন হয়, যেগুলো তারা নগদে কেনার সামর্থ্য রাখে না। ফলে এই বিক্রয় পদ্ধতি ও তার শাখাগত বিভিন্ন মাসআলার শরয়ি হুকুম বর্ণনা করার প্রয়োজন পড়েছে। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা সেই প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে। মহান আল্লাহর কাছে কামনা করি, তিনি যেন আমাকে সঠিক পথ দেখান এবং যে সিদ্ধান্তের মাঝে তার সন্তুষ্টি সেদিকে আমার বক্ষ খুলে দেন।

প্রথম আলোচনা : কিস্তিতে বিক্রয়ের বাস্তবতা

কিস্তিতে বিক্রয় বলা হয় এমন বাকি বিক্রয় করাকে, যেখানে নির্দিষ্ট কিস্তিতে বিক্রেতার পাওনা শোধ করা হয়। বিক্রেতা নগদে ক্রেতার কাছে পণ্য হস্তান্তর করে। আর ক্রেতা বাকি কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করে। যেসব বেচাকেনায় এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় সেসব বিক্রয়কে بيع بالتقسيط (কিস্তিতে বিক্রি) বলা হয়। চাই সেখানে নির্ধারিত মূল্যটি বাজার মূল্যের সমমূল্যের হোক বা তার চেয়ে কমবেশি হোক। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাজার মূল্য অপেক্ষা কিস্তিতে বিক্রিত পণ্যের মূল্য বেশি হয়ে থাকে। সুতরাং কেউ যদি ওই পণ্যটি নগদে ক্রয় করতে

চায়, তাহলে কিস্তির মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে ক্রয় করতে পারবে। কিন্তু যখন বাকি কিস্তিতে ক্রয় করতে চাচ্ছে, তখন বাজারের নগদ অপেক্ষা বেশি মূল্য ছাড়া বিক্রেতা সেটি বিক্রি করতে রাজি হয় না। সুতরাং বাজারের নগদ মূল্য অপেক্ষা বেশি মূল্য ছাড়া সাধারণত কিস্তিতে বিক্রি করা হয় না।

দ্বিতীয় আলোচনা : বাকির কারণে মূল্য বৃদ্ধি করা

এখান থেকে প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, নগদ অপেক্ষা বাকি মূল্য বেশি হওয়া জায়েজ আছে কি? অতীত ও বর্তমানের ফকিহগণ এ ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। তাদের অনেকে এমন পদ্ধতিতে মূল্য বৃদ্ধিকে অবৈধ বলেছেন। কেননা, সেখানে সময়ের কারণে মূল্য বৃদ্ধি করা হচ্ছে। যেটি সরাসরি সুদ বা সুদের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে। আর সময়ের বিপরীতে দেওয়া মূল্যকে সুদ বলে গণ্য করা হয়। আল্লামা শাওকানি রহ.-এর নাইলুল আওতারের বর্ণনা অনুযায়ী এটি ইমাম জায়নুল আবিদিন আলি ইবনু হুসাইন, নাসের ও মানসুর বিল্লাহ এবং হাদবিয়া (শিয়াদের একটি ফেরকা) এর মাজহাব।[৩৮]

তবে চার ইমাম এবং অধিকাংশ ফকিহ ও মুহাদ্দিসগণ বাজার মূল্য অপেক্ষা বেশি মূল্যে বাকি পণ্য বিক্রিয় করাকে জায়েজ বলেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো, চুক্তির সময় উভয় পক্ষকে এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে যে, এটি নির্দিষ্ট সময়ের ও নির্ধারিত মূল্যে বাকি বিক্রয়। সুতরাং যখন বিক্রেতা বলবে যে, আমি এই পণ্য নগদে এই মূল্যে আর বাকিতে এই মূল্যে বিক্রি করবো। এরপর দুটি মূল্যের কোনো একটি নির্দিষ্ট না করে তারা চুক্তির মজলিস ত্যাগ করলো, এমন বিক্রয় জায়েজ হবে না। তবে যদি উভয় পক্ষ চুক্তির যে-কোনো একটি দিককে নির্দিষ্ট করে, তাহলে সে বিক্রয় জায়েজ হবে।

ইমাম তিরমিজি রহ. তার 'জামে তিরমিজি'তে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন—

نهى رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.

'মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বিক্রির মধ্যে দুই বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।'

---

[৩৮] নাইলুল আওতার, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১২৯।

وقد فسر بعض أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: « أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإن فارقه على أحدهما، فلا بأس، إذا كانت العقدة على أحد منهما.

'কতক আহলে ইলম এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এক বিক্রয়ের মধ্যে দুই বিক্রয়ের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কেউ বলবে, আমি এই কাপড়টি নগদে দশ টাকায় বিক্রি করবো আর বাকিতে বিশ টাকায় বিক্রি করবো। দুটি বিক্রয় প্রস্তাবের কোনো একটি নির্দিষ্ট করে চুক্তির মজলিস ত্যাগ করেনি। যদি কোনো একটি নির্দিষ্ট করে মজলিস ত্যাগ করে, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। কেননা, তখন একটি প্রস্তাবের ওপর বিক্রয় সম্পন্ন হয়েছে।'[৩৯]

ইমাম তিরমিজি রহ.-এর কথার সারাংশ হলো, এ ধরনের বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো মূল্য দুটি অবস্থার মধ্যে দোদুল্যমান থাকা। চুক্তির সময় তার কোনো একটিকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। এ কারণটি মূল্যের মধ্যে অস্পষ্টতাকে আবশ্যক করে। সময়ের কারণে মূল্য বৃদ্ধি এ ধরনের বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ নয়। সুতরাং দোদুল্যমান মূল্যের কোনো একটি নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে যদি মূল্যের অস্পষ্টতার সমস্যাটি দূর হয়ে যায়, তাহলে শরয়ি দৃষ্টিতে এ ধরনের বিক্রয় করতে কোনো সমস্যা নেই।

ইমাম তিরমিজি রহ. যে ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করেছেন সেটি চার ইমাম ও অধিকাংশ ফকিহদের মাজহাব।[৪০] দলিলের দিক থেকে এটি প্রাধান্যপ্রাপ্ত। কেননা, কুরআন-হাদিসে এমন কোনো বক্তব্য নেই, যেটি এ ধরনের বিক্রয়কে নিষিদ্ধ করবে। আর এ ধরনের মূল্য বৃদ্ধির ওপর সুদের সংজ্ঞা প্রযোজ্য হয় না। কারণ, এটি কোনো ঋণ বা সুদি সম্পদকে তার সমজাতীয় জিনিসের বিনিময়ে বিক্রয় করা নয়। বরং এটি শুধু একটি বিক্রয়। আর বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতার ইচ্ছে অনুযায়ী যে-কোনো মূল্যে বিক্রি করা জায়েজ আছে। বিক্রেতার ওপর এটি

---

[৩৯] জামে তিরমিজি, অধ্যায় : বিক্রয়, পরিচ্ছেদ নং ১৮, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৫৩৩। হাদিস নং ১৩৩১। (বৈরুত থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)

[৪০] আল-মুগনি, আল্লামা ইবনু কুদামা রহ. খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৯০। আল-মাবসুত, ইমাম সারাখসি রহ., খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৮। দুসুকি আলাশ শরহিল কাবির, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৫৮। মুগনিল মোহতাজ, আল্লামা শারবিনি রহ., খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩১।

আবশ্যক নয় যে, সবসময় বাজার মূল্যে পণ্য বিক্রি করবে। আর মূল্য নির্ধারণ ও নিষ্পত্তির বিষয়ে ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন পদ্ধতি থাকে। সুতরাং অনেক সময় অবস্থাভেদে পণ্যের মূল্য ভিন্ন হয়ে থাকে। আর শরিয়ত এমনটি করতে নিষেধ করেনি যে, কেউ তার পণ্যকে এক সময় নগদে এক মূল্যে বিক্রি করবে আর অন্যসময় বাকিতে অন্য মূল্যে বিক্রি করবে।

এ ছাড়া সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে ব্যক্তি তার পণ্যকে নগদে আট টাকা আর বাকিতে দশ টাকায় বিক্রি করবে, তার জন্য এমন করা জায়েজ আছে যে, কোনো ধরনের ধোঁকা ও প্রতারণা ছাড়া সেই পণ্যটিকে নগদে দশ টাকায় বিক্রি করবে। সুতরাং, ওই পণ্যটি দশ টাকায় বাকিতে বিক্রি করা জায়েজ হবে না কেন?

এ মাসআলাটি যেহেতু প্রচলিত চার মাজহাবের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এবং অধিকাংশ ফকিহ ও মুহাদ্দিসের অভিমত অনুযায়ী বৈধ। তাই এ ব্যাপারে কুরআন-হাদিসের দীর্ঘ দলিল বর্ণনা করার প্রয়োজনবোধ করছি না। বরং এ আলোচনাতে সেটি জায়েজ হওয়ার সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে তার কিছু ব্যাখ্যা ও শাখাগত বিষয়ের ব্যাপারে কথা বলার ইচ্ছে করছি।

এক. জায়েজ হওয়ার জন্য শর্ত হলো সুনিশ্চিতভাবে একটি মূল্য নির্দিষ্ট করা

আগেও আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে, পণ্যের দাম করার সময় বিক্রেতার পক্ষ থেকে বিভিন্ন মূল্য বলাতে কোনো সমস্যা নেই। সুতরাং সে এমন বলতে পারে যে, নগদে আট টাকায় বিক্রি করবো। আর বাকিতে দশ টাকায় বিক্রি করবো। কিন্তু প্রশ্ন হলো যে, সময়ের কারণে কি ভিন্ন মূল্য বলা জায়েজ আছে? উদাহরণস্বরূপ সে এমন বলবে যে, একমাস মেয়াদে দশ টাকায় বিক্রি করবো, আর দুই মাস মেয়াদে বারো টাকায় বিক্রি করবো?-এ ব্যাপারে আমি ফকিহদের কোনো স্পষ্ট বক্তব্য পাইনি। তাদের আগের বক্তব্যের ওপর কিয়াসের দাবি হলো এটিও জায়েজ হওয়া। কারণ, নগদ ও বাকি হওয়ার কারণে তারা যখন মূল্যের ভিন্নতাকে জায়েজ বলেছেন, তখন সময়ের ভিন্নতার কারণেও মূল্যের ভিন্নতা হওয়া জায়েজ আছে। কেননা, এ দুটির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

তবে শুধু দরদামের সময় মূল্যের এই ভিন্নতা উল্লেখ করা জায়েজ আছে। মূল চুক্তির সময় এমনটি করা জায়েজ নেই। হ্যাঁ, তবে উভয় পক্ষ যদি নির্দিষ্ট সময় ও মূল্যের ওপর একমত হয়, তাহলে জায়েজ হবে। সুতরাং দরদামের

সময় উল্লিখিত একাধিক মূল্যের কোনো একটিকে নির্দিষ্ট করা আবশ্যক। অতএব বিক্রেতা যদি এমন বলে যে, তুমি যদি একমাস পরে মূল্য পরিশোধ করো, তাহলে ১০ টাকা। আর যদি দুইমাস পর পরিশোধ করো, তাহলে ১২ টাকা। আর যদি তিনমাস পর পরিশোধ করো, তাহলে ১৪ টাকা। এরপর কোনো একটি কিস্তি নির্দিষ্ট না করে এ আশায় তারা চুক্তির মজলিস ত্যাগ করলো যে, ক্রেতা তার সুবিধা মতো বর্ণিত মূল্যের যে-কোনো একটি গ্রহণ করবে, তাহলে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এমন বিক্রয় হারাম হবে। আর তাদের জন্য ওয়াজিব হলো স্পষ্টভাবে কোনো একটি মূল্য নির্দিষ্ট করে নতুনভাবে চুক্তি করা।

দুই. শুধু মূল্য বৃদ্ধি করা জায়েজ আছে, সুদ নেওয়া নয়

এখানে যে বিষয়টির প্রতি লক্ষ রাখা আবশ্যক সেটি হলো, এ ধরনের বিক্রয় জায়েজ হওয়ার পক্ষে যে বক্তব্য দেওয়া হয়েছে তা দ্বারা উদ্দেশ্য শুধু মূল্য বৃদ্ধি করা। আর কিছু মানুষ যে কাজটি করে থাকে সেটি হলো, বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তারা পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে। আর অতিরিক্ত অংশকে এভাবে উল্লেখ করে যে, তা মূল্য পরিশোধ বিলম্বিত হওয়ার বিনিময়। এ ধরনের লেনদেন স্পষ্ট সুদ। এ পদ্ধতি হলো ওই পদ্ধতির অনুরূপ, যেখানে বিক্রেতা বললো যে, এই পণ্যটি নগদ আট টাকায় তোমার কাছে বিক্রি করলাম। তুমি যদি মূল্য পরিশোধে একমাস বিলম্ব করো, তাহলে আট টাকার সঙ্গে তোমাকে আরও দুই টাকা বেশি দিতে হবে। এই বর্ধিত টাকাকে সুদ বলুক বা না বলুক, সেটি সুদি লেনদেন হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা, পণ্যের মূল্য আট টাকা হওয়ার বিষয়টি নির্ধারিত হয়ে গেছে। আর ক্রেতার ওপর এই আট টাকাই ঋণ সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং, এই আট টাকা ছাড়া বিক্রেতা আর যা কিছু চাইবে সেটি সুদ ছাড়া আর কিছু হবে না।

এই পদ্ধতি দুটির মধ্যে কার্যত ব্যবধান হলো, প্রথম ক্ষেত্রে যেটিকে মূল্য হওয়ার কল্পনা করা হয়েছিলো। পরবর্তী সময়ে একটি দিক নির্দিষ্ট করার পর সেটি নিশ্চিত মূল্যে পরিণত হয়েছে। বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর সেটি পরিশোধে ক্রেতার অবস্থার ভিন্নতার কারণে এই মূল্যে কোনো কমবেশি হবে না। সুতরাং ক্রেতা যদি এই শর্তে দশ টাকায় কোনো পণ্য ক্রয় করে যে, একমাস পর মূল্য পরিশোধ করবে। কিন্তু দুই মাসের আগে

সে ওই মূল্য পরিশোধ করতে পারছে না, তাহলে এ অবস্থায় মূল্য তার আগের অবস্থাতেই থাকবে। পরিশোধে বিলম্ব হওয়ার কারণে মূল্য বাড়বে না। কিন্তু দ্বিতীয় পদ্ধতিতে প্রকৃত মূল্য ৮ টাকা। আর তার ওপর যে সুদ চাওয়া হচ্ছে সেটি মূলত পরিশোধে বিলম্বের কারণে চাওয়া হচ্ছে। ফলে পরিশোধের সময় যত দীর্ঘ হবে, ঋণের পরিমাণও বাড়তে থাকবে। সুতরাং একমাসে ২ টাকা, দুইমাসে ৪ টাকা, এভাবে বাড়তে থাকবে। অতএব প্রথম পদ্ধতি হালাল বিক্রয়ের একটি পদ্ধতি। আর দ্বিতীয় পদ্ধতি শরিয়তে হারাম সুদের একটি প্রকার।

তৃতীয় আলোচনা : ঋণকে গ্যারান্টিযুক্ত করা এবং তার বিভিন্ন পদ্ধতি

বাকি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যেহেতু বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হওয়া মাত্র ক্রেতার ওপর তার মূল্যটি ঋণ সাব্যস্ত হয়। তাই বিক্রেতার জন্য ওই ঋণের গ্যারান্টি বা মেয়াদান্তে মূল্য পরিশোধের জন্য কোনো জামানত চাওয়া বৈধ আছে।

১. বন্ধক রাখা

মেয়াদ শেষে ঋণ পরিশোধের জামানতটি বন্ধকের পদ্ধতি বা তৃতীয় পক্ষের দায়িত্ব (কাফালাত) নেওয়ার মাধ্যমে হতে পারে। প্রথম পদ্ধতিতে ক্রেতা তার মালিকানাধীন কোনো জিনিসকে বিক্রেতার কাছে বন্ধক রাখবে। আর ঋণ পরিশোধের জামানত হিসেবে কোনো ধরনের উপকার গ্রহণ ছাড়া সেটিকে বিক্রেতা নিজের কাছে রাখতে পারবে। কেননা, বন্ধকি জিনিস থেকে উপকৃত হওয়া সুদের একটি অংশ। তবে ক্রেতাকে চুক্তিকৃত কিস্তি আদায়ের ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করতে বন্ধকি জিনিসটি বিক্রেতার কাছে থাকবে। আর মেয়াদ শেষে ক্রেতা যদি মূল্য পরিশোধ না করে, তাহলে বিক্রেতা ওই বন্ধকি জিনিসটি বিক্রি করে মূল্য উসুল করতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে তাদের মধ্যকার চুক্তিকৃত মূল্যের চেয়ে বেশি উসুল করা বৈধ হবে না। ফলে বন্ধকি জিনিসটি বিক্রি করার পর পাওনা পরিশোধ শেষে যদি অতিরিক্ত কিছু থেকে যায়, তাহলে সেটি ক্রেতাকে ফেরত দিতে হবে। যেমনিভাবে ক্রেতার মালিকানাধীন জিনিস বন্ধক রাখা জায়েজ আছে। তেমনি করে তার মালিকানাধীন কোনো জিনিসের দলিল বন্ধক রাখাও জায়েজ আছে।

মূল্য পরিশোধের জন্য বিক্রেতা কর্তৃক বিক্রিত পণ্যটিকেই বন্ধক রাখা

বর্তমান সময়ে মানুষের মাঝে প্রচলিত একটি লেনদেন সম্পর্কে আমি অবগত হয়েছি যে, বাকি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা সম্পূর্ণ মূল্য বা নির্দিষ্ট কিস্তি পরিশোধ করার আগ পর্যন্ত বিক্রেতা পণ্য আটকে রাখে।

মূল্য পরিশোধের জন্য বিক্রেতা কর্তৃক পণ্য আটকে রাখা দুটি পদ্ধতিতে হতে পারে। যথা—

১. মূল্য পরিশোধের জন্য পণ্য আটকে রাখা।
২. বন্ধকের পদ্ধতিতে পণ্য আটকে রাখা।

এ দুটির মধ্যে ব্যবধান হলো, বিক্রেতাকর্তৃক পণ্য আটকে রাখলে সেটি তার বিক্রিত মূল্যের সঙ্গে দায়বদ্ধ হয়। বাজার মূল্যে দায়বদ্ধ হয় না, ফলে বিক্রেতা পণ্য আটকে রাখা আবস্থায় সেটি যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং তার ওপর বাজার মূল্যের জামানত আসবে না। তবে বন্ধকের ক্ষেত্রে বিক্রেতার পক্ষ থেকে কোনো ধরনের সীমালঙ্ঘন ছাড়া যদি পণ্যটি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হবে না। বরং সে ক্ষেত্রে ক্রেতার সম্পদ নষ্ট হয়েছে বলে বিবেচিত হবে এবং পণ্যের বিক্রয় মূল্য বহাল থাকবে। আর যদি বিক্রেতার পক্ষ থেকে সীমালঙ্ঘনের কারণে পণ্যটি নষ্ট হয়, তাহলে সে তার বাজার মূল্যে ক্ষতিপূরণ দেবে, বিক্রয় মূল্যে নয়।

প্রথম পদ্ধতি : মূল্য পরিশোধের জন্য পণ্য আটকে রাখা। কিস্তিতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি জায়েজ নেই। কারণ, কিস্তিতে বিক্রয় হলো বাকি বিক্রয়। আর শুধু নগদ বিক্রির ক্ষেত্রেই মূল্য পরিশোধের জন্য পণ্য আটকে রাখার অধিকার থাকে। বাকি বিক্রির ক্ষেত্রে বিক্রেতার জন্য পণ্য আটকে রাখার অধিকার নেই। 'ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াতে' বর্ণিত হয়েছে—

قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: للبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن إذا كان حالا، كذا في المحيط، وإن كان مؤجلا فليس للبائع أن يحبس المبيع قبل حلول الأجل ولا بعده، كذا في المبسوط.

'আমাদের ইমামগণ বলেছেন, নগদ বিক্রির ক্ষেত্রে বিক্রেতার মূল্য পরিশোধের জন্য বিক্রেতার পক্ষ থেকে পণ্য আটকে রাখার অধিকার রয়েছে। মুহিত কিতাবে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। আর যদি বাকি বিক্রি

হয়, তাহলে বিক্রেতার জন্য মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে বা পরে পণ্য আটকে রাখা জায়েজ নেই। মাবসুত কিতাবে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে।'[৪১]

দ্বিতীয় পদ্ধতি : পণ্য ক্রয়ের কারণে ক্রেতার ওপর যে মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হয়েছে, সেটির বন্ধক হিসেবে বিক্রেতা তার বিক্রিত পণ্যকে নিজের কাছে আটকে রাখবে। এ পদ্ধতিটি দু-ভাবে হতে পারে। যথা :

এক. ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে পণ্যটি কবজা করার আগেই বিক্রেতার কাছে সেটি বন্ধক রাখবে। এ পদ্ধতিটি জায়েজ নেই। কারণ, এটি মূল্য পরিশোধের জন্য বিক্রেতা কর্তৃক পণ্য আটকে রাখার মতো। আর বাকি বিক্রির ক্ষেত্রে এমন করা জায়েজ নেই। ইতোপূর্বে যার আলোচনা করেছি।

দুই. প্রথমে ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে পণ্যটি কবজা করবে। এরপর বন্ধক হিসেবে সেটিকে বিক্রেতার কাছে ফেরত দেবে। অধিকাংশ ফকিহের কাছে এ পদ্ধতি জায়েজ আছে। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. 'জামে সগিরে' বলেন—

ومن اشتري ثوبا بدراهم، فقال للبائع: أمسك هذا الثوب حتي أعطيك الثمن، فالثوب رهن.

'যে ব্যক্তি দিরহামের বিনিময়ে কোনো কাপড় ক্রয় করার পর বিক্রেতাকে বললো, তোমাকে মূল্য পরিশোধ করার আগ পর্যন্ত এটিকে তোমার কাছে রেখে দাও, তাহলে এই কাপড়টি বন্ধকি জিনিস বলে সাব্যস্ত হবে।'

আল্লামা মারগিনানি রহ. 'হিদায়া' কিতাবে এই বক্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন এবং তার ব্যাখ্যাকারক 'কেফায়া' কিতাবে বলেছেন—

لأن الثوب لما اشتراه وقبضه، كان هو وسائر الأعيان المملوكة سواء في صحة الرهن.

'কেননা, সে যখন কাপড়টি ক্রয় করলো এবং নিজের আয়ত্বে নিলো, তখন বন্ধক সহিহ হওয়ার ক্ষেত্রে সেটিও তার মালিকানাধীন

[৪১] ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, অধ্যায় : বুয়ু, পরিচ্ছেদ : ৪, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৫।

অন্যান্য জিনিস এক পর্যায়ে হলো।'[৪২] (অর্থাৎ সেগুলোর বন্ধক রাখা সহিহ আছে।)

আল্লামা হাসকাফি রহ. এই মাসআলাটি 'আদ্দুররুল মুখতার' কিতাবে বর্ণনা করে তার এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন—

ولو كان ذلك الشيء الذي قال له المشتري: أمسكه، هو المبيع الذي اشتراه بعينه، لو بعد قبضه، لأنه حينئذ يصلح أن يكون رهنا بثمنه، ولو قبله لا يكون رهنا، لأنه محبوس بالثمن.

'ক্রেতা যে জিনিসটির ব্যাপারে বললো যে, এটি রেখে দাও। সেটি যদি হুবহু তার ক্রয়কৃত জিনিস হয় এবং কবজা করার পর হয়ে থাকে, তাহলে সেটি তার মূল্যের জন্য বন্ধক হতে পারবে। আর যদি কবজা করার আগে বন্ধক রাখতে চায়, তাহলে সেটি বন্ধক হবে না। কেননা, সেটিকে তার বিক্রিত মূল্যের কারণে আটকে রাখা হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।'

এ ব্যাখ্যার নিচে আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ. বলেন—

قوله: لأنه حينئذ يصلح ... إلخ »، أي لتعيين ملكه فيه، حتي لو هلك يهلك على المشتري، ولا ينفسخ العقد ، قوله: « لأنه محبوس بالثمن »، أي وضمانه يخالف ضمان الرهن، فلا يكون مضمونا بضمانين مختلفين، لاستحالة اجتماعهما، حتي لو قال: أمسك المبيع حتي أعطيك الثمن قبل القبض، فهلك، انفسخ البيع ، زيلعي.

'লেখকের বক্তব্য, তখন বন্ধক হতে পারবে... কারণ সেটির মধ্যে তার মালিকানা নিশ্চিত হয়ে গেছে, এমনকি সেটি যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ক্রেতার সম্পদ হিসেবে নষ্ট হবে। আর এ কারণে বিক্রয় চুক্তি বাতিল হবে না। লেখকের বক্তব্য, কেননা, তার মূল্যের কারণে সেটিকে আটকে রাখা হয়েছে... অর্থাৎ এ অবস্থার জামানতটি বন্ধকের জামানত থেকে ভিন্ন হবে। আর একটি বস্তু ভিন্ন দুটি জামানতযুক্ত হতে পারে না। কারণ, দু-ধরনের জামানত একত্রিত হওয়া অসম্ভব। এমনকি যদি কেউ

[৪২] আল-কেফায়া শরহে হিদায়া, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৯৯। ফাতহুল কাদিরের সঙ্গে প্রকাশিত সংস্করণ।

পণ্য কবজা করার আগে এ কথা বলে যে, মূল্য পরিশোধ না করা পর্যন্ত এটিকে আটকে রাখো। এরপর সেটি নষ্ট হয়ে গেলো, তাহলে এ ক্ষেত্রে বিক্রয় চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। জায়লায়ি।'[৪৩]

উদ্ধৃত বক্তব্য থেকে যা বোঝা যায় তা হলো, এ ধরনের বন্ধক জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে অনুসৃত ফকিহদের মধ্যে কোনো মতানৈক্য নেই। তবে মূল বিক্রয় চুক্তির মধ্যে বন্ধকের শর্ত থাকতে পারবে না। মূল বিক্রয় চুক্তির মধ্যে যদি বন্ধকের শর্ত করা হয়, তাহলে সে সম্পর্কে আল্লামা ইবনু কুদামা রহ. বলেছেন—

وإذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهنا على ثمنه، لم يصح، قال ابن حامد رحمه الله، وهو قول الشافعي ، لأن المبيع حين شرط رهنه لم يكن ملكا له، وسواء شرط أنه يقبضه ثم يرهنه، أو شرط رهنه قبل قبضه وظاهر الرواية صحة رهنه فأما إن لم يشترط ذلك في البيع، لكن رهنه عنده بعد البيع، فإن كان بعد لزوم البيع، فالأولي صحته، لأنه يصح رهنه عند غيره، فصح عنده كغيره، ولأنه يصح رهنه على غير ثمنه، فصح رهنه على ثمنه، وإن كان قبل لزوم البيع انبني على جواز التصرف في المبيع، ففي كل موضع جاز التصرف فيه وجاز رهنه، ومالا فلا، لأنه نوع تصرف فأشبه بيعه.

'ক্রেতা-বিক্রেতা যদি এই শর্তের ওপর লেনদেন করে যে, পণ্যটি তার মূল্যের বিনিময়ে বিক্রেতার কাছে বন্ধক থাকবে, তাহলে এমন লেনদেন সহিহ্ হবে না। আল্লামা ইবনু হামেদ রহ. অনুরূপ বলেছেন এবং এটি ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর অভিমত। কারণ, যখন পণ্যকে বন্ধক রাখার শর্ত করা হলো, তখন সেটি ক্রেতার মালিকানাধীন হলো না। চাই কবজা করার পরে বন্ধক রাখার শর্ত করুক বা কবজা করার আগে বন্ধক রাখার শর্ত করুক। তবে জাহেরুর রেওয়ায়েত অনুযায়ী এমন বন্ধক সহিহ্ হবে। আর মূল বিক্রয় চুক্তিতে যদি বন্ধকের শর্ত না করা হয় এমতাবস্থায় বিক্রয়ের পর সেটিকে বিক্রেতার কাছে বন্ধক রাখে, আর বিক্রয়ের আবশ্যকীয় সব কার্যক্রম শেষ করার পর বন্ধক রাখে,

---

[৪৩] রদ্দুল মুহতার, অধ্যায় : বন্ধক, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৪৯৭। করাচি থেকে প্রকাশিত সংস্করণ।

তাহলে কোনো ধরনের সন্দেহ ছাড়া এ বন্ধক সহিহ হবে। কারণ, তখন সেটিকে অন্যের কাছে বন্ধক রাখা সহিহ আছে। ফলে অন্যের কাছে বন্ধক রাখার মতো তার কাছেও বন্ধক রাখা সহিহ হবে। আর সেটিকে যেহেতু তার মূল্য ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে বন্ধক রাখা সহিহ আছে। তাই তার মূল্যের ক্ষেত্রেও সেটি বন্ধক রাখা সহিহ আছে। আর বিক্রয়ের আবশ্যকীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার আগে যদি বন্ধক রাখে, তাহলে সে মাসআলাটি পণ্যের মধ্যে হস্তক্ষেপ জায়েজের মাসআলার ওপর নির্ভর করবে। সুতরাং যেসব ক্ষেত্রে পণ্য কবজা করার আগে তাতে হস্তক্ষেপ করা জায়েজ আছে, সেসব ক্ষেত্রে বন্ধক রাখা জায়েজ আছে। আর সেখানে হস্তক্ষেপ করা জায়েজ নেই, সেখানে বন্ধক রাখাও জায়েজ নেই। কেননা, বন্ধক রাখা পণ্যের মধ্যে হস্তক্ষেপের একটি প্রকার। ফলে সেটি বিক্রি করার সদৃশ হয়ে গেছে।'[৪৪]

৩. তরল বন্ধক (Floating charge)

বন্ধকের এমন একটি পদ্ধতি রয়েছে, অনেক ইসলামি রাষ্ট্রে যার দেখা মেলে। এ পদ্ধতিতে মুরতাহিন (বন্ধক গ্রহণকারী) সরাসরি বন্ধকি জিনিসটি কবজা করে না। বরং সেটি রাহেনের (যে বন্ধক রাখে) কাছে থাকে। তবে ঋণী যদি ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করে, তাহলে বন্ধকগ্রহীতা ওই জিনিসটি বিক্রি করে তার ঋণ উসুল করার অধিকার রাখে। এ ধরনের বন্ধকি পদ্ধতিকে 'দলিল বন্ধক রাখা' (الرهن الساذج। "SIMPLE MORTGAGE বা الذمة السائلة" (FLOTING CHARGE) নামে নামকরণ করা হয়। এ পদ্ধতির উদাহরণ এই যে, ঋণী ঋণদাতার কাছে তার গাড়িটি বন্ধক রাখলো। তবে ঋণী বন্ধকদাতার কাছে গাড়িটি থাকবে। সে ইচ্ছেমতো তার প্রয়োজনে সেটি ব্যবহার করবে। কিন্তু ঋণ পরিশোধের মাধ্যমে দায়িত্ব মুক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত সে ওই গাড়িটির মালিকানা অন্যের কাছে হস্তান্তর করতে পারবে না। আর ঋণী টালবাহানা করলে বন্ধকগ্রহীতা সেটি বিক্রি করে নিজের ঋণ উসুলের অধিকার রাখবে। এ পদ্ধতিকে 'তরল বন্ধক অথবা দায়' (الذمة।

[৪৪] আল-মুগনি, আল্লামা ইবনু কুদামা রহ., অধ্যায় : বন্ধক, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪২৮। ১৩৯২ হিজরি সনে দারুল কিতাবিল আরাবি বৈরুত থেকে প্রকাশিত সংস্করণ।

الرهن السائلة (FLOTING CHARGE) নামে অভিহিত করা হয়। সুতরাং এ ধরনের বন্ধকের মাধ্যমে ঋণের গ্যারান্টি দেওয়া জায়েজ আছে কি না?

এ পদ্ধতি জায়েজের ব্যাপারে অনেক সময় ফিকহি দিক থেকে এ কারণে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, বন্ধকচুক্তি সহিহ্ বা সম্পন্ন হওয়ার জন্য অধিকাংশ ফকিহ্ কুরআনের এই আয়াতের কারণে বন্ধকি জিনিসকে কবজা করার শর্তারোপ করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন—

﴿فرهان مقبوضة﴾

'কবজাকৃত বন্ধক হতে হবে।'[৪৫]

আর তরল বন্ধকের ক্ষেত্রে বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকি জিনিসটি কবজা করে না। সুতরাং এমন বন্ধক সহিহ্ না হওয়া উচিত।

আসল কথা হলো, বন্ধকের ক্ষেত্রে ফকিহ্গণ যদিও বন্ধকি জিনিস কবজা করার শর্তারোপ করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তারা এমনটি করার অনুমতি দিয়েছেন যে, বন্ধক রাখার পর বন্ধকদাতা বন্ধকগ্রহীতা থেকে সেটি ধার নিয়ে ব্যবহার করতে পারবে। এ কারণে বন্ধকচুক্তি ফাসেদ হবে না। তবে বন্ধকগ্রহীতার জন্য এই অধিকার থাকবে যে, তার ইচ্ছে অনুযায়ী যে-কোনো সময় সেটি ফিরিয়ে নিতে পারবে। আর বন্ধকদাতার কাছে থাকা অবস্থায় সেটি যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার সম্পদ থেকে নষ্ট হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। সেইসঙ্গে বন্ধকগ্রহীতার জন্য এ অধিকার থাকবে যে, মেয়াদ শেষ হলে তার ঋণ উসুল করার জন্য সেটি বিক্রি করতে পারবে। আর রাহেন (বন্ধকদাতা) যদি মারা যায় বা দেওলিয়া হয়ে যায়, তাহলে অন্যান্য ঋণী এই জিনিসের মধ্যে অধিকার পাবে না। আল্লামা মারগিনানি রহ.-এর রচিত 'হিদায়া' কিতাবে বর্ণিত হয়েছে—

وإذا أعار المرتهن الرهن للراهن ليخدمه أو ليعمل له عملا، فقبضه، خرج من ضمان المرتهن، لمنافاة بين يد العارية ويد الرهن، فإن هلك في يد الراهن هلك بغير شيء، لفوات القبض المضمون، وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده، لأن عقد الراهن باق، لا في حكم الضمان في الحال، ألا تري أنه لو هلك الراهن قبل أن يرده على

[৪৫] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৮৩।

المرتهن، كان المرتهن أحق به من سائر الغرماء، وهذا لأن يد العارية ليست بلازمة، والضمان ليس من لوازم الرهن على كل حال.

'বন্ধকগ্রহীতা যখন বন্ধকি জিনিসটিকে বন্ধকদাতার সেবা বা কোনো কাজের জন্য তাকে ধার দেবে, তখন বন্ধকগ্রহীতার দায়িত্ব থেকে সেটি বেরিয়ে যাবে। কারণ, ধার ও বন্ধকের কর্তৃত্বের মধ্যে বৈপরিত্যের সম্পর্ক রয়েছে। ফলে সেটি যদি রাহেনের কাছে থাকা অবস্থায় নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার কোনো বিনিময় হবে না। কেননা, এখানে দায়বদ্ধ কর্তৃত্ব পাওয়া যাচ্ছে না। আর বন্ধকগ্রহীতা সেটিকে নিজের কাছে ফিরিয়ে নিতে পারে। কারণ, এখন পর্যন্ত বন্ধকের চুক্তি অবশিষ্ট রয়েছে। অবশ্য তৎক্ষণাত সেটি দায়বদ্ধ জিনিসের হুকুমে নয়। তুমি কি এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ করোনি যে, ওই জিনিসটি বন্ধকগ্রহীতার কাছে ফেরত দেওয়ার আগে যদি বন্ধকদাতার মৃত্যু হয়, তাহলে অন্যান্য ঋণদাতা অপেক্ষা বন্ধকগ্রহীতা সেটির বেশি হকদার। এটি এ কারণে যে, ধার নেওয়া জিনিসের কর্তৃত্ব দায়ভারযুক্ত নয়। আর সবসময় জামানতযুক্ত হওয়া এটি বন্ধকের জন্য আবশ্যক নয়।'[৪৬]

তবে বর্ণিত হুকুম সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যেখানে বন্ধকি জিনিসটি কবজা করার মাধ্যমে বন্ধকচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকদাতাকে সেটি ধার দেবে। তবে বন্ধকগ্রহীতা যদি একেবারেই সেটিকে কবজা না করে, তাহলে সে ক্ষেত্রেও কি ধার নেওয়ার এই হুকুম অবশিষ্ট থাকবে? ফকিহদের বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, এ ক্ষেত্রে জায়েজের হুকুমটি প্রযোজ্য হবে না। কারণ, বন্ধক সহিহ হওয়ার জন্য কবজাকে শর্ত করা হয়েছে। তবে এখানে কিছু বিষয় রয়েছে, সমকালীন ফকিহদের গবেষণার জন্য সেগুলো পেশ করছি। যথা—

১. তরল বন্ধকের ক্ষেত্রে বন্ধকগ্রহীতা যদিও বন্ধকি জিনিসটি কবজা করছে না। তবে সাধারণত তার মালিকানাধীন দলিল কবজা করে থাকে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে এমনটি বলার সুযোগ রয়েছে যে, দলিল

[৪৬] হিদায়া, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ১১৬। ফাতহুল কাদিরের সঙ্গে প্রকাশিত সংস্করণ। রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৫১০।

কবজা করার মাধ্যমে বন্ধক সম্পন্ন হয়েছে। এরপর বন্ধকদাতার কাছে বন্ধকি জিনিসটি ধার নেওয়া জিনিসের মতো রয়েছে।

২. ফকিহদের বক্তব্য অনুযায়ী বন্ধকের ক্ষেত্রে কবজাকে শর্ত করার কারণ হলো, প্রয়োজনের সময় সেটি বিক্রি করে বন্ধকগ্রহীতা তার ঋণ উসুল করতে পারা। আর আইন স্বীকৃত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তরল বন্ধক রাখার ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যটি পাওয়া যায়। অতএব এখানে এমনটি বলার সুযোগ রয়েছে যে, উল্লিখিত পদ্ধতিতে সরাসরি কবজা করা শর্ত নয়। কারণ, তাদের নির্ধারিত শর্তের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্যটি অর্জন হয়ে যাচ্ছে।

৩. বন্ধকের উদ্দেশ্য হলো ঋণের গ্যারান্টি। এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শরিয়ত এমন অনুমতি দিয়েছে যে, ঋণ পরিশোধের আগ পর্যন্ত ঋণদাতা ঋণীর মালিকানাধীন কোনো একটি জিনিস তার কাছে রাখবে এবং সেটিতে হস্তক্ষেপ করতে বাধা দেবে। এখন ঋণদাতা যদি এর চেয়ে নিচের কোনো মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য সাধন হওয়ার ব্যাপারে রাজি হয়। সেটি হলো, জিনিসটি বন্ধকদাতার কাছে থাকবে, আর বন্ধকগ্রহীতা তার ঋণ উসুল করার অধিকার রাখবে, তাহলে এ ক্ষেত্রে তেমন কোনো শরয়ি সমস্যা দেখা যায় না।

৪. তরল বন্ধক রাখার ক্ষেত্রে দু-পক্ষেরই সুবিধা রয়েছে। বন্ধকদাতার সুবিধার ব্যাপারটি তো স্পষ্ট। সে তার মালিকানাধীন জিনিস ব্যবহার করা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে না। আর বন্ধকগ্রহীতার সুবিধা হলো, বন্ধকি জিনিসটি নষ্ট হলে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জামানত নেওয়া ছাড়া সে তার ঋণ উসুলের অধিকার পাচ্ছে। বেশি থেকে বেশি সমস্যা হলো এই যে, রাহেন মারা গেলে বা দেওলিয়া হলে অন্যান্য ঋণদাতারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ, অন্যান্য ঋণদাতা অপেক্ষা বন্ধকগ্রহীতা ওই জিনিসটির ব্যাপারে বেশি হকদার হবে। কিন্তু বন্ধকগ্রহীতা যদি বন্ধকি জিনিসটি নিজের কাছে রেখে দেয়, তাহলে অন্যান্য ঋণদাতাদের এই ক্ষতিকে শরিয়ত ধর্তব্য করেনি। সেইসঙ্গে বন্ধকগ্রহীতা কবজা করার পর সেটি রাহেনকে ধার দিলে সেখানেও এ ক্ষতি ধর্তব্য নয়; ইতোপূর্বে যার আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, শুধু এই সমস্যাটি বন্ধককে বাতিল করবে না।

৫. আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অনেক সময় বন্ধকি জিনিস কবজা করা অসম্ভব হয়। যেখানে বিক্রেতা এক দেশে আর ক্রেতা অন্য দেশে অবস্থান করে। আর বন্ধকি জিনিসটি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিতে বড়ো ধরনের ব্যয় ও কষ্টের শিকার হতে হয়। এসব ক্ষেত্রে তরল বন্ধক ছাড়া ঋণকে গ্যারান্টিযুক্ত করার আর কোনো উপায় নেই।

এই পাঁচটি পয়েন্টে তরল বন্ধকের মাধ্যমে বন্ধক নেওয়ার পদ্ধতি বৈধতার প্রতি আমাকে আকৃষ্ট করেছে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য বিজ্ঞ আলেমদের সামনে মাসআলাটি পেশ করছি।[৪৭] মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

৪. তৃতীয় পক্ষ জামানত নেওয়া

ঋণ পরিশোধের জামানতের আরও একটি পদ্ধতি হলো, তৃতীয় পক্ষ ঋণের জামানত নেওয়া এবং সে নিজের প্রতি এ বিষয়টি আবশ্যক করবে যে, আসল ঋণী যদি ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়, তাহলে নিজের পক্ষ থেকে সে ঋণ পরিশোধ করে দেবে। এ ধরনের জামানতকে কাফালা নামে অভিহিত করা হয়। ফিকহের কিতাবসমূহে কাফালাতের বিস্তারিত বিধিবিধান রয়েছে। এ আলোচনাতে সেগুলো উল্লেখ করতে চাচ্ছি না। তবে কাফালার একটি শাখাগত মাসআলা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করার ইচ্ছে করছি। সেটি হলো কাফালার কারণে পারিশ্রমিক বা বিনিময় দাবি করা। কারণ, বর্তমান সময়ের সুদি ব্যাংকগুলো ঋণীর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক দেওয়া ছাড়া কারও ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নিতে রাজি হয় না। আর অনেক সময় এই পারিশ্রমিকের পরিমাণ ঋণের শতকরা হারে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। যেমন : শতকরা তিন বা চার ভাগ।

ফিকহে ইসলামিতে এ বিষয়টি প্রসিদ্ধ যে, কাফালাতের চুক্তিটি হলো ঋণের মতো একটি সৌজন্যমূলক চুক্তি। ফলে সেখানে কোনো ধরনের পারিশ্রমিক দাবি করা জায়েজ নেই। তবে আধুনিক অর্থনীতি বিশেষজ্ঞদের অনেকে কাফালার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়ার বৈধতার পক্ষে এভাবে দলিল দিয়ে থাকেন যে, সম্প্রতি কাফালা ভিত্তিক লেনদেন আধুনিক ব্যবসার একটি বড়ো

---

[৪৭] তবে উক্ত সেমিনারের সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে এই প্রকারের বন্ধককে অনুমোদন দেওয়া হয়নি।

উপাদানে পরিণত হয়েছে। শুধু কাফালার সেবা দেওয়ার জন্য অনেক স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান জন্ম নিয়েছে এবং এ সেবায় বড়ো অংকের অর্থ বিনিয়োগ করছে। সুতরাং এ অবস্থায় কাফালাকে কেন একটি সৌজন্যমূলক চুক্তি হিসেবে সাব্যস্ত করা হবে? বরং বর্তমান সময়ে সেটি এমন একটি আর্থিক লেনদেনে পরিণত হয়েছে, ব্যবসায়ীরা যার দ্বারস্থ হয়। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ব্যবসাগুলোতে বেশি দারস্থ হয়। আর কাফালার এই বিশাল চাহিদা পূরণের জন্য কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ সৌজন্যমূলক জামানত গ্রহণকারী পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এমন লেনদেনে পারিশ্রমিক দেওয়া বৈধ হওয়া উচিত।

তবে তাদের এই দলিলটি সহিহ নয়। কেননা, তাদের এই দলিল যদি সহিহ হতো, তাহলে ঋণের ওপর সুদ নেওয়া বৈধ হতো। কারণ, হুবহু এ কথাটিই ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। মৌলিকভাবে যদিও ঋণ একটি সৌজন্যমূলক লেনদেন। তবে বর্তমান সময়ে ব্যবসার জন্য সেটি একটি মৌলিক প্রয়োজনে পরিণত হয়েছে। ঋণ দেওয়ার জন্য স্বতন্ত্র অনেক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে। আর সেগুলো হলো ব্যাংক। আর এ কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ অর্থ সৌজন্যমূলক ঋণ হিসেবে পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এরপরও ঋণের ওপর সুদ নেওয়া বৈধতার কথা কেউ বলেনি।

বাস্তবতা হলো, ঋণ ও কাফালা চুক্তি দুটি সৌজন্যমূলক চুক্তি হওয়ার দিক থেকে ভিন্ন নয়। ঋণের ওপর যেমন সুদ নেওয়া জায়েজ নেই, তেমনই কাফালার পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েজ নেই। বরং ঋণের ওপর সুদ নেওয়া নাজায়েজ হওয়া অপেক্ষা কাফালার পারিশ্রমিক নাজায়েজ হওয়ার বিষয়টি আরও বেশি যুক্তিসঙ্গত। কেননা, কাফালা চুক্তি হলো ঋণীর পক্ষ থেকে ঋণ আদায় করে দেওয়ার দায়িত্বের ব্যাপারে একটি চুক্তি। সেটি এভাবে যে, বাস্তবে কাফিল যখন ঋণীর পক্ষ থেকে ঋণ আদায় করে দেবে, তখন আসল ঋণীর ওপর তার ঋণ সাব্যস্ত হবে। কেমন যেন সে তখন ঋণ দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে, যখন বাস্তবে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। সুতরাং ঋণের পারিশ্রমিক তথা সুদ নেওয়া যখন নিষিদ্ধ, তখন ঋণ আদায় করে দেওয়ার ওয়াদা বা দায়িত্বের ওপর পারিশ্রমিক নেওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটি আরও বেশি যুক্তিসঙ্গত।

এই উদাহরণ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। মনে করুন আমরের কাছ থেকে জায়েদ একশো ডলার ঋণ নিলো। আর আমর তার কাছে কাফিল চাইলো।

তখন খালিদ এসে জায়েদকে বললো, এ শর্তে তোমার পক্ষ থেকে আমি এখন ঋণ পরিশোধ করে দিচ্ছি যে, পরবর্তী সময়ে তুমি আমাকে একশো দশ ডলার দেবে। অতিরিক্ত দশ ডলার হলো ঋণ পরিশোধের মাধ্যমে তোমাকে যে উপকার করেছি তার বিনিময়।

অন্যদিকে বকর এসে জায়েদকে বললো, আমি এ শর্তে তোমার ঋণের দায়িত্ব গ্রহণ করছি যে, কাফালাতের পারিশ্রমিক স্বরূপ আমাকে দশ ডলার দেবে। আর তুমি যখন ঋণ পরিশোধে সমস্যার সম্মুখীন হবে, তখন পরিশোধিত একশো ডলার তোমার ওপর ঋণ হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

যারা কাফালাতের পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েজ বলেছেন তাদেরকে এ কথা বলতে হবে যে, বকর যে পারিশ্রমিক দাবি করেছে সেটি জায়েজ। আর খালিদ যে পারিশ্রমিক দাবি করেছে সেটি হারাম। অথচ বাস্তবে খালিদ তার সম্পদ বিনিয়োগ করেছে। আর মেয়াদ আসলে ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব গ্রহণ ছাড়া বকর আর কিছুই করেনি। সুতরাং বিনিয়োগকারীর পারিশ্রমিক যদি হারাম হয়, তাহলে দায়িত্ব গ্রহণকারীর পারিশ্রমিক হারাম হওয়া বেশি যুক্তিসঙ্গত।

অন্য ভাষায় এভাবে বলা যায়, কাফিল যদি আসল ঋণীর পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধে বাধ্য হয়, তাহলে সে ঋণ হিসেবে ঋণদাতাকে যে পরিমাণ অর্থ দিয়েছে তার চেয়ে বেশি নিতে পারবে না। পরিশোধিত অর্থ অপেক্ষা বেশি দাবি করা বৈধ নয়। কেননা, সেটি সুদ। সুতরাং সে যেখানে কিছুই বিনিয়োগ করেনি। বরং শুধু বিনিয়োগের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, সেখানে পারিশ্রমিক নেওয়া তার জন্য কীভাবে জায়েজ হয়?

এখান থেকে স্পষ্ট হয় যে, কাফালার বিনিময় নেওয়া জায়েজ বলার কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংক গ্রহণ করতে পারে এমন কী শরয়ি বিকল্প পদ্ধতি রয়েছে? বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ব্যবসা ও L.C. ঋণনামা ইস্যু করার ক্ষেত্রে।

এ প্রশ্নের উত্তর হলো, গ্রাহক থেকে দুটি পদ্ধতিতে ব্যাংক অর্থ নিতে পারে। যথা—

১. L.C. (Letter of credit) ঋণনামা ইস্যু করতে বাস্তবিক যে ব্যয় হয়ে থাকে সেটি।

২. উকিল, দালাল বা আমদানি ও রপ্তানি কারকের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে যেসব কার্যক্রম সম্পাদনা করে থাকে তার পারিশ্রমিক নিতে পারে। তবে সরাসরি কাফালাত বা দায়িত্বের কারণে কোনো পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েজ হবে না।

৫. বিল অফ এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ঋণের গ্যারান্টি

অনেক সময় ক্রেতার পক্ষ থেকে একটি ফরমে স্বাক্ষরের মাধ্যমে ঋণকে গ্যারান্টিযুক্ত করা হয়। যেখানে ক্রেতার পক্ষ থেকে ফরমে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বিক্রেতার কাছে ঋণী হওয়ার স্বীকৃতি থাকে। আর নির্দিষ্ট তারিখে সেটি পরিশোধ করার বাধ্যবাধকতা লেখা থাকে। বর্তমান সময়ে এই প্রমাণপত্রকে 'বিল অফ এক্সচেঞ্জ' (Bill of Exchange) নামে অভিহিত করা হয়। আর সেখানে লিখিত যে তারিখে পরিশোধের কথা লেখা থাকে, সেটিকে বিল তরলে রূপান্তরিত করার তারিখ (Maturity date) বলা হয়। বিল অফ এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ঋণকে গ্যারান্টিযুক্ত করা শরয়িভাবে জায়েজ। বরং মহান আল্লাহর বাণী অনুযায়ী এমনটি করা মুস্তাহাব। মহান আল্লাহ্ বলেন—

﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمي فاكتبوه﴾

'হে ইমানদারগণ, তোমরা যখন নির্দিষ্ট মেয়াদে বাকি লেনদেন করো, তখন সেটিকে লিপিবদ্ধ করে নাও।'[৪৮]

তবে এ কারণে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে যে, বর্তমান সময়ে বিল অফ এক্সচেঞ্জ একটি হস্তান্তরযোগ্য রশিদে পরিণত হয়েছে। আসল ঋণদাতা তথা বিল অফ এক্সচেঞ্জের বাহক কখনো কখনো নির্দিষ্ট সময় আসার আগে দ্রুত অর্থ পাওয়ার আশায় তার ওপর লেখা মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয়। এ ধরনের বিক্রিকে ডিসকাউন্টিং অফ বিল (خصم الكمبيالة। Discounting of the Bill) বলা হয়। সুতরাং বিলের বাহক যখন দ্রুত তার অর্থ পেতে চায়, তখন তৃতীয় শ্রেণির কাছে যায়। আর সে তৃতীয় শ্রেণি সাধারণত ব্যাংকই হয়। ব্যাংকের কাছে দিলে সে বাহক থেকে

[৪৮] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৮২।

স্বাক্ষর নিয়ে সেখানে উল্লিখিত অর্থের চেয়ে শতকরা হারে কমিয়ে বাহককে নগদ অর্থ দিয়ে দেয়।

এ পদ্ধতিতে বিলের ডিসকাউন্ট করা শরয়ি দৃষ্টিতে বৈধ নয়। সেটি হয়তো ঋণকে ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে বিক্রি করার কারণে। অথবা কারেন্সিকে কারেন্সির বিনিময়ে কমবেশি ও বাকিতে বিক্রি করার কারণে। আর সুদ বিষয়ক হাদিসে এগুলোকে স্পষ্টভাষায় হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে।

কিন্তু এই চুক্তিকে তার পদ্ধতি পরিবর্তন করার দ্বারা সহিহ্ করা সম্ভব। সেটি এভাবে যে, বিলের বাহক ক্রেতা (বিল ইস্যুকারী) থেকে ঋণ আদায়ের জন্য ব্যাংককে উকিল বানাবে। আর এ কারণে তাকে একটি পারিশ্রমিক দেবে। এরপর ব্যাংক থেকে বিলে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ ঋণ নেবে এবং বিলের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ক্রেতা থেকে সেটি উসুল করার অনুমতি দেবে। ফলে এখানে স্বতন্ত্র দুটি লেনদেন হবে। একটি হলো নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ঋণ উসুলের জন্য উকিল বানানো। আর দ্বিতীয়টি হলো, ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া এবং বিলের মেয়াদ শেষ হলে ক্রেতা থেকে ঋণ উসুল করে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া। সুতরাং শরয়ি নীতি অনুযায়ী উভয় লেনদেন সহিহ্ হবে। প্রথমটি সহিহ্ হওয়ার কারণ হলো, সেখানে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ওকালতের চুক্তি করা হয়েছে। আর এ ধরনের চুক্তি বৈধ। দ্বিতীয়টি সহিহ্ হওয়ার কারণ হলো, কোনো ধরনের বেশি নেওয়ার শর্ত ছাড়া ঋণ নেওয়া। আর এটিও বৈধ চুক্তি।

কিন্তু এই চুক্তি সহিহ্ হওয়ার জন্য দুটি বিষয় জরুরি—

১. দুটি চুক্তির একটি অপরটির জন্য শর্ত না হওয়া। সুতরাং ঋণের মধ্যে ওয়াকালাত বা ওয়াকালাতের মধ্যে ঋণের শর্ত করা যাবে না।

২. বিল ইস্যুর সময়ের অনুপাতের সঙ্গে ওয়াকালার পারিশ্রমিক সম্পৃক্ত না হওয়া।[৪৯]

---

[৪৯] আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা যায় যা লেখক অন্য একটি মাকালায় উল্লেখ করেছেন। ৩. ব্যাংক তাকে ঋণ দিয়েছে এই ঋণের কারণে ওয়াকালার পারিশ্রমিকের মধ্যে বৃদ্ধি করা যাবে না।

চতুর্থ আলোচনা : দ্রুত ঋণ পরিশোধের শর্তে কিছু অংশ কমিয়ে দেওয়া

অনেক ব্যবসায়ী আরও যেসব লেনদেন করে তার মধ্যে একটি লেনদেন এমন যে, দ্রুত ঋণ আদায়ের শর্তে ঋণ থেকে কিছু অংশ কমিয়ে দেয়। যেমন : আমরের কাছে জায়েদ এক হাজার টাকা পাবে। তাই জায়েদ আমরকে বললো, এখন নয়শত টাকা পরিশোধ করে দাও। এ কারণে তোমার থেকে একশো টাকা কমিয়ে দিচ্ছি। ফিকহে ইসলামিতে এই লেনদেনটি ضع وتعجل (কমিয়ে নাও ও দ্রুত পরিশোধ করো) নামে পরিচিত।

এ ধরনের লেনদেনের হুকুমের ব্যাপারে ফকিহগণ মতানৈক্য করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা., ইবরাহিম নাখয়ি তাবেয়ি, জুফার ইবনু হুজায়েল হানাফি ও আবু সাওর শাফিয়ি রহ. এমন লেনদেন জায়েজের পক্ষে মত দিয়েছেন। আর সাহাবিদের মধ্য থেকে আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা., জায়েদ ইবনু সাবেত রা. আর তাবেয়িদের মধ্য থেকে মুহাম্মাদ ইবনু সিরিন রহ. হাসান বসরি রহ., ইবনু মুসায়্যিব রহ., হাকাম ইবনু উতবাহ রহ. ও শাবি রহ. নাজায়েজের মত দিয়েছেন[৫০] এবং চার মাজহাবের ইমামদের থেকে এমনটি বর্ণিত রয়েছে।

এ ক্ষেত্রে বিপরীতমুখি দুটি মারফু হাদিস রয়েছে। যার প্রত্যেকটির সূত্রে দুর্বলতা রয়েছে।

প্রথম হাদিস : ইমাম বাইহাকি রহ. নিজ সূত্রে ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন—

> لَمَّا أَمَرَ النَّبِي صلي الله عليه وسلم بِإِخْرَاجِ بَنِي النَّضِيرِ مِنَ الْمَدِينَةِ جَاءَهُ نَاسٌ مِنْهُمْ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ بِإِخْرَاجِهِمْ وَلَهُمْ علي النَّاسِ دُيُونٌ لَمْ تَحِلَّ فَقَالَ النَّبِي صلي الله عليه وسلم :« ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا أَوْ قَالَ وَتَعَاجَلُوا.
>
> 'মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু নজিরকে যখন মদিনা থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন, তখন কিছু লোক এসে বললো, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি তাদেরকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ

---

[৫০] মুয়াত্তা ইমাম মালিক রহ. খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬০৬। মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৭১-৭৪।

দিয়েছেন। অথচ মানুষের ওপর তাদের এমন কিছু ঋণ রয়েছে, যেগুলো পরিশোধের সময় আসেনি। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, ঋণের কিছু অংশ কমিয়ে পরিশোধ করে দাও।'[৫১]

এ হাদিসটি বর্ণিত পদ্ধতির বৈধতা প্রমাণ করে। তবে পরবর্তী পরিচ্ছেদে ইমাম বাইহাকি রহ. কর্তৃক মিকদাদ ইবনু আসওয়াদ রা. থেকে বর্ণিত হাদিসটি এই হাদিসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়—

أَسْلَفْتُ رَجُلاً مِائَةَ دِينَارٍ ثُمَّ خَرَجَ سَهْمِي فِي بَعْثٍ بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم فَقُلْتُ لَهُ : عَجِّلْ لِي تِسْعِينَ دِينَارًا وَأَحُطَّ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَقَالَ : نَعَمْ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلي الله عليه وسلم فَقَالَ :« أَكَلْتَ رِبًا يَا مِقْدَادُ وَأَطْعَمْتَهُ.»

'মিকদাদ রা. বলেন, জনৈক ব্যক্তিকে একশো দিনার ঋণ দিই। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য আমার নাম আসে। তখন ওই ব্যক্তিকে আমি বলি, তুমি এখন নব্বই দিনার পরিশোধ করো, আর বাকি দশ দিনার মাফ করে দিচ্ছি। সে এই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে হ্যাঁ বলে। পরবর্তী সময়ে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টি জানানো হলে তিনি বলেন, হে মিকদাদ, তুমি নিজে সুদ খেয়েছো এবং তাকেও ভক্ষণ করিয়েছো।'[৫২]

ইমাম বাইহাকি রহ. বলেছেন যে, সূত্রের দিক থেকে উভয় হাদিস দুর্বল। ফলে তার কোনোটি দিয়ে দলিল দেওয়া যাবে না। তবে অধিকাংশ ফকিহ হারামের দিকটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ, সময়ের বিনিময়ে ঋণের মধ্যে বৃদ্ধি করা স্পষ্ট সুদ। অনুরূপভাবে সময়ের বিনিময়ে ঋণ কমিয়ে দেওয়া একই অর্থে।

আর বনু নজিরের ঘটনাটি দলিল হতে পারে না। তার প্রথম কারণ হলো, হাদিসটির সূত্র দুর্বল। দ্বিতীয় কারণ হলো, সূত্রের দিক থেকে যদিও হাদিসটিকে সহিহ মেনে নেওয়া হয়, তাহলেও সেখানে এ কথা বলার সুযোগ রয়েছে যে, হিজরি দ্বিতীয় সনে বনু নজিরের ঘটনা ঘটে। আর সেটি ছিলো সুদ হারামের বিধান নাজিল হওয়ার আগের ঘটনা। শামসুল আইম্মা সারাখসি রহ. এই ঘটনাটি বর্ণনা করে সেটিকে এ ক্ষেত্রে দলিল দিয়েছেন যে, মুসলিম ও হারবির (অমুসলিম

---

[৫১] সুনানে কুবরা লিল বাইহাকি, অধ্যায় : বুয়ু, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২৮।

[৫২] সুনানে কুবরা লিল বাইহাকি, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২৮।

রাষ্ট্রের অমুসলিম) মধ্যে কোনো সুদ নেই। তিনি বলেন—

ولما أجلي بني النضير قالوا : إن لنا ديونا على الناس، فقال: ضعوا وتعجلوا، ومعلوم أن مثل هذه المعاملة لا يجوز بين المسلمين، فإن من كان له على غيره دين إلى أجل، فوضع عنه بعضه بشرط أن يعجل بعضه لم يجز، كره ذلك عمر ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر رضي الله عنهم.

'বনু নজিরকে দেশান্তরিত করার সময় তারা বললো, মানুষের কাছে আমরা কিছু ঋণ পাবো। এ কথা শুনে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিছু কমিয়ে দিয়ে এখনই আদায় করে নাও। এ বিষয়টি সবার কাছে স্পষ্ট যে, দুজন মুসলিমের মধ্যে এ ধরনের লেনদেন বৈধ নয়। কারণ, যে ব্যক্তি অন্যের কাছে ঋণ পাবে, সে যদি এই শর্তে কিছু ঋণ কমিয়ে দেয় যে, ওই ঋণকে নগদ পরিশোধ করবে, তাহলে এটি জায়েজ হবে না। উমর. জায়েদ ইবনু সাবেত ও ইবনু উমর রা. অনুরূপ বলেছেন।'[৫৩]

এ উত্তরের সারকথা হলো, সে সময় মুসলিমরা বনু নজিরের সঙ্গে যুদ্ধ অবস্থায় ছিলো। সুতরাং এ অবস্থায় মুসলিমদের জন্য বনু নজিরের সব সম্পদ দখল করে নেওয়াও বৈধ ছিলো। অতএব এ অবস্থায় তারা যদি সামান্য কিছু কমিয়ে দেয়, তাহলে সেটি আরও উত্তমভাবে বৈধ হবে।

বনু নজিরের ঘটনা দলিল না হওয়ার চতুর্থ কারণ হলো, ইহুদিরা মানুষদেরকে সুদের ভিত্তিতে ঋণ দিতো। আর মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কমিয়ে দেওয়ার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেটি ছিলো আসল সম্পদের ওপর বর্ধিত সুদের পরিমাণটি। আসল সম্পদ কমিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেননি। এ ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে আল্লামা ওয়াকেদি রহ.কর্তৃক তার 'সিয়ার' কিতাবে বর্ণনাকৃত ঘটনাটি। তিনি বলেন—

فأجلاهم أي بني النضير رسول الله صلي الله عليه وسلم من المدينة ، وولي إخراجهم محمد بن مسلمة ، فقالوا: إن لنا ديونا على الناس إلى آجال، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (تعجلوا وضعوا)

---

[৫৩] শরুহে সিয়ারে কাবির, ইমাম সারাখসি রহ., খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৪১২, ফিকরাহ নং ২৭৩৮। খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৯৪৪, ফিকরা নং ২৯২১। ১৪০৫ হিজরি সনে পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত সালাহুদ্দিনের টীকা সম্বলিত সংস্করণ।

، فكان لأبي رافع سلام بن أبي الحقيق على أسيد بن حضير عشرون ومائة دينار إلى سنة، فصالحه على أخذ رأس ماله ثمانين دينارا، وأبطل ما فضل.

'মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু নজিরকে মদিনা থেকে দেশান্তরিত করলেন। আর তাদেরকে দেশান্তরিত করার দায়িত্ব দিলেন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা রা.-এর ওপর। ইহুদিরা তখন বললো, মানুষের কাছে আমরা দীর্ঘ মেয়াদি কিছু ঋণ পাবো। এ কথা শুনে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিছু কমিয়ে দিয়ে দ্রুত আদায় করে নাও। আবু রাফে সালাম ইবনু আবুল হাকিক উসাইদ ইবনু হুজাইর রা.-এর কাছে এক বছর মেয়াদি একশো বিশ দিনার পেতো। সুতরাং আসল ঋণ তথা আশি দিনার পরিশোধের ব্যাপারে তারা মীমাংসা করে নিয়ে অতিরিক্ত সুদকে বাদ দিলো।'[৫৪]

এ বর্ণনাটি স্পষ্ট যে, কমিয়ে দেওয়া অর্থ ছিলো সুদের বর্ধিত অংশ। সেটি আসল সম্পদের অংশ নয়। এ কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম '**ضع وتعجل**' (কমিয়ে নাও ও দ্রুত পরিশোধ করো) পদ্ধতিকে হারাম বলেছেন। ইমাম মালিক রহ. জায়েদ ইবনু সাবেত রা-এর বর্ণনা উল্লেখ করার পর বলেছেন—

قال مالك : والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل، فيضع عنه الطالب، ويعجله المطلوب، قال مالك : وذلك عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل، فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب في حقه، قال: هذا الربا بعينه لا شك فيه.

'ইমাম মালিক রহ. বলেন, একটি মাকরুহ বিষয় এমন, যার ব্যাপারে আমাদের কোনো মতানৈক্য নেই। সেটি হলো, কোনো ব্যক্তি অন্যের কাছে দীর্ঘ মেয়াদের ঋণ পাবে। ফলে উসুলকারী কিছু অংশ কমিয়ে দিলো আর ঋণী ব্যক্তি বাকি অংশ নগদে পরিশোধ করে দিলো। ইমাম মালিক রহ. বলেন, আমাদের কাছে এ পদ্ধতিটি সেই পদ্ধতির মতো,

---

[৫৪] মাগাজি ওয়াকেদি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৭৪। আল্লামা ওয়াকেদি রহ. এ কথা বলেছেন যে, বনু কাইনুকাকে দেশান্তরিত করার সময়ও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিলো। দেখুন, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৭৯।

যেখানে উসুলকারী উসুলের সময় হয়ে যাওয়ার পর ঋণী ব্যক্তির জন্য সময় বৃদ্ধি করে দিলো আর ঋণী ব্যক্তিও তাকে কিছু বাড়িয়ে দিলো। তিনি বলেন, এটি সুদ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।'[৫৫]

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. জায়েদ ইবনু সাবেত রা.-এর হাদিস বর্ণনা করার পর বলেন—

قال محمد: وبهذا نأخذ، من وجب له دين على إنسان إلى أجل، فسأل أن يضع عنه، ويعجل له ما بقي، لم ينبغ ذلك، لأنه يعجل قليلا بكثير دينا، فكأن يبيع قليلا نقدا، بكثير دينا وهو قول عمر بن الخطاب ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عمر . وهو قول أبي حنيفة.

'ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, এ হাদিস দ্বারা আমরা প্রমাণ করি যে, যার কাছে নির্দিষ্ট মেয়াদে কেউ ঋণ পাবে আর সে প্রস্তাব দিলো যে, তার কিছু ঋণ কমিয়ে দেওয়া হোক এবং সে বাকি ঋণ দ্রুত আদায় করে দেবে। এমনটি করা উচিত নয়। কারণ, বেশি ঋণের বিনিময়ে নগদে কম ঋণ পরিশোধ করছে। সুতরাং কেমন যেন সে নগদ কম অর্থকে বেশি ঋণের বিনিময়ে বিক্রি করছে। এ অভিমতটি হলো উমর ইবনু খাত্তাব ও আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা.-এর। আর ইমাম আবু হানিফা রহ.-এরও এই অভিমত।'[৫৬]

আল্লামা ইবনু কুদামা রহ. বলেন—

إذا كان عليه دين مؤجل فقال لغريمه: ضع عني بعضه وأعجل لك بقيته، لم يجز. كرهه زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وسعيد بن المسيب وسالم والحسن وحماد والحكم والشافعي ومالك والثوري وهشيم وابن علية وإسحاق وأبو حنيفة ، وقال مقداد لرجلين فعلا ذلك: كلاكما قد آذن بحرب من الله ورسوله، وروي عن ابن عباس أنه لم ير به بأسا، وروي ذلك عن النخعي وأبي ثور ، لأنه آخذ ببعض حقه، تارك لبعضه، فجاز، كما لو كان الدين حالا ، وقال الخرقي : لا بأس أن يعجل المكاتب

[৫৫] মুয়াত্তা মালিক, অধ্যায়: বুয়ু, পরিচ্ছেদ : ঋণের সুদ সম্পর্কে, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬০৬। করাচি থেকে প্রকাশিত সংস্করণ।

[৫৬] মুয়াত্তা মালিক, পরিচ্ছেদ : বাকিতে পণ্য বা অন্য কিছু বিক্রি করার পর বললো নগদ মূল্য পরিশোধ করো, তাহলে তোমার ঋণকে কমিয়ে দেবো। খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৩২।

لسيده ويضع عنه بعض كتابته، ولنا أنه بيع الحلول فلم يجز، كما لو زاده الذي له الدين فقال له: أعطيك عشرة دراهم وتعجل لي المائة التي عليك، فأما المكاتب فإن معاملته مع سيده، وهو يبيع بعض ماله ببعض، فدخلت المسامحة فيه، ولأنه سبب العتق، فسومح فيه، بخلاف غيره.

'যদি কারও ওপর মেয়াদি ঋণ থাকে। ফলে সে তার ঋণদাতাকে বললো, আমার থেকে কিছু ঋণ কমিয়ে দাও, তাহলে বাকিটুকু পরিশোধ করে দিচ্ছি। এমনটি করা জায়েজ নেই। জায়েদ ইবনু সাবেত রা., ইবনু উমর রা., মিকদাদ রা., সাইদ ইবনু মুসাইয়াব রহ., সালেম রহ., হাসান বসরি রহ., হাম্মাদ রহ., হাকাম রহ., শাফিয়ি রহ., মালিক রহ., সুফিয়ান সাওরি রহ., হুশাইম রহ., ইবনু উলাইয়াহ রহ., ইসহাক রহ. ও আবু হানিফা রহ. এটিকে মাকরুহ বলেছেন। এ লেনদেন করেছে এমন দুজনকে মিকদাদ রা. বলেছিলেন, তোমরা দুজনই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সঙ্গে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছো। ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, এমন লেনদেনে তিনি কোনো সমস্যা দেখেন না। আল্লামা নাখয়ি ও আবু সাওর রহ. থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে। কারণ, সে তার কিছু হক নিয়েছে, আর কিছু ছেড়ে দিয়েছে। অতএব এটি জায়েজ হবে। যেমন ওই ঋণটি নগদ হলে এমন করা জায়েজ হতো। ইমাম খিরকি রহ. বলেন, মুকাতাব দাস তার মুকাতাবা চুক্তির অর্থ নগদ আদায় করে দেওয়ার বিনিময়ে কিছু কমিয়ে দেওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। আমাদের অভিমত অনুযায়ী এখানে সময় বিক্রি করা হচ্ছে। এ কারণে এটি জায়েজ নেই। যেমন : কেউ অন্যের কাছে মেয়াদি ঋণ পায় সে যদি ঋণীকে এ কথা বলে যে, আমি তোমাকে দশ টাকা দেবো আর তুমি তোমার কাছে পাওনা একশো টাকা নগদে দেবে (অর্থাৎ নগদের কারণে দশটাকা ঋণীকে দিচ্ছে যা সুদ)। (এ পদ্ধতিটি জায়েজ নেই।) আর মুকাতাবের বিষয়টি হলো, তার লেনদেনটি যেহেতু নিজ মালিকের সঙ্গে হচ্ছে। ফলে কেমন যেন মালিক তার একটি সম্পদকে অন্য সম্পদের বিনিময়ে বিক্রি করছে। যার ফলে সেখানে শিথিলতা এসেছে। আর মুকাতাব দাসের ব্যাপারটি যেহেতু আজাদের ব্যাপার, তাই সেখানে শিথিল দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে। তবে অন্যান্য মাসআলা এর বিপরীত হুকুমে হবে।'[৫৭]

[৫৭] আল-মুগনি, আল্লামা ইবনু কুদামা রহ., খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৭৪-১৭৫। শরহুল কাবিরের সঙ্গে প্রকাশিত সংস্করণ।

সুতরাং এসব ফিকহি বক্তব্যের আলোকে কিছু ঋণ কমিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে দ্রুত ঋণ পরিশোধ করার ক্ষেত্রে হারামের দিকটি প্রাধান্য পাবে।

১. নগদ ঋণের ক্ষেত্রে ضع وتعجل

তবে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয় তা হলো, এ ধরনের ঋণ কমিয়ে দেওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার হুকুমটি শুধু মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তবে সেসব নগদ ঋণ যেখানে চুক্তির মধ্যে মেয়াদের শর্ত থাকে না; বরং অন্য কোনো কারণে ঋণী বিলম্ব করে, তাহলে এ ক্ষেত্রে নগদে অবশিষ্ট ঋণ পরিশোধের শর্তে ঋণের কিছু অংশ কমিয়ে দেওয়ার চুক্তি করাতে কোনো সমস্যা নেই। আর এটি হানাফি আলেমগণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। হিদায়া কিতাবে উল্লেখ আছে, এক ব্যক্তি অন্য একজনের কাছে এক হাজার দিরহাম পায়। এখন সে বললো, আগামীকাল তুমি আমাকে পাঁচশো দিরহাম পরিশোধ করলে বাকিটা থেকে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে ঋণী ব্যক্তি মুক্ত হয়ে যাবে।[৫৮] মালিকি মাজহাবও একই রকম বর্ণিত আছে। 'মুদাওয়ানাতুল কুবরা' কিতাবে বর্ণিত হয়েছে—

قلت: أريت: لو أن لي على رجل ألف درهم قد حلت، فقلت: اشهدوا: إن أعطاني مائة درهم عند رأس الشهر، فتسعمائة درهم له، وإن لم يعطني فالألف كلها عليه. قال مالك: لا بأس بهذا، وإن أعطاه رأس الهلال فهو كما قال: وتوضع عنه التسعمائة، فإن لم يعطه رأس الهلال، فالمال كله عليه.

'আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি যদি কারও কাছে এমন এক হাজার দিরহাম পাই, যেটি পরিশোধের সময় এসে গেছে। ফলে আমি বললাম, তোমরা সাক্ষী থাকো! সে যদি মাস শেষে একশো দিরহাম পরিশোধ করে, তাহলে তার থেকে নয়শত দিরহাম কমিয়ে দেওয়া হবে। আর যদি মাস শেষে পরিশোধ না করে, তাহলে এক হাজার দিরহাম পরিশোধ করতে হবে। এ সম্পর্কে ইমাম মালিক রহ. বলেন, এমন লেনদেনে কোনো সমস্যা নেই। সে যদি মাস শেষে পরিশোধ করে দেয়, তাহলে ঋণদাতার কথা অনুযায়ী হবে এবং তার থেকে নয়শত দিরহাম কমিয়ে

[৫৮] হিদায়া, ফাতহুল কাদিরের সঙ্গে প্রকাশিত এডিশন, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩৯৭।

দেওয়া হবে। আর যদি মাস শেষে পরিশোধ না করে, তাহলে সম্পূর্ণ দিরহাম পরিশোধ করতে হবে।'

এরপর এ ধরনের আরও একটি মাসআলা বর্ণনা করে বলেন—

قلت : أرأيت لو أن لي على رجل مائة دينار ومائة درهم حالة فصالحته من ذلك على مائة دينار ودرهم نقدا، قال : لا بأس بذلك.

'আমি বললাম, যদি আমি কারও কাছে নগদ একশো দিনার ও একশো দিরহাম পাই। আর তার সঙ্গে নগদ একশো দিনার ও একটি দিরহামের ব্যাপারে সমঝোতা করে নিই, তাহলে এটিকে আপনি কেমন মনে করেন? তিনি উত্তরে বললেন, এমন লেনদেনে কোনো সমস্যা নেই।'[৫৯]

আল্লামা হাত্তাব রহ. বলেন—

وما ذكره عن عيسي هو في نوازله من كتاب المديان والتفليس ونصه: وسئل عن الرجل يقول لغريمه وقد حل حقه : أن عجلت لي كذا وكذا من حقي فبقيته عنك موضوع إن عجلته لي نقدا الساعة، أو إلى أجل يسميه، فعجل له نقدا، أو إلى الأجل، إلا الدرهم أو النصف أو أكثر من ذلك: هل تكون الوضيعة لازمة؟ فقال: ما أري الوضيعة تلزمه إذا لم يعجل له جميع ذلك، وأري الذي له الحق على شرطه. قال محمد بن رشد : هذه مسألة يتحصل فيها أربعة أقوال: أحدها قوله في هذه الرواية، وهو قول أصبغ في الواضحة. ومثله في آخر كتاب الصلح من المدونة أن الوضيعة لا تلزمه إلا أن يعجل له جميع ما شرط إلى الأجل الذي سمي، وهو أصح الأقوال.

'আল্লামা ইসা রহ. নাওয়াজিল কিতাবের 'মাদইয়ান ওয়াত তাফলিস' অধ্যায়ে যে বক্তব্য দিয়েছেন সেটি হলো, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যার হক পরিশোধের সময় আসার পর তার ঋণীকে বললো, তুমি যদি এখনই আমার এই পরিমাণ হক পরিশোধ করে দাও, তাহলে বাকি হক তোমার থেকে কমিয়ে দেওয়া হবে। অথবা নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করে এ কথা বললো। ফলে ঋণী তখন বা নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধ করলো—এক দিরহাম, অর্ধেক বা তার চেয়ে কিছু বেশি দিরহাম ব্যতিত—তাহলে এ ক্ষেত্রে কি কমিয়ে দেওয়া আবশ্যক?

[৫৯] মুদাওয়ানাতুল কুবরা, অধ্যায় : সমঝোতা, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ২৭।

উত্তরে বলেন, সম্পূর্ণ হক পরিশোধ করা ছাড়া কমিয়ে দেওয়াকে আমি আবশ্যক মনে করি না। আমি মনে করি ঋণ কমিয়ে দেওয়া সম্পূর্ণ পরিশোধের সঙ্গে শর্তযুক্ত ছিলো। আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু রুশদ রহ. বলেন, এ মাসআলার ক্ষেত্রে চারটি অভিমত রয়েছে। তার একটি অভিমত সেটি, যা এই বর্ণনার মধ্যে রয়েছে। ওয়াজেহা কিতাবের ভাষ্য অনুযায়ী এটি ইমাম আসবাগ রহ.-এর অভিমত। মুদাওয়ানা কিতাবের সমঝোতা (صلح) অধ্যায়ের শেষে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। কমিয়ে দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট যে সময়ের শর্তারোপ করা হয়েছে সে সময়ে সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করা ছাড়া কমিয়ে দেওয়া আবশ্যক হবে না। এটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ অভিমত।'[৬০]

এ হলো নগদ ঋণের ক্ষেত্রে কমিয়ে দিয়ে দ্রুত পরিশোধ জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে হানাফি ও মালিকি মাজহাবের আলেমদের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বক্তব্য। মনে হয়, অন্যান্য মাজহাবের ফকিহগণও এ ব্যাপারে তাদের সঙ্গে একমত পোষণ করবে। কারণ, কমিয়ে দিয়ে দ্রুত আদায়কে তারা যেখানেই হারাম বলেছেন, সেখানে মেয়াদি ঋণের শর্তারোপ করেছেন। যেমন :আল্লামা ইবনু কুদামা রহ. এ মাসআলাকে মেয়াদি ঋণের সঙ্গে শর্তযুক্ত করেছেন। (ইতোপূর্বে তার বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে।) আর এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, ফিকহি কিতাবের ভাষ্যের বিপরীত উদ্দেশ্য দলিল হিসেবে সাব্যস্ত হয়। সুতরাং নগদ ঋণের ক্ষেত্রে কমিয়ে দিয়ে দ্রুত পরিশোধের শর্তারোপ করা জায়েজ আছে। শায়খ শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. কাব ও ইবনু আবু হাদরাদ রা.-এর অর্ধেক ঋণ কমিয়ে দেওয়ার ঘটনা বর্ণনার পর বলেন—

فقال أهل العلم في التطبيق بينه وبين هذه الآثار أن الآثار في المؤجل، وهذا في الحال، وفي كتاب الرحمة : اتفقوا على من كان له دين على إنسان إلى أجل، فلا يحل له أن يضع عنه بعض الدين قبل الأجل ليعجل له الباقي... على أنه لا بأس إذا حل الأجل أن يأخذ البعض ويسقط البعض.

'ওই সকল হাদিস ও এই ঘটনার মধ্যে সমন্বয় করতে গিয়ে আহলে ইলম বলেছেন, হাদিসসমূহ মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর এই

[৬০] তাহরিরুল কালাম ফি মাসায়িলিল ইলতেজাম, আল্লামা হাত্তাব রহ.-এর রচিত। পৃষ্ঠা : ২৩১। ফাতহুল আলি আল-মালিক, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৮৯-২৯০।

ঘটনা নগদ ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিতাবুর রহমতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি কারও কাছে মেয়াদি ঋণ পাবে। তার জন্য মেয়াদ আসার আগে দ্রুত উসুলের উদ্দেশ্যে কিছু ঋণ কমিয়ে দেওয়া জায়েজ হবে না। তবে যদি ঋণ পরিশোধের সময় হয়ে যায়, তাহলে কিছু উসুল করে আর কিছু কমিয়ে দিলে কোনো সমস্যা নেই।'[৬১]

মেয়াদি ঋণ ও নগদ ঋণের মধ্যকার পার্থক্য এ দিক থেকে স্পষ্ট যে, নগদ ঋণের মধ্যে কোনো ধরনের মেয়াদের শর্তারোপ করা হয় না। আর ঋণীর জন্য ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করার অধিকার থাকে না। যেহেতু সেখানে সময়ের বিষয়টি নেই। সেহেতু এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, ঋণ থেকে কমিয়ে দেওয়া অংশটি সময়ের বিনিময়ে হয়েছে। ফলে সেটি সুদের আওতাধীন হবে না।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা জরুরি যে, হানাফি, শাফিয়ি ও হাম্বালি মাজহাবে কর্জে হাসানাকে (সুদহীন ঋণ) মেয়াদযুক্ত করলেও মেয়াদি হয় না। শুধু মালিকি মাজহাব অনুযায়ী সেটি মেয়াদযুক্ত হয়। আল্লামা ইবনু কুদামা রহ. বলেন—

وإن أجل القرض لم يتأجل، وكان حالا. وكل دين حل أجله لم يصر مؤجلا بتأجيله، وبهذا قال الحارث العكلي والأوزاعي وابن المنذر والشافعي . وقال مالك والليث : يتأجل الجميع بالتأجيل. وقال أبو حنيفة في القرض وبدل المتلف كقولنا.

'যদি ঋণকে মেয়াদযুক্ত করে, তাহলেও সেটি মেয়াদি হবে না। সেটি নগদ থাকবে। আর যেসব ঋণ পরিশোধের সময় হয়ে গেছে, সেগুলোকে মেয়াদি করার দ্বারা মেয়াদি হয় না। হারেস উকালি, আওজায়ি, ইবনু মুনজির ও শাফিয়ি রহ. অনুরূপ বলেছেন। আর ইমাম মালিক ও লায়েস রহ. বলেন, মেয়াদি করার মাধ্যমে সবধরনের ঋণ মেয়াদি হয়ে যায়। ঋণ ও ক্ষতিগ্রস্ত জিনিসের ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অভিমত হলো আমাদের মতো।'[৬২]

---

[৬১] আল-মুসাওয়া, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৮২।

[৬২] মুগনি, আল্লামা ইবনু কুদামা রহ., খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৫৪। শরহুল কাবিরের সঙ্গে প্রকাশিত সংস্করণ।

আল্লামা আইনি রহ. বলেন—

اختلف العلماء في تأخير الدين فى القرض إلى أجل، فقال أبو حنيفة وأصحابه : سواء كان القرض إلى أجل أو غير أجل، له أن يأخذ متي أحب، وكذلك العارية وغيرها، لأنه عندهم من باب العدة والهبة غير مقبوضة، وهو قول الحارث العكلي وأصحابه وإبراهيم النخعي . وقال ابن أبي شيبة : وبه نأخذ. وقال مالك وأصحابه إذا أقرضه إلى أجل، ثم أراد أن يأخذ قبل الأجل، لم يكن له ذلك.

'কোনো মেয়াদ পর্যন্ত ঋণের বিলম্ব করার ব্যাপারে আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন। ইমাম আবু হানিফা রহ. ও তার সঙ্গীরা বলেছেন যে, ঋণ মেয়াদি হোক বা না হোক উভয়টি সমান। কর্জদাতা তার ইচ্ছে অনুযায়ী যে-কোনো সময়ে উসুল করতে পারে। ধার বা অনুরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রেও একই হুকুম। কারণ, তাদের কাছে এগুলো ওয়াদা, কবজাহীন দান বা অনুরূপ বিষয়ের মতো। এটি হারেস উকালি ও তার সঙ্গীরা এবং ইবরাহিম নাখয়ি রহ.-এর অভিমত। ইবনু আবু শাইবা রহ. বলেন, আমরা এ অভিমতটিকেই গ্রহণ করি। ইমাম মালিক ও তার সঙ্গীরা বলেন, কাউকে মেয়াদি ঋণ দেওয়ার পর মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে সেটি উসুল করতে চাইলে উসুল করতে পারবে না।[৬৩]

সুতরাং যারা বলেন যে, কর্জকে মেয়াদি করার দ্বারা মেয়াদি হয় না, তাদের কথা অনুযায়ী সব ঋণের মধ্যে '**ضع وتعجل**' (কমিয়ে দাও আর দ্রুত পরিশোধ করো) জায়েজ আছে। কেননা, এগুলো নগদ ঋণের আওতাভুক্ত, যেখানে '**ضع وتعجل**' করা জায়েজ আছে। এ ক্ষেত্রে মূল দলিল হলো কাব ইবনু মালিক রা.-এর বর্ণিত এই হাদিস—

أَنَّهُ كَانَ لَهُ على عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ دَيْنٌ فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ فَتَكَلَّمَا حَتَّي ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عليه وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا

[৬৩] উমদাতুল কারি, আল্লামা আইনি রহ.-এর রচিত, অধ্যায় : ঋণ নেওয়া, পরিচ্ছেদ : নির্দিষ্ট মেয়াদে ঋন দেওয়া, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৬০। আহকামুল কুরআন, ইমাম জাস্‌সাস রহ., খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৮৩, ঋণের আয়াতের আলোচনার অধীনে। ফাতহুল বারি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৬৬। আল-মুসাওয়া, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৮২। ফাতাওয়া তানকিহুল হামেদিয়া, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৭৭। শরহে মাজাল্লাহ, আল্লামা খালেদ আতাসি রহ., খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৪৯।

كَعْبُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النِّصْفَ فَأَخَذَ نِصْفَ مَا عليه وَتَرَكَ نِصْفًا.

'কাব ইবনু মালিক রা. আবদুল্লাহ ইবনু হাদরাদ আসলামি রা.-এর কাছে ঋণ পেতেন। তার সঙ্গে দেখা হলে তিনি তাকে আটকে ধরলেন। তারা পরস্পর বিতর্ক করতে থাকলেন, এমনকি তাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেলো। এরপর মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হাত দিয়ে ইশারা করলেন। কেমন যেন তিনি অর্ধেক নেওয়ার কথা বলছিলেন। ফলে কাব রা. অর্ধেক ঋণ নিলেন এবং বাকি অর্ধেক ছেড়ে দিলেন।'[৬৪]

২. প্রতিশ্রুত সময়ের আগে ঋণ পরিশোধ করার কারণে শর্ত ছাড়া কিছু কমিয়ে দেওয়া

মেয়াদি ঋণ দ্রুত পরিশোধ করার কারণে কমিয়ে দেওয়া তখনই নিষিদ্ধ হবে যখন দ্রুত পরিশোধ করার কারণে কমিয়ে দেওয়াটা ঋণদাতার ওপর শর্ত করা হবে। তবে যদি কোনো ধরনের শর্ত ছাড়া ঋণী দ্রুত পরিশোধ করে দেয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে ঋণদাতার জন্য বৈধ আছে যে, সৌজন্যমূলক কিছু ঋণ কমিয়ে দেবে। যেসব হাদিস 'ضع وتعجل'-এর বৈধতা প্রমাণ করে, সেগুলোকে ইমাম জাস্সাস রহ. এ পদ্ধতির ওপর প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেন—

ومن أجاز من السلف إذا قال: عجل لي وأضع عنك، فجائز أن يكون أجازوه إذا لم يجعله شرطا فيه، وذلك بأن يضع عنه بغير شرط، ويعجل الآخر الباقي بغير شرط.

'আমাদের পূর্ববর্তী ইমামদের মধ্যে যারা জায়েজ বলেছেন, তারা সে পদ্ধতিকে জায়েজ বলেছেন, যেখানে এমন শর্ত করা হয় না। আর সেটি এভাবে যে, কোনো ধরনের পূর্বশর্ত ছাড়া ঋণদাতা ঋণীর কিছু ঋণ কমিয়ে দেবে। আর ঋণী কোনোরূপ শর্ত ছাড়া সে নগদে পরিশোধ করে দেবে।'[৬৫]

---

[৬৪] বুখারি, হাদিস নং ২৪২৪।

[৬৫] আহকামুল কুরআন, ইমাম জাস্সাস রহ., খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৬৭। সুদের আয়াতের

৩. মুরাবাহা মুআজ্জালাতে ضع وتعجل

এরপর কথা হলো; দ্রুত পরিশোধের শর্তে কিছু ঋণ কমিয়ে দেওয়া নিষিদ্ধ হলো দরদামের মাধ্যমে সংঘটিত বিক্রয়ের মধ্যে। অর্থাৎ, সেসব সাধারণ বিক্রয় মুরাবাহার পদ্ধতিতে সংঘটিত হয় না। কাঙ্ক্ষিত লভ্যাংশের পরিমাণ উল্লেখ ছাড়া বিক্রয়চুক্তি সংঘটিত হয়। তবে যদি মুরাবাহার পদ্ধতিতে বিক্রয়চুক্তি হয়। আর মেয়াদের কারণে বিক্রেতা আসল মূল্যের ওপর তার লভ্যাংশের পরিমাণ উল্লেখ করে, তাহলে এ ক্ষেত্রে হানাফি মাজহাবের পরবর্তী সময়ের ফকিহগণ বলেছেন যে, ঋণী যদি মেয়াদের আগে ঋণ পরিশোধ করে দেয় বা মারা যায়, তাহলে বিক্রেতা শুধু সে পরিমাণ অর্থ নিতে পারবে, যে পরিমাণ মেয়াদ অতীত হয়েছে। আর অবশিষ্ট মেয়াদের বিনিময়ে যে পরিমাণ ঋণ আসে, সেটিকে কমিয়ে দেবে। আল্লামা হাসকাফি রহ. 'আদ্দুররুল মুখতার' কিতাবে বলেন—

قضي المدين الدين المؤجل قبل الحلول أو مات، فحل بموته، فأخذ من تركته لا يأخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضي من الأيام، وهو جواب المتأخرين، قنية، وبه أفتي المرحوم أبو السعود أفندي مفتي الروم، وعلله بالرفق للجانبين.

'ঋণী যদি মেয়াদি ঋণকে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পরিশোধ করে বা মারা যাবার কারণে ঋণটি নগদে পরিণত হয়, ফলে তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে ঋণ উসুল করা হলো। এ ক্ষেত্রে তাদের মধ্যকার মুরাবাহা চুক্তির সম্পূর্ণ অর্থ উসুল করতে পারবে না। শুধু যে পরিমাণ মেয়াদ অতীত হয়েছে, সে পরিমাণ অর্থ উসুল করবে। এটি মুতাআখখিরিনদের সমাধান। কিনয়াহ কিতাব থেকে উদ্ধৃত। রোমের মুফতি মরহুম আবু সাউদ আফিন্দি রহ. এ ফতোয়া দিয়েছেন। আর দু-পক্ষের প্রতি সহানুভূতি দেখানো এই বিষয়কে তিনি কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।'

এ বক্তব্যের নিচে আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ. বলেন—

قوله : (لا يأخذ من المرابحة) صورته: اشتري شيئا بعشرة نقدا، وباعه بآخر بعشرين إلى أجل هو عشرة أشهر، وإذا قضاه بعد

আলোচনা।

تمام خمسة (أشهر) أو مات بعدها يأخذ خمسة، ويترك خمسة.

'মুসান্নিফ রহ.-এর বক্তব্য; মুরাবাহার সম্পূর্ণ অর্থ উসুল করবে না। এটির উদাহরণ হলো, নগদ দশ টাকায় কোনো পণ্য ক্রয় করলো। আর সেটিকে দশমাস মেয়াদে বিশ টাকায় অন্যের কাছে বিক্রি করে দিলো। এখন যদি পাঁচমাস পর মূল্য পরিশোধ করে দেয় বা মারা যায়, তাহলে লভ্যাংশের পাঁচ টাকা নেবে। আর পাঁচ টাকা ছেড়ে দেবে।'[৬৬]

হুবহু এ মাসআলাটি 'তানকিহুল ফাতাওয়াল হামেদিয়া' কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে এই অংশটি বেশি রয়েছে—

سئل فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ دين معلوم، فرابحه عليه إلى سنة، ثم بعد ذلك بعشرين يوما مات عمرو المديون، فحل الدين، ودفعه الورثة لزيد، فهل يؤخذ من المرابحة شيء أو لا؟

الجواب: جواب المتأخرين أنه لا يؤخذ من المرابحة التي جرت مبايعة عليها إلا بقدر ما مضي من الأيام. قيل: (للعلامة نجم الدين: أتفتي به؟ قال: نعم. كذا في الأنقروي والتنوير. وأفتي به علامة الروم مولانا أبو السعود.

'এ মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, আমরের ওপর জায়েদের নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ঋণ রয়েছে। আর জায়েদ আমরের সঙ্গে এক বছর মেয়াদি মুরাবাহা করলো। এরপর বিশদিন পর ঋণী আমর মারা গেলো, ফলে ঋণটি নগদ হয়ে গেলো। আর আমরের ওয়ারিস জায়েদের ঋণ পরিশোধ করতে চাচ্ছে, এ ক্ষেত্রে মুরাবাহার অর্থ নেওয়া যাবে কি না?

মুতাআখখিরিনদের উত্তর হলো, মুরাবাহার যে মেয়াদ অতীত হয়ে গেছে শুধু সে পরিমাণ মুরাবাহার অর্থ নেওয়া যাবে। এ ছাড়া অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া যাবে না। আল্লামা নাজমুদ্দিন রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনিও কি এই ফতোয়া দেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আনকারাবি ও

[৬৬] রদ্দুল মুহতার, অধ্যায় : হজর ইবাহাত, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৭৫৭। বুয়ূ অধ্যায়ে ঋণ পরিচ্ছেদের আগে এ মাসআলাটি বর্ণনা করেছেন। সেখানে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লামা হানুতি, নাজমুদ্দিন, আবু সাউদ ও অন্যান্যরা এ সিদ্ধান্তের ওপর ফতোয়া দিয়েছেন। খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৬০। হাশিয়াতুত তাহতাবি আলাদ্দুর, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১০৪, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৬৩।

তানবির কিতাবে অনুরূপ বর্ণিত আছে। রোমের মাওলানা আবু সাউদ রহ. এমন ফতোয়া দিয়েছেন।'[৬৭]

হানাফি মাজহাবের পরবর্তী আলেমগণের এই ফতোয়া দরদাম করে লেনদেন এবং মুরাবাহা লেনদেনের মধ্যে পার্থক্য করেছে—যেখানে সময়ের কারণে মূল্য বৃদ্ধির বিষয়টিকে বিক্রেতার পক্ষ থেকে স্পষ্ট করা হয়। সুতরাং দরদামের মাধ্যমে সংঘটিত লেনদেনের ক্ষেত্রে 'ضع وتعجل' জায়েজ নেই। যেমন ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। তবে মুরাবাহা লেনদেনের মধ্যে সেটি জায়েজ আছে। মুতাআখখিরিন আহনাফ এমন ফতোয়া দেওয়ার সম্ভাব্য কারণ এই হতে পারে যে, স্বতন্ত্রভাবে 'সময়' যদিও বিনিময়যোগ্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে না, তবে পরোক্ষভাবে অথবা অন্যদের অনুগামী হিসেবে তার বিনিময়ে মূল্যের একটি অংশ নির্ধারণ করা জায়েজ আছে। যেমন : স্বতন্ত্রভাবে গাভীর গর্ভস্থ বাছুর বিক্রয় করা জায়েজ নেই, তবে গর্ভের বাচ্চার কারণে গাভীর মূল্য বৃদ্ধি করা জায়েজ আছে। সুতরাং এমন কিছু জিনিস রয়েছে যেগুলোকে স্বতন্ত্রভাবে বিক্রি করা জায়েজ নেই। তবে অন্যের অনুগামী হিসেবে তার মূল্য নেওয়া জায়েজ আছে। আর মুরাবাহা পদ্ধতির বিক্রিটা যেহেতু লভ্যাংশের পরিমাণ স্পষ্ট করার মাধ্যমে হয়ে থাকে, তাই সেখানে সময়ের বিনিময়ে মূল্যের একটি অংশ হওয়া জায়েজ আছে। কেমন যেন সময়টি পণ্যের একটি গুণে পরিণত হয়েছে। সুতরাং যখন মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে মূল্য পরিশোধ করে দেওয়া হয় অথবা ঋণী মারা যাওয়ার কারণে পরিশোধের সময় তাৎক্ষণিক হয়ে যায়, তখন গুণের মাঝে ত্রূটি চলে আসে তাই গুণ অনুপাতে মূল্য কমে যাবে। আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ. এ মাসআলার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন—

ووجه بأن الربح في مقابلة الأجل، لأن الأجل وإن لم يكن مالا، ولا يقابله شيء من الثمن، ولكن اعتبروه مالا في المرابحة إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن، فلو أخذ كل الثمن قبل الحلول، كان أخذه بلا عوض.

[৬৭] তানকিহুল ফাতাওয়াল হামেদিয়া, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৯৩। শরহে মাজাল্লাহ, আল্লামা খালিদ আতাসি রহ., খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৫৫।

'আর সেটির এমন কারণ দর্শানো হয়েছে যে, লভ্যাংশ হলো সময়ের বিনিময়। কেননা, সত্তাগতভাবে সময় যদিও কোনো পণ্য নয় এবং তার বিনিময়ে কোনো মূল্য থাকে না, তবে মুরাবাহার ক্ষেত্রে যখন সময়ের কারণে মূল্য বৃদ্ধির বিষয়টি উল্লেখ করা হবে, তখন সেটিকে পণ্য হিসেবে গণ্য করা হবে। সুতরাং মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে যদি পূর্ণ মূল্য আদায় করে নেয়, তাহলে সেটি হবে বিনিময়হীন মূল্য উসুল করা।'[৬৮]

এই ব্যাখ্যাটি যদিও যুক্তিনির্ভর। কিন্তু ইতোপূর্বে 'ضع وتعجل' নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে আমরা যেসব দলিল বর্ণনা করেছি সেগুলোর সঙ্গে এটি সাংঘর্ষিক। কারণ, সে দলিলগুলো মুরাবাহা ও দরদামের মাধ্যমে সংঘটিত চুক্তির মধ্যে কোনো ধরনের পার্থক্য সাধন ছাড়া সব ধরনের ঋণের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। এই ফতোয়া অনুযায়ী আমল করা কখনো মুরাবাহা ও কিস্তির মাধ্যমে সংঘটিত লেনদেনকে সুদি লেনদেনের সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ করে দেয়। যেখানে দায়িত্বে আরোপিত ঋণ কমবেশি হওয়ার বিষয়টি পরিশোধের বিভিন্ন সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে দোদুল্যমান থাকে। অতএব কিস্তিভিত্তিক লেনদেন এবং ইসলামি ব্যাংক যেসব মুরাবাহার লেনদেন করে, সেখানে এই ফতোয়ার ওপর আমল করাকে আমি ভালো মনে করছি না। মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

পঞ্চম আলোচনা : কিস্তি পরিশোধে টালবাহানা করার কারণে ঋণকে নগদে পরিণত করা

কিস্তি ভিত্তিক বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনেক সময় এমন শর্তারোপ করা হয় যে, ক্রেতা যদি নির্দিষ্ট সময়ে কিস্তি পরিশোধ না করে, তাহলে বাকি কিস্তিগুলো তখনই পরিশোধ করতে হবে। আর বিক্রেতার জন্য তৎক্ষণাৎ সব কিস্তি উসুল করার অধিকার থাকবে। সুতরাং এমন শর্তারোপ করা জায়েজ আছে কি না?

হানাফি মাজহাবের কিছু কিতাবে এই মাসআলাটি বর্ণিত হয়েছে। 'খুলাসাতুল ফাতাওয়া' কিতাবে বর্ণিত হয়েছে—

ولو قال : كلما دخل نجم ولم تؤد، فالمال حال، صح، ويصير المال حالا.

[৬৮] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৭৫৭।

'বিক্রেতা যদি বলে যে, কিস্তি পরিশোধের সময় আসলে তুমি যদি কিস্তি পরিশোধ না করো, তাহলে সব ঋণ নগদে পরিণত হবে। এমন চুক্তি করা সহিহ্ আছে। আর সব ঋণ নগদে পরিণত হবে।'[৬৯]

ফাতাওয়া বাজ্জাজিয়াতে এই মাসআলাটি এমন বিবর্তনের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে, সেখানে তার সঠিক উদ্দেশ্য ঠিক থাকে না। আল্লামা রামলি রহ. 'জামেউল ফুসুলাইন' কিতাবের টীকায় সেটির সমস্যাকে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেন—

في البزازية: وإبطال الأجل يبطل بالشرط الفاسد بأن قال: كلما حل نجم ولم تؤد، فالمال حال، صح، وصار حالا. اهـ وعبارة الخلاصة: وإبطال الأجل يبطل بالشرط الفاسد. ولو قال: كلما دخل نجم ولم تؤد، فالمال حال، صح، والمال يصير حالا. اهـ فجعلها مسألتين، وهو الصواب. والله أعلم. ذكره الغزي.

'বাজ্জাজিয়া কিতাবে বর্ণিত আছে, ফাসেদ শর্তের মাধ্যমে মেয়াদ বাতিল হবে। যেমন : কেউ বললো যে, কিস্তি পরিশোধের সময় আসার পর যদি কিস্তি পরিশোধ না করো, তাহলে সব কিস্তি নগদে পরিণত হবে। এমন শর্তারোপ করা সহিহ্ আছে এবং সব কিস্তি নগদে পরিণত হবে। আর খুলাসা কিতাবের বক্তব্য হলো, ফাসেদ শর্তের মাধ্যমে মেয়াদ বাতিল হয়ে যায়। কেউ যদি বলে যে, কিস্তি পরিশোধের সময় আসার পর যদি কিস্তি পরিশোধ না করো, তাহলে সব কিস্তি নগদে পরিণত হবে। এমন শর্তারোপ করা সহিহ্ আছে এবং সব কিস্তি নগদে পরিণত হবে। সুতরাং তিনি এই মাসআলা দুটিকে ভিন্ন করে বর্ণনা করেছেন। আর এটিই সঠিক।'[৭০]

উদ্ধৃত ফিকহি বক্তব্যগুলো এ ধরনের শর্ত জায়েজ হওয়া প্রমাণ করে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে মেয়াদ আসার পর ক্রেতা যদি কিস্তি পরিশোধে টালবাহানা করে, তাহলে সে ক্ষেত্রে বিক্রেতার জন্য বৈধ আছে যে, অবশিষ্ট কিস্তিকে নগদে পরিশোধ করার দাবি করবে। তবে হানাফি মাজহাবের পরবর্তী আলেমদের পক্ষ থেকে

---

[৬৯] খুলাসাতুল ফাতাওয়া, অধ্যায়. বুয়ু, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৫৪। (লাহোর থেকে প্রকাশিত সংস্করণ।)

[৭০] আল-ফাওয়াইদুল খয়রিয়া আলা জামেউল ফুসুলাইন, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪। (১৩০০ হিজরি সনে আজহার থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)

ইতোপূর্বে যে উদ্ধৃতি বর্ণনা করেছি তার আলোকে মুরাবাহার মাসআলাতে যে পরিমাণ মেয়াদ অতীত হয়েছে সেই মেয়াদের পরিমাণের চেয়ে বেশি লভ্যাংশ দাবি করবে না। সুতরাং যারা পূর্বের ফতোয়া গ্রহণ করবে, তারা যেন এই মাসআলার ওপর আমল করে। আর যারা সেটিকে গ্রহণ করবে না—আমাদের অভিমত অনুযায়ী এটিই উত্তম সিদ্ধান্ত—তাদের জন্য কিস্তি পরিশোধে টালবাহানা করার কারণে সব কিস্তি নগদে পরিণত হওয়ার ফতোয়া দেওয়া হবে। মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

ষষ্ঠ আলোচনা : টালবাহানার কারণে জরিমানা আরোপ করা

বাকি বিক্রয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত আরও একটি মাসআলা রয়েছে। সেটি হলো, অনেক সময় মেয়াদ আসার পরও ঋণী (ক্রেতা) ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করে। অথবা চুক্তি অনুযায়ী কোনো কিস্তি পরিশোধে টালবাহানা করে। এমন ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে, কী কারণে সে টালবাহানা করছে? সে যদি আর্থিক সংকীর্ণতার কারণে এমন করে থাকে, তাহলে তার সম্পর্কে পবিত্র কুরআন স্পষ্ট হুকুম দিয়েছে। আর সেটি হলো মহান আল্লাহর বাণী—

﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾

'ঋণী যদি আর্থিক সংকটের মধ্যে থাকে, তাহলে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দিতে হবে।'[৭১]

অর্থাৎ, এমন অবস্থায় ঋণদাতার জন্য আবশ্যক হলো যে, ঋণী তার আর্থিক সংকীর্ণতা দূর করে ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা অর্জন পর্যন্ত তাকে সুযোগ দেবে। এ ক্ষেত্রে ঋণদাতার পক্ষ থেকে আসল ঋণের সঙ্গে কোনো কিছু বাড়িয়ে দেওয়া জায়েজ নেই। কেননা, এমন বর্ধিত অর্থ সুদ হওয়ার ব্যাপারে কোনো ধরনের সন্দেহ নেই।

তবে অনেক ক্ষেত্রে আর্থিক সংকীর্ণতার কারণ ছাড়া অন্য কারণে টালবাহানা করা হয়। বর্তমানে আমরা লক্ষ করেছি যে, মানুষের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং চারিত্রিক আদর্শ কমে গেছে। তাদের মধ্যে দীন ও আমানতের বিষয়টি হ্রাস পেয়েছে। এ কারণে অধিকাংশ লোক নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়

---

[৭১] সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৮০।

না, ফলে তাদের টালবাহানার কারণে ঋণদাতা এমন মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়, যা কারও কাছে অস্পষ্ট নয়। আর বর্তমানে প্রত্যেক ঋণদাতা টালবাহানার সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। তবে টালবাহানার কারণে ইসলামি ব্যাংকগুলো বেশি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এবং সেটি বেশি ক্ষতিকর। সেটি এ কারণে যে, সুদি ব্যাংকগুলোর পক্ষ থেকে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের বিষয়টি ঋণীকে নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে চাপ সৃষ্টি করছে। কেননা, ঋণী যদি কোনো কারণ বা কারণ ছাড়া ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করে, তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সুদের পরিমাণ বেড়ে যাবে। কিন্তু টালবাহানা বা পরিশোধে অক্ষম হওয়ার কারণে শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামি ব্যাংক যেহেতু ঋণের ওপর কোনোরূপ বৃদ্ধি করাতে পারবে না তাই অনেক সময় ঋণী এই সুযোগকে গনিমত হিসাবে নেয়। আর তার ইচ্ছেমতো টালবাহানা করতে থাকে। সেইসঙ্গে সবার কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, বর্তমান ব্যবসানীতিতে সময়ের খুব বেশি গুরুত্ব রয়েছে। বিশেষ করে আধুনিক ব্যাংকিং নীতিতে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ঋণীর পক্ষ থেকে এমন টালবাহানা ঠেকানোর জন্য কি কোনো পদ্ধতি আছে? বিশেষ করে ইসলামি ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে?

আমি যেটি বিশ্বাস করি সেটি হলো, দেশের সব ব্যাংক যদি শরয়ি পদ্ধতি অনুরসণ করতো, তাহলে এ বিষয়টি বড়ো কোনো সমস্যা সৃষ্টি করতে পারতো না। কেননা, এ ধরনের গ্রাহকদেরকে ভবিষ্যতে ব্যাংকিং সুবিধা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া যেতো, ফলে তাদের নাম ব্লাকলিস্ট ভুক্ত করা হতো। আর দেশের কোনো ব্যাংকই তার সঙ্গে আর্থিক লেনদেন করতো না। সুদের পরিমাণ বৃদ্ধি অপেক্ষা এই পদক্ষেপটি ঋণীকে সময় মতো ঋণ পরিশোধে বেশি চাপ সৃষ্টি করতো। অনুরূপভাবে এ ধরনের টালবাহানাকারীদেরকে অন্য কোনো শাস্তি দেওয়ার সুযোগ থাকতো। কেননা, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

مطل الغني ظلم.

'সম্পদশালীর পক্ষ থেকে টালবাহানা করা জুলুম।'[৭২]

অন্য হাদিসে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

لي الواجد يحل عقوبته وعرضه.

[৭২] বুখারি, অধ্যায়: ইস্তেকরাজ, হাদিস নং ২৪০০।

'সম্পদশালীর পক্ষ থেকে টালবাহানা করা তাকে শাস্তি দেওয়া ও তার মর্যাদাকে হালাল করে দেয়।'[৭৩]

হাদিসের শব্দ اللي -এর অর্থ টালবাহানা করা এবং الواجد -এর অর্থ সম্পদশালী। তবে প্রথম পদ্ধতি তথা টালবাহানাকারীর নামকে ব্লাকলিস্টভুক্ত করা। এটি সে সময় কার্যকরী ভূমিকা রাখবে, যখন দেশের সব ব্যাংক একটি পদ্ধতি অনুসরণ করবে। আর দ্বিতীয় পদ্ধতি (তথা শাস্তি দেওয়া) বাস্তবায়নের জন্য একটি ট্রাইবুনালের প্রয়োজন পড়বে। যেখানে অতিদ্রুত রায় দেবে। তবে অধিকাংশ ইসলামি দেশে এ দুটি বিষয়ই অনুপস্থিত। কেননা, এ ধরনের সমস্যার মৌলিক সমাধান বর্তমান ব্যাংকগুলোর হাতে নেই।

এ কারণে সমকালীন কিছু আলেম এই প্রস্তাব দিয়েছেন যে, এ ধরনের টালবাহানার কারণে ব্যাংকসমূহ বাস্তবিক যে পরিমাণ আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেটি ঋণীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। অনেক ইসলামি ব্যাংক এই প্রকৃত জরিমানার পরিমাণ নির্ধারণ করেছে ওই টালবাহানার সময় ব্যাংকের সেভিংস অ্যাকাউন্টে প্রকৃত লাভের হিসাবে। ওই সময়ে ব্যাংকের সেভিংস অ্যাকাউন্টে যদি কোনো লাভ না হয়ে থাকে, তাহলে ঋণীর কাছে কোনো জরিমানা দাবি করা হবে না। আর সেখানে যদি লাভ হয়ে থাকে, তাহলে ওই সময়ে প্রকৃত লাভের হারে ঋণীর কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করা হবে।

আর ফকিহগণ এই ক্ষতিপূরণ ও সুদের মধ্যে নিচের দিকগুলো থেকে পার্থক্য করেছেন—

১. সুদি লেনদেনে ঋণীর অবস্থা সচ্ছল হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় তার ওপর সুদ আরোপ করা হয়। আর উল্লিখিত পন্থায় ঋণী সচ্ছল টালবাহানাকারী হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হওয়া ছাড়া তার কাছে জরিমানা দাবি করা হয় না। ঋণী যদি অসচ্ছল হওয়া প্রমাণিত হয়, তাহলে কোনো অবস্থাতেই তার কাছে কোনো জরিমানা দাবি করা হবে না।

২. সুদি লেনদেনে ঋণী ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করার সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর সুদ আরোপ করা হয়। এমনকি একদিনের জন্য বিলম্ব হলেও সুদ আরোপ করা

---

[৭৩] বুখারি, অধ্যায় : ইস্তেকরাজ, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ি, মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদে ইসহাক, হাফেজ ইবনু হাজার রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী এ হাদিসটির সূত্র হাসান পর্যায়ের। ফাতহুল বারি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৬২।

হয়। আর ক্ষতিপূরণের বিষয়টি হলো, সেখানে টালবাহানার বিষয়টি প্রমাণিত হওয়া ছাড়া ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হয় না। আর কিছু ইসলামি ব্যাংকের কার্যক্রম হলো, ঋণ পরিশোধের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ক্ষতিপূরণ আরোপ করার আগে ঋণীর কাছে তারা চারটি সাপ্তাহিক সতর্কীকরণ চিঠি পাঠায়। সুতরাং মেয়াদ শেষ হওয়ার পর একমাস অপেক্ষা করার আগে জরিমানা আরোপ করা হয় না।

৩. সুদের ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় ঋণীর ওপর সুদ আরোপ করা হয়। আর প্রস্তাবিত এই জরিমানা কেবল সে ক্ষেত্রে আরোপ করা হবে, যখন টালবাহানাকালীন ব্যাংকের সেভিংস অ্যাকাউন্টে লাভ হবে। সেখানে যদি কোনো লাভ না হয়, তাহলে ঋণীর কাছে কোনো ক্ষতিপূরণ দাবি করা হবে না।

৪. সুদি লেনদেনে ঋণের চুক্তি করার সময় উভয় পক্ষ তাদের মধ্যকার সুদের পরিমাণটি জানতে পারে। কিন্তু জরিমানা পন্থায় মুরাবাহা বা ইজারা চুক্তি করার সময় জরিমানার পরিমাণটি জানা যায় না। বরং টালবাহানার সময় প্রকৃত লাভের হার অনুপাতে এই পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়।

এই চারটি পার্থক্যের ওপর নির্ভর করে সমকালীন এই সকল আলেম বলেছেন, সুদের সঙ্গে এই জরিমানার কোনো সম্পর্ক নেই। তারা এ ধরনের জরিমানা জায়েজের পক্ষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিস দিয়ে প্রমাণ দেন—

لا ضرر ولا ضرار.

'নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এবং অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।'[৭৪]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরও একটি হাদিস দিয়ে দলিল দিয়ে থাকেন। তা হলো—

لي الواجد يحل عقوبته وعرضه.

---

[৭৪] হাদিসটিকে ইমাম মালিক ও শাফিয়ি রহ. মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম আহমাদ, আবদুর রাজ্জাক, ইবনু মাজাহ ও তবরানি রহ. জাবের জুফি রহ.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর ইবনু আবু শাইবা অন্য একটি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যেটি এই সূত্র অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী। আর ইমাম দারা কুতনি রহ. আরও একটি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বিস্তারিত জানতে দেখুন, মাকাসেদে হাসানা, আল্লামা সাখাবি রহ.-এর রচিত, পৃষ্ঠা : ৪৬৮। আল্লামা নববি রহ. এটিকে হাসান বলেছেন। ফয়জুল কাদির, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৪৩২।

'সম্পদশালীর পক্ষ থেকে টালবাহানা করা তাকে শাস্তি দেওয়া ও তার মর্যাদাকে হালাল করে দেয়।'

তারা এ কথা বলে যে, ক্ষতিপূরণ আরোপ করা একটি আর্থিক শাস্তি। যার মাধ্যমে টালবাহানাকারীকে শাস্তি দেওয়া হয়।

সমকালীন আলেমদের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ আরোপ করার এই সিদ্ধান্তটি বাস্তবতা ও দর্শন উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নবিদ্ধ।

দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে তার সম্পর্কে প্রশ্ন হলো, টালবাহানার সমস্যা এটি এমন কোনো সমস্যা নয়, যা বর্তমানে সৃষ্টি হয়েছে। বরং সবসময় প্রত্যেক এলাকার ব্যবসায়ীরা এই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আসছে। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তৎপরবর্তী যুগেও এই সমস্যাটি ছিলো। কিন্তু কোনো হাদিস বা আছারে এমনটি পাওয়া যায় না যে, ঋণীর ওপর জরিমানা আরোপের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। দীর্ঘ চৌদ্দ শতাব্দীর কোনো একজন ফকিহ বা মুহাদ্দিসকে পাইনি যিনি এ ধরনের জরিমানা আরোপের পক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন। বরং এমন ফতোয়া পেয়েছি, যা এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে। যেমনটি সামনে উল্লেখ করবো। ইনশাআল্লাহ—

لا ضرر ولا ضرار.

'নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এবং অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।'[৭৫]

হাদিসটির মাধ্যমে দলিল দেওয়ার ব্যাপারে কথা হলো, এই হাদিসের মাধ্যমে অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। অনুরূপভাবে শরয়ি পদ্ধতিতে এই সমস্যা দূর করার বিষয়টিও এই হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত। কিন্তু হাদিস দ্বারা এটি আবশ্যক নয় যে, আর্থিক জরিমানার মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান করতে হবে। আর স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে কোনো হাদিস এ কথা প্রমাণ করে না যে, টালবাহানাকারীর সমস্যাকে জরিমানা আরোপ করার মাধ্যমে সমাধান

---

[৭৫] হাদসিটিকে ইমাম মালিক শাফিয়ি রহ. মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম আহমাদ, আবদুর রাজ্জাক, ইবনু মাজাহ ও তবরানি রহ. জাবের জুফি রহ.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর ইবনু আবু শাইবা অন্য একটি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যেটি এই সূত্র অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী। আর ইমাম দারা কুতনি রহ. আরও একটি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বিস্তারিত জানতে দেখুন, মাকাসেদে হাসানা, আল্লামা সাখাবি রহ.-এর রচিত, পৃষ্ঠা : ৪৬৮। আল্লামা নববি রহ. এটিকে হাসান বলেছেন। ফয়জুল কাদির, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৪৩২।

করতে হবে। আর্থিক জরিমানার মাধ্যমে টালবাহানাকারীর সমস্যা দূর করা যদি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হতো, তাহলে এটি ওয়াজিব হতো। আর প্রত্যেক বিচারকের জন্য অনুরূপ সিদ্ধান্ত দেওয়া ওয়াজিব হতো। আর মুফতির জন্য অনুরূপ ফতোয়া দেওয়া আবশ্যক হতো। কিন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এমন কোনো বিচারক বা মুফতি পাওয়া যায় না, যিনি অনুরূপ ফতোয়া দিয়েছেন। অথচ প্রত্যেক যুগ ও এলাকায় টালবাহানার বিচারের পরিমাণ অনেক বেশি ছিলো।

এরপর শরিয়ত স্বীকৃত ঋণদাতার যে ক্ষতি হয়েছে সেটি এই যে, পরিশোধের নির্ধারিত সময়ে ঋণী ঋণ পরিশোধ করেনি। এ সমস্যার সমাধান এই যে, তার প্রাপ্য অর্থ তাকে দিয়ে দেওয়া হবে। আর আসল ঋণের সঙ্গে কিছু বাড়িয়ে দেওয়া তার শরিয়তসম্মত প্রাপ্য নয়। কেননা, এমনটি করা স্পষ্ট সুদ। আর যখন এ ব্যাপারটি প্রমাণিত হলো যে, আসল ঋণের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ তার হক না, সুতরাং এই অতিরিক্ত অর্থ না পাওয়া তার ক্ষেত্রে কোনো শরয়ি সমস্যা নয়। সুতরাং তার প্রাপ্যের অধিক অর্থের মাধ্যমে তার এই সমস্যার সমাধান করা হবে না।

তবে এমন দাবি করা যে, ঋণদাতা যদি সময় মতো তার ঋণ পেয়ে যেতো, তাহলে সে টাকা ব্যবসায় খাটিয়ে অনেক লাভ করতে পারতো। কিন্তু সময়মতো পাওনা টাকা বুঝে না পাওয়ার কারণে সে অতিরিক্ত লাভ করা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এখন যে ব্যক্তির কারণে এই অতিরিক্ত লাভ করা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সে অর্থাৎ ঋণী এর ক্ষতিপূরণ দেবে। এ দাবিটি নষ্ট হয়ে যাওয়া সুযোগের বিষয়টির ওপর নির্ভরশীল। এবং অর্থের সম্ভাব্য লাভকে বাস্তব লাভের স্থলাভিষিক্ত করার ওপর নির্ভরশীল। সঙ্গে সঙ্গে এ কথার ওপর নিভরশীল যে, টাকা-পয়সা সত্তাগতভাবে প্রতিদিন কিছু না কিছু লাভ আনবে। এই দর্শনকে সুদিনীতি সমর্থন করলেও ইসলামি ফিকহে এ দর্শনের কোনো স্থান নেই। এ দর্শন যদি ইসলামে গ্রহণযোগ্য হতো, তাহলে ছিনতাইকারী ও চোরের ওপর এ দর্শন বাস্তবায়ন বেশি উপযুক্ত হতো। কিন্তু ইসলামি ইতিহাসে এমন কাউকে পাওয়া যাবে না, যিনি ছিনতাইকারী ও চোরের ওপর আর্থিক জরিমানা আরোপের পক্ষে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। কেননা, যার কাছ থেকে ছিনতাই করেছে তার লাভ অর্জনকে ছিনতাইয়ের সময়টাতে সে নষ্ট করেছে। ইসলামি শরিয়ত চুরির শাস্তি নির্ধারণ করেছে তার হাত কেটে দেওয়া। চুরিকৃত অর্থের প্রতি লক্ষ করে তার ওপর কোনো ধরনের আর্থিক জরিমানা আরোপ করেনি। এ মাসআলাটি এ কথার ওপর দলিল যে, ইসলামি শরিয়ত উল্লিখিত দর্শনটি সমর্থন করে না।

টালবাহানাকারী ঋণী ছিনতাইকারী বা চোরের চেয়ে মারাত্মক কোনো অপরাধ করেনি। তাই তার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ যেটি বলা যায় সেটি হলো, তার ওপর চুরি ও ছিনতাইয়ের হুকুম আরোপ করা হবে। আর ইসলামি শরিয়ত ছিনতাই বা চুরিকৃত অর্থের কারণে চোর বা ছিনতাইকারীর ওপর কোনো ধরনের আর্থিক জরিমানা আরোপ করেনি। আর এ কথায় কোনো সন্দেহ নেই যে, চোর ও ছিনতাইকারী চুরি বা ছিনতাইকৃত অর্থের মাধ্যমে তার মালিককে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। শুধু মালিক থেকে আসল সম্পদ নেওয়ার মাধ্যমে ক্ষতি করেনি। বরং তার সম্ভাব্য লাভ অর্জন থেকেও মালিককে বঞ্চিত করেছে। কিন্তু ইসলামি শরিয়ত এই সমস্যার সমাধান করেছে শুধু মালিকের কাছে তার আসল সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া ও অপরাধীর শরীরে বা তার মর্যাদায় শাস্তি দেওয়ার মাধ্যমে। সুতরাং এখান থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইসলামি শরিয়তে সম্ভাব্য লাভ থেকে বঞ্চিত হওয়া কোনো জরিমানাযোগ্য ক্ষতি নয়।

কতক আধুনিক অর্থনীতিবিদ এ ধরনের জরিমানা আরোপ বৈধ হওয়ার পক্ষে এভাবে দলিল দেন যে, অনেক ফকিহদের কাছে ছিনতাইয়ের কারণে সাধিত লাভের ক্ষতি জরিমানাযোগ্য। বিশেষ করে হানাফিদের কাছে সেসব জিনিসের ক্ষেত্রে জরিমানা আরোপ করা হবে, যেগুলোকে লাভ অর্জনের জন্য প্রস্তুত করা হয়। তবে তাদের এই দলিলটি ছিনতাইকৃত অর্থের ক্ষেত্রে সহিহ নয়। কেননা, যারা ছিনতাইকৃত জিনিসের লাভ বঞ্চিত হওয়াকে জরিমানাযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন, তাদের নিকটও দেহবিশিষ্ট কোনো কিছু ছিনতাইয়ের ক্ষেত্রে জরিমানা আরোপ হবে। কারেন্সির ক্ষেত্রে সেটি প্রযোজ্য নয়। এমনকি শাফিয়ি মাজহাবের সর্বাধিক বিশুদ্ধ অভিমত অনুযায়ী যদি কেউ ছিনতাইকৃত অর্থ দিয়ে ব্যবসা করে এবং সে ব্যবসায় লাভ করে, তাহলে যার অর্থ ছিনতাই করা হয়েছে তাকে লাভের ওই অর্থ ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে না।[৭৬]

এ মাসআলা হলো সেই ক্ষেত্রে যেখানে বাস্তবে লাভ হয়েছে। সুতরাং শুধু সম্ভাব্য লাভের ক্ষেত্রে আপনার কী ধারণা? এ কারণেই মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম টালবাহানাকারী ঋণী সম্পর্কে বলেছেন—

لي الواجد يحل عقوبته وعرضه.

‘সম্পদশালীর পক্ষ থেকে টালবাহানা করা তাকে শাস্তি দেওয়া ও মর্যাদাকে

[৭৬] আল-মুহাজ্জাব, আল্লামা শিরাজি রহ.-এর রচিত, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৭০।

হালাল করে দেয়।' তিনি এ কথা বলেননি যে— يحل ماله 'তার সম্পদ হালাল হয়ে যাবে।' আর এমন কোনো ফকিহ্ বা মুহাদ্দিস পাওয়া যাবে না যিনি এই হাদিসে বর্ণিত শাস্তির ব্যাখ্যা করেছেন আর্থিক জরিমানার মাধ্যমে। যদিও তাদের মধ্যে আর্থিক জরিমানা জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। যদিও কোনো ফকিহ্ হাদিসের শাস্তির ব্যাখ্যা করে থাকেন আর্থিক জরিমানা আরোপের মাধ্যমে তারপরও শাস্তির হুকুম দেবে শুধু বিচারক, ঋণদাতা নয়। সুতরাং হাদিসের এই শাস্তিটি কীভাবে সে শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, যেখানে কোনো বিচারকের সিদ্ধান্ত ছাড়া ঋণদাতা নিজেই জরিমানা আরোপ করে? বিচারকের বিচার ছাড়া সাধারণ মানুষের হাতে যদি শাস্তি আরোপের ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাহলে সেটি একটি বিশৃঙ্খলার দিকে নিয়ে যাবে। যেটিকে শরিয়ত বা বিবেক কোনোটিই সমর্থন করে না।

এগুলো হলো জরিমানা আরোপের দর্শনের সঙ্গে যুক্তির নিরিখে আমি যেসব সমস্যা অনুভব করেছি তার কিছু আলোচনা।

আর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রের আলোচনা হলো, ইতোপূর্বে জরিমানা ও সুদের মধ্যে আমরা যে চারটি পার্থক্য বর্ণনা করেছি, বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সেগুলো শুধু দার্শনিক পার্থক্য। বিরল কিছু ক্ষেত্র ছাড়া সেগুলোকে বাস্তবায়ন করা যায় না। আর সেগুলো এত বিরল যে, তার ওপর কোনো বিধিবিধানের ভিত রচনা করা যায় না।

প্রথম পার্থক্য : অসচ্ছলতার কারণে ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করলে সেখানে জরিমানা আরোপ করা হয় না। এ ক্ষেত্রে সচ্ছল ও অসচ্ছল হওয়া এমন একটি বিষয়, ব্যাংকের পক্ষ থেকে প্রতিটি ক্ষেত্রে যেটি নির্ধারণ করা অসম্ভব। কারণ, প্রত্যেক ঋণী দাবি করবে যে, সে অসচ্ছল। আর আদালতের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া ব্যাংকের কাছে এমন কোনো প্রমাণ নেই, যার মাধ্যমে ঋণীকে তার দাবির বিপক্ষে সচ্ছল হওয়ার ব্যাপারে আশ্বস্ত করতে পারবে। এ কারণে বর্তমানের ইসলামি ব্যাংকগুলো যে দর্শনকে গ্রহণ করছে এবং যার ওপর নির্ভর করে আর্থিক জরিমানা আরোপ করা হয়, সেখানে এ কথা লেখা আছে যে, আইন অনুযায়ী ঋণীকে দেওলিয়া ঘোষণা পর্যন্ত তাকে সচ্ছল বলে মনে করা হবে। আর এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, আইন অনুযায়ী দেওলিয়া ঘোষণা হলো চূড়ান্ত অবস্থা। যার সংখ্যা একেবারেই বিরল।

এ বিষয়টি নিশ্চিত যে, এ ক্ষেত্রে এমন অনেক মানুষ রয়েছে যাদেরকে দেওলিয়া ঘোষণা করা হয়নি ঠিক; কিন্তু সর্বদিক থেকেই তারা দেওলিয়া। সুতরাং এমন ক্ষেত্রে কীভাবে এ কথা বলা যায় যে, ঋণীর অসচ্ছল অবস্থায় ইসলামি ব্যাংকসমূহ তার ওপর জরিমানা আরোপ করে না?

সেইসঙ্গে এ কথাটিও স্পষ্ট যে, কেউ কাউকে সুদি ঋণ দেওয়ার পর ঋণী যদি দেওলিয়া হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে ঋণদাতা যে পরিমাণ তার কাছে উপস্থিত পাবে শুধু সে পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করতে পারবে। ফলে এ ক্ষেত্রে সুদ নেওয়া ও জরিমানা আরোপের মধ্যে গ্রহণযোগ্য কোনো পার্থক্য থাকলো না।

দ্বিতীয় পার্থক্য : ঋণ পরিশোধের মেয়াদ শেষ হওয়ার একমাস পর থেকে জরিমানার হিসেব শুরু হওয়া। ব্যাংকসমূহে এ পদ্ধতির ওপর আমল হচ্ছে বলে মেনে নিলে এটি একটি সহিহ্ পার্থক্য। তবে সেটি শুধু একমাসের পার্থক্য ছাড়া আর কিছু নয়।

তৃতীয় ও চতুর্থ পার্থক্য : টালবাহানাকালীন লাভ অর্জিত হওয়ার ওপর নির্ভরশীল হয় জরিমানা আরোপ আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি। আর লাভের পরিমাণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে জরিমানার পরিমাণটি অনির্দিষ্ট থাকে। যুক্তির দিক থেকে এই পার্থক্যটি সহিহ্। কিন্তু আমরা যখন বাস্তবায়নের দৃষ্টিকোণ থেকে এই পার্থক্যটির প্রতি দৃষ্টি দিই তখন দেখতে পাই যে, ইসলামি ব্যাংকের অধিকাংশ লেনদেন মুরাবাহা মুআজ্জালার পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। আর এসব লেনদেনে অর্জিত লাভ এবং তার পরিমাণ উভয় পক্ষের জানা থাকে। ফলে বাস্তবক্ষেত্রে জরিমানার পরিমাণটি উভয় পক্ষের কাছে নির্দিষ্ট থাকে।

তাছাড়া অধিকাংশ ইসলামি ব্যাংকসমূহ তাদের লভ্যাংশের হিসাব করে ছয়মাস পর। ফলে প্রতি সেমিস্টার শেষ হওয়ার আগে লভ্যাংশের পরিমাণ নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। সুতরাং এ সময়ের মধ্যে যদি কোনো টালবাহানা হয়ে থাকে, তাহলে এই সেমিস্টারের মধ্যবর্তী সময়ের লভ্যাংশের পরিমাণটি কীভাবে নিশ্চিত জানা যাবে? আর যেসব অ্যাকাউন্টধারীরা সেমিস্টার শেষ হওয়ার আগে ব্যাংক থেকে তাদের টাকা তুলে নেয়, তাদেরকে চূড়ান্ত হিসাবের সময় সমন্বয় করার ভিত্তিতে একটি অংশ দেওয়া হয়। আর বাৎসরিক সেমিস্টার শেষে এই অর্থকে চূড়ান্ত হিসাবের সঙ্গে সমন্বয় করা হয়। সুতরাং সেমিস্টারের মধ্যে টালবাহানাকারীর

জরিমানা কি সেমিস্টার শেষে চূড়ান্ত সমন্বয়ের অধীনে হবে? স্পষ্ট উত্তর হবে, না। সুতরাং তাহলে কীভাবে একথা বলা হবে যে, টালবাহানাকালীন ব্যাংকের প্রকৃত লভ্যাংশ অনুযায়ী জরিমানা আরোপ করা হবে?

এ ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় রয়েছে, যেটি আলোচ্য ক্ষেত্রে চিন্তার উপযোগী বিষয় সেটি হলো, সবসময় মুরাবাহা ও ইজারা লেনদেনের তুলনায় সেভিংস অ্যাকাউন্টের লাভের পরিমাণ কম হয়। অতএব, কোনো ঋণী যদি খেয়ানতের ইচ্ছে করে, তাহলে তার পক্ষে এমনটি করার সুযোগ রয়েছে যে, ব্যাংকের সেভিংস অ্যাকাউন্টে যে পরিমাণ লাভ হয়, তার চেয়ে বেশি লাভজনক কোনো প্রকল্পে তার ঋণ নেওয়া অর্থ বিনিয়োগ করবে। তারপর সে ব্যক্তি আর্থিক জরিমানার সামান্য অর্থ ব্যাংককে পরিশোধ করে অবশিষ্ট লভ্যাংশ নিজের কছে রেখে দেবে। এভাবে সে যতদিন ইচ্ছে করবে ততদিন ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করতে থাকবে। আর আর্থিক জরিমানাও পরিশোধ করতে থাকবে। ফলে বারবার সে সমস্যাই প্রকট হয়ে দেখা দেবে, যার থেকে বাঁচার জন্য তারা আর্থিক জরিমানার আশ্রয় নিয়েছে। সুতরাং টালবাহানাকারীর ওপর আর্থিক জরিমানার প্রস্তাব এমন একটি প্রস্তাব, যেটিকে শরয়ি ও যুক্তির নিরিখে আমি টালবাহানার সমস্যার প্রতিকার বলে মনে করি না। অতএব, এখন এ সমস্যার সমাধান কী?

এ সমস্যার প্রকৃত সমাধান হলো সেটি, যেটিকে এ আলোচনার শুরুতে আমরা উল্লেখ করেছি। তবে সেটি তখনই উপকারে আসবে, যখন সব ব্যাংক ইসলামি বিধান অনুযায়ী চলবে। কিন্তু বর্তমান অবস্থা হলো, বিশ্বের স্থিতিশীল সুদি ব্যাংকের তুলনায় সামান্য কিছু ইসলামি ব্যাংক রয়েছে, ফলে ইসলামি ব্যাংকের জন্য অন্য একটি সাময়িক সমাধানের দিকে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। আর সেটি হলো, মুরাবাহা বা ইজারা চুক্তির সময় ঋণী এ কথার ওপর স্বাক্ষর করবে যে, তার ওপর পরিশোধযোগ্য অর্থ আদায়ে যদি টালবাহানা করে, তাহলে ঋণের নির্দিষ্ট পার্সেন্ট পরিমাণ অর্থ কল্যাণখাতে দিতে বাধ্য থাকবে। আর তার পক্ষ থেকে উকিল হিসেবে কল্যাণখাতে ব্যয় করার জন্য সে ব্যাংকের কাছে ওই অর্থ জমা দেবে। এখন ঋণী যদি ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করে, তাহলে তাকে ওই পরিমাণ অর্থ ব্যাংকের কাছে জমা দিতে হবে। তবে এই অর্থটি ব্যাংকের মালিকানাধীন অর্থ হবে না এবং তার আমদানি ও লাভের অংশ হবে না। বরং কল্যাণকর কাজে ব্যয় করার জন্য ব্যাংকের কাছে সেটি আমানতস্বরূপ থাকবে।

এই প্রস্তাবটি সময়মতো ঋণ পরিশোধে ঋণীর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে যথেষ্ট

উপকার দেবে। আর আশা করা যায়, জরিমানা আরোপের প্রস্তাব অপেক্ষা এই প্রস্তাবটি টালবাহানার পথ রুদ্ধ করতে বেশি কাজে আসবে। কেননা, কল্যাণখাতে দেওয়া অর্থের পরিমাণ টালবাহানাকালীন ব্যাংকের সেভিংস অ্যাকাউন্টে অর্জিত লাভের সমপরিমাণ হওয়া আবশ্যক নয়; বরং এই অর্থের পরিমাণ সেভিংস অ্যাকাউন্ট অপেক্ষা বেশি হতে পারে। আবার ঋণের নির্দিষ্ট পরিমাণের সঙ্গে শতকরা হারে তার পরিমাণ নির্ধারণেও কোনো সমস্যা নেই। যেটি নির্দিষ্ট সময়ে ঋণীর ঋণ পরিশোধে যত্নশীল করবে। একইসঙ্গে এই কল্যাণখাতে প্রদত্ত অর্থ সুদ হচ্ছে না। কারণ, সেটি ব্যাংকের মালিকানায় অনুপ্রবেশ করছে না। বরং বিভিন্ন কল্যাণখাতে সেটি ব্যয় করা হয়। আর এরূপ দানের জন্য ব্যাংক তার মালিকানাহীন একটি তহবিল খুলতে পারে। বরং সে তহবিলটি নির্দিষ্ট কিছু কল্যাণখাতের জন্য ওয়াকফ করা হবে এবং সেটি তত্ত্বাবধান করবে ব্যাংকের পরিচালকবৃন্দ। আর এর উদ্দেশ্য হবে মুখাপেক্ষী মানুষদেরকে সেখান থেকে সুদহীন ঋণ দেওয়া।

কল্যাণখাতে দেওয়ার জন্য এ ধরনের ওয়াদা করার শরয়ি হুকুমের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ ফকিহের কাছে এ ধরনের ওয়াদা করা জায়েজ আছে। মালিকি মাজহাবের কিছু আলেমের কাছে বিচারিক দিক থেকেও এ ধরনের ওয়াদা পালন করা ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে মালিকি মাজহাবের মূলনীতি হলো, যদি কোনো কল্যাণখাতের জন্য ওয়াদা করা হয়, তাহলে তাদের মাজহাবের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার ওপর ওই ওয়াদা আদায় করা ওয়াজিব। আর ওয়াদাটি যদি কসমের পদ্ধতিতে হয়। অর্থাৎ সেটি এভাবে যে, সেটি এমন কোনো বিষয়ের সঙ্গে শর্তযুক্ত হবে, ওয়াদাকারী সেটি থেকে দূরে থাকতে চাচ্ছে, বিচারিক দিক থেকে এ ধরনের ওয়াদা পালন আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। অনেকের অভিমত এটি যে, বিচারিক দিক থেকে এ ধরনের ওয়াদা আবশ্যক হওয়ার রায় দেওয়া যাবে না। আর অন্যান্যরা এ অভিমতের বিপরীত অবস্থানে থেকে এ ধরনের ওয়াদাকে বিচারিক দিক থেকে আবশ্যক বলেছেন। আল্লামা হাত্তাব রহ. তার 'তাহরিরুল কালাম ফি মাসায়িলিল ইলতেজাম' কিতাবে এ মাসআলার ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন—

أما إذا التزم المدعى عليه للمدعي أنه إن لم يوفه حقه في وقت كذا فله عليه كذا وكذا، فهذا لا يختلف في بطلانه، لأنه صريح الربا، وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره، وسواء كان الشيء معينا أو منفعة..وأما إذا التزم أنه إن لم يوفه حقه في وقت كذا،

فعليه كذا وكذا لفلان، أو صدقة للمساكين، فهذا هو محل الخلاف المعقود له هذا الباب، فالمشهور أنه لا يقضي به كما تقدم، وقال ابن دينار: يقضي به.

'বিবাদী যদি বাদীর কাছে এই ওয়াদা করে যে, সে যদি সময়মতো ঋণ পরিশোধ না করে, তাহলে বাদীকে সে অমুক জিনিস দেবে। এ ধরনের ওয়াদা বাতিল হওয়ার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। কেননা, সেটি স্পষ্ট সুদ। চাই ওয়াদাকৃত জিনিসটি ঋণের সমজাতীয় হোক বা অন্যজাতীয় হোক। অথবা সেটি নির্দিষ্ট কোনো বস্তু হোক বা কোনো উপকার হোক। তবে সে যদি এমন ওয়াদা করে যে, নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধ না করলে তার ওপর অমুককে এই জিনিস দেওয়া ওয়াজিব হবে। অথবা মিসকিনদের জন্য সদাকা করা ওয়াজিব হবে, তাহলে এটি হলো সেই মতানৈক্যের জায়গা, যার জন্য এই পরিচ্ছেদ রচনা করা হয়েছে। তবে প্রসিদ্ধ অভিমত হলো, এ ধরনের ওয়াদাকে বিচারিক দিক থেকে আবশ্যক হওয়ার সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে না। যেমনটি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। তবে আল্লামা ইবনু দিনার রহ. বলেন, বিচারিক দিক থেকে এ ধরনের ওয়াদাকে আবশ্যক করা হবে।'[৭৭]

এর আগে এক জায়গায় আল্লামা হাত্তাব রহ. বলেন—

وحكاية الباجي الاتفاق على عدم اللزوم فيما إذا كان على وجه اليمين غير مسلمة لوجود الخلاف في ذلك كما تقدم، وكما سيأتي.

'কসমের পদ্ধতিতে যে ওয়াদা করা হয় সেটি আবশ্যক না হওয়ার বিষয়ে আল্লামা বাজি রহ. যে ঐকমত্যের কথা বলেছেন, সেটি স্বীকৃত নয়। কেননা, বিচারিক দিক থেকে আবশ্যক হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। যেমনটি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি এবং সামনেও তার আলোচনা আসছে।'[৭৮]

---

[৭৭] তাহরিরুল কালাম ফি মাসায়িলিল ইলতেজাম, আল্লামা হাত্তাব রহ.-এর রচিত, পৃষ্ঠা : ১৭৬।
[৭৮] তাহরিরুল কালাম ফি মাসায়িলিল ইলতেজাম, আল্লামা হাত্তাব রহ.-এর রচিত, পৃষ্ঠা : ১৬৯।

আল্লামা হাত্তাব রহ. যদিও বিচারিক দিক থেকে আবশ্যক না হওয়ার অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু ওই পরিচ্ছেদের শেষে তিনি বলেছেন—

> إذا قلنا إن الالتزام المعلق على فعل الملتزم الذي على وجه اليمين لا يقضي به على المشهور، فاعلم أن هذا ما لم يحكم بصحة الالتزام المذكور حاكم. وأما إذا حكم حاكم بصحته أو بلزومه، فقد تعين الحكم به، لأن الحاكم إذا حكم بقول لزم العمل به وارتفع الخلاف
>
> 'আমরা যখন এ কথা বলি যে, কসমের মাধ্যমে বিবাদী যখন নিজের ওপর কোনো কাজ আবশ্যক করে নেয়, তখন প্রসিদ্ধ অভিমত অনুযায়ী বিচারিক দিক থেকে সেটি পালন করা তার ওপর ওয়াজিব নয়। মনে রেখো! এ হুকুম সে সময়ের জন্য, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো বিচারক কসমটি সহিহ্ হওয়ার রায় না দেবে। আর কোনো বিচারক যদি সেটি সহিহ্ ও আবশ্যক হওয়ার রায় দিয়ে দেয়, তাহলে সে রায় মেনে নেওয়া আবশ্যক। কেননা, কোনো মতানৈক্যময় মাসআলায় বিচারক যদি কোনো রায় দিয়ে দেয়, তাহলে সেটি মেনে নেওয়া ওয়াজিব হয়ে যায় এবং তার মতানৈক্যটি রহিত হয়ে যায়।'[৭৯]

মোটকথা, এটা হলো মালিকি মাজহাবের কিছু ফকিহের অভিমত। আর হানাফিদের মূলনীতি অনুযায়ী ওয়াদাপূরণ করা আবশ্যক নয়। তবে হানাফি মাজহাবের ফকিহগণ স্পষ্টভাষায় এ কথা বলেছেন যে, কিছু ওয়াদা এমন রয়েছে, যা মানবিক প্রয়োজনে আবশ্যক হয়ে যায়। শেষোক্ত নীতির আলোকে আমার বক্তব্য হলো, টালবাহানার পথ রুদ্ধ করতে এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের সীমালঙ্ঘন থেকে মানুষের অধিকার রক্ষার স্বার্থে প্রস্তাবিত এই দানকে বিচারিক দিক থেকে ওয়াজিব স্বীকৃতি দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। মহান আল্লাহ্ সর্বাধিক অবগত।

সপ্তম আলোচনা : ঋণীর মৃত্যুর কারণে ঋণ নগদে পরিণত হওয়া

এ আলোচনায় আমরা সর্বশেষ যে বিষয়টি প্রমাণ করতে চাচ্ছি সেটি হলো, ঋণীর মৃত্যুর কারণে তার দায় নষ্ট হওয়া। এ ক্ষেত্রে তার মৃত্যুর পর ঋণটি কি আগের মতো বাকি থাকবে, না কি নগদে পরিণত হবে? তাই ঋণদাতা ঋণীর

---

[৭৯] তাহরিরুল কালাম ফি মাসায়িলিল ইলতেজাম, আল্লামা হাত্তাব রহ.-এর রচিত, পৃষ্ঠা : ১৮৫।

ওয়ারিসদেরকে তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে তাৎক্ষণিক ঋণ পরিশোধ করতে তাগাদা দেওয়ার অধিকার সাব্যস্ত হবে কি না? এ মাসআলার ব্যাপারে ফকিহদের অভিমতের ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। হানাফি, শাফিয়ি ও মালিকি মাজহাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহগণ এ অভিমত পোষণ করেছেন যে, ঋণীর মৃত্যুর কারণে ঋণ নগদে পরিণত হবে। ইমাম আহমাদ রহ.-এর অনুরূপ একটি অভিমত রয়েছে। তবে হাম্বালি মাজহাবের ফকিহদের কাছে গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো, ঋণীর ওয়ারিসগণ যদি ঋণকে সত্তায়ন করে এবং ঋণ পরিশোধে আশ্বাস প্রদান করে, তাহলে ঋণীর মৃত্যুর কারণে সেটি নগদে পরিণত হবে না। বরং আগের মতোই বাকি থাকবে। আল্লামা ইবনু কুদামা রহ. বলেন—

فأما إن مات وعليه ديون مؤجلة، فهل تحل بالموت؟ فيه روايتان: إحداهما، لا تحل إذا وثق الورثة، وهو قول ابن سيرين وعبيد الله بن الحسن وإسحاق وأبي عبيد . وقال طاوس وأبو بكر بن محمد والزهري وسعيد بن إبراهيم : الدين إلى أجله، وحكي ذلك عن الحسن .

والرواية الأخري: أنه يحل بالموت، وبه قال الشعبي والنخعي وسوار ومالك والثوري والشافعي ، وأصحاب الرأي، لأنه لا يخلو: إما أن يبقي في ذمة الميت أو الورثة، أو يتعلق بالمال. ولا يجوز بقاؤه في ذمة الميت لخرابها وتعذر مطالبته بها، ولا ذمة الورثة، لأنهم لم يلتزموها، ولا رضي صاحب الدين بذممهم، وهي مختلفة متباينة. ولا يجوز تعلقه على الأعيان وتأجيله، لأنه ضرر بالميت وصاحب الدين، ولا نفع للورثة فيه. أما الميت، فلأن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (الميت مرتهن بدينه حتي يقضى عنه) وأما صاحبه فيتأخر حقه، وقد تتلف العين، فيسقط حقه. وأما الورثة، فإنهم لا ينتفعون بالأعيان ولا يتصرفون فيها. وإن حصلت لهم منفعة فلا يسقط حظ الميت وصاحب الدين لمنفعة لهم.

'কারও ওপর মেয়াদি ঋণ থাকা অবস্থায় যদি সে মারা যায়, তাহলে তার ঋণটি কি নগদে পরিণত হবে? এ ব্যাপারে দু-ধরনের বর্ণনা রয়েছে। একটি হলো, ওয়ারিসগণ ওই ঋণকে সত্যায়ন করলে সেটি নগদে পরিণত হবে না। এটি হলো আল্লামা ইবনু সিরিন, উবাইদুল্লাহ ইবনু হাসান, ইসহাক ও আবু উবায়েদ রহ.-এর অভিমত। আর আল্লামা তউস, আবু বকর ইবনু মুহাম্মাদ, জুহরি ও সাইদ ইবনু ইবরাহিম রহ.

বলেন, ঋণটি তার মেয়াদ পর্যন্ত মেয়াদি থাকবে। ইমাম হাসান রহ. থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

দ্বিতীয় বর্ণনাটি হলো, ঋণীর মৃত্যুর কারণে ঋণ নগদে পরিণত হবে। ইমাম শাবি, নাখয়ি, সাওয়ার, মালিক, সাওরি, শাফিয়ি রহ. ও আসহাবে রাই এমন অভিমত দিয়েছেন। কেননা, এটি দুই অবস্থার বাইরে নয়। হয়তো মৃতব্যক্তি বা তার ওয়ারিসদের দায়িত্বে ঋণটি বাকি থাকবে অথবা তার পরিত্যক্ত সম্পদের সঙ্গে সেটি সম্পৃক্ত হবে। আর মৃতব্যক্তির দায়িত্বে ঋণ রাখা সহিহ নয়। কারণ, সেটি (দায়িত্ব) নষ্ট হয়ে গেছে এবং তার কাছে ঋণের দাবি করা অসম্ভব। আর ওয়ারিসদের দায়িত্বেও আরোপ করা সম্ভব নয়। কেননা, তারা এই ঋণ নেয়নি। আর ঋণীও তাদের দায়িত্বে ঋণ আরোপের কথা বলেনি। কেননা, তাদের উভয়ের দায়িত্বের মধ্যে বৈপরিত্য রয়েছে। আবার মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের সঙ্গে সেটিকে সম্পৃক্ত করে বাকি রেখে দেওয়া জায়েজ নেই। কারণ, এ ক্ষেত্রে মৃতব্যক্তি ও ঋণী উভয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আর সেখানে ওয়ারিসদেরও কোনো উপকার নেই। মৃতব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়ে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

الميت مرتهن بدينه حتي يقضي عنه

'মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে তার ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত সে ওই ঋণের ব্যাপারে দায়বদ্ধ থাকে।'

আর ঋণদাতার ক্ষতি হলো, তার হক আরও বিলম্বিত হবে। আবার কখনো কখনো পরিত্যক্ত সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সে নিজের হক থেকে বঞ্চিত হবে। আর ওয়ারিসগণ উপকৃত না হওয়ার বিষয়টি হলো, তারা পরিত্যক্ত কোনো জিনিস থেকে উপকৃত হতে বা সেগুলো ব্যবহার করতে পারছে না। আর তারা যদি সেখান থেকে কিছু অর্জন করে থাকে, তারপরও মৃতব্যক্তি ও ঋণদাতার অংশ তাদের সে অর্জিত অংশ থেকে বাদ পড়বে না।'[৮০]

এরপর আল্লামা ইবনু কুদামা রহ. তাদের অভিমতের প্রাধান্যের বর্ণনা করেছেন, সেইসঙ্গে তাদের দলিলসমূহও উল্লেখ করেছেন। যাদের অভিমত অনুযায়ী ঋণ

[৮০] আল-মুগনি, আল্লামা ইবনু কুদামা রহ.-এর রচিত। অধ্যায়: মুফলিস, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৮৬। শরহে কাবির, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫০২। খুলাসাতুল ফাতাওয়া, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৯৫।

মেয়াদি হিসেবেই থেকে যাবে। তবে শর্ত হলো, ওয়ারিসদের পক্ষ থেকে কাউকে জিম্মাদার হওয়ার ব্যাপারে কিংবা ঋণদাতার কাছে কোনো বন্ধক রেখে নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে।

এ ক্ষেত্রে হানাফিদের অভিমত হলো, তারা অধিকাংশ ফকিহদের সঙ্গে একমত, যদিও ঋণীর মৃত্যুর কারণে ঋণ নগদে পরিণত হওয়ার অভিমত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু হানাফি মাজহাবের পরবর্তী আলেমরা এ দিকেও লক্ষ্য করেছেন যে, মুরাবাহা মুআজ্জালাতে মেয়াদের বিনিময়ে মূল্যের একটি অংশ থাকে। ইতোপূর্বে যার আলোচনা করেছি। সুতরাং আমরা যদি মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে পূর্ণ মূল্য পরিশোধের সিদ্ধান্ত দিই, তাহলে অবশিষ্ট মেয়াদের বিনিময়ে যে মূল্য ছিলো সেটি কোনো ধরনের বিনিময়হীন হয়ে যাচ্ছে। আর এ ক্ষেত্রে ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কারণ ক্রেতা এ মূল্যের ওপর এ শর্তে রাজি হয়েছে যে, সে তাৎক্ষণিক আদায় করবে না। চুক্তিতে নির্ধারিত মূল্যটি মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর সে এ মূল্য পরিশোধ করবে। এ কারণে তারা এই ফতোয়া দিয়েছেন যে, উল্লিখিত পরিস্থিতিতে ক্রেতা মুরাবাহা চুক্তির যে পরিমাণ মেয়াদ অতীত হয়েছে, শুধু সে পরিমাণ মূল্য পরিশোধ করবে। ইতোপূর্বে 'আদ্দুররুল মুখতার' কিতাব থেকে আমরা যে আলোচনা করেছি দ্বিতীয়বার সেটিকে এখানে উল্লেখ করছি—

> قضي المديون الدين المؤجل قبل الحلول أو مات فحل بموته، فأخذ من تركته لا يأخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضي من الأيام، وهو جواب المتأخرين، وبه أفتي المرحوم أبو السعود أفندي مفتي الروم، وعلله بالرفق للجانبين.
>
> 'মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ঋণী ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছে কিংবা তার মৃত্যুর কারণে সেটি নগদে পরিণত হয়ে গেছে, তাহলে এমতাবস্থায় তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে ঋণ উসুল করা হবে। এ ক্ষেত্রে তাদের মধ্যকার মুরাবাহা চুক্তি থেকে যে পরিমাণ মেয়াদ অতীত হয়েছে, শুধু সে পরিমাণ মেয়াদের অর্থ উসুল করবে। এটিই মুতাআখখিরিনদের উত্তর। আল্লামা মরহুম আবুস সাউদ আফিন্দি রহ. অনুরূপ ফতোয়া দিয়েছেন।'

আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ. এ বক্তব্যের ব্যাখ্যায় বলেন—

صورته: اشتري شيئا بعشرة نقدا، وباعه لآخر بعشرين إلى أجل هو عشرة أشهر، فإذا قضاه بعد تمام خمسة أو مات بعدها يأخذ خمسة، ويترك خمسة

‘এ মাসআলার রূপায়ন হলো, কেউ নগদ দশ টাকায় কিছু ক্রয় করে দশ মাস মেয়াদে অন্যের কাছে বিশ টাকায় সেটি বিক্রি করে দিলো। এরপর ক্রেতা যদি পাঁচমাস পর ঋণ পরিশোধ করে দেয় বা পাঁচ মাস পর সে মারা যাওয়ার কারণে ঋণটি নগদে পরিণত হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে বিক্রেতা লাভের পাঁচ টাকা নেবে, আর অবশিষ্ট পাঁচ টাকা ছেড়ে দেবে।’[৮১]

সারকথা, এ মাসআলায় আমার অভিমত হলো, নির্ভরযোগ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহগণ যদিও ঋণীর মৃত্যুর কারণে ঋণ নগদ হওয়ার অভিমত পোষণ করেছেন। কিন্তু কিস্তি ও মুরাবাহা মুআজ্জালার চুক্তিতে সময়ের বিনিময়ে মূল্যের একটি অংশ থাকে। ফলে আমরা যদি সম্পূর্ণ ঋণ নগদে পরিণত হওয়ার অভিমত গ্রহণ করি, তাহলে এ ক্ষেত্রে ঋণীর ওয়ারিসগণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সুতরাং এখানে দুটি অভিমতের কোনো একটি গ্রহণ করা উচিত। হয়তো (পরবর্তী হানাফি ফকিহগণের) মুতাআখখিরিন আহনাফের অভিমত গ্রহণ করে চুক্তিতে উল্লিখিত সময়ের বিনিময় পরিমাণ মূল্য কমিয়ে নিতে হবে। ফলে যে পরিমাণ মেয়াদ অতীত হয়েছে, শুধু তার মূল্য নেবে। অথবা হাম্বালি মাজহাবের ফকিহদের অভিমত গ্রহণ করবে যে, ঋণ তার আগের অবস্থার মতো মেয়াদি থাকবে। তবে তার জন্য শর্ত হলো, ঋণীর ওয়ারিসকর্তৃক সেটিকে নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে সত্যায়ন করতে হবে। আর মেয়াদের কারণে মূল্যের মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থা থেকে দূরে থাকার কারণে সম্ভবত দ্বিতীয় পদ্ধতিটি উত্তম। কারণ মূল্য দোদুল্যমান থাকার কারণে সেটি সুদি লেনদেনের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায়। মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

—মুহাম্মাদ তকি উসমানি

শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের শরয়ি বিধান

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

'শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের শরয়ি বিধান' এটি কোনো আরবি মাকালা নয়। বরং এটি হলো মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি দা. বা.-এর একটি বক্তব্য। যেটি বাইতুল মুকাররাম জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের একটি সেমিনারে আলোচনা করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে সেটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি দা. বা. সেটিকে দ্বিতীয়বার দেখেছেন। ব্যাপক উপকারিতার লক্ষ্যে এটিকে মাকালার অংশ করে প্রকাশ করা হলো।

—আবদুল্লাহ মায়মান

শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের শরয়ি বিধান

বর্তমান সময়ে ব্যবসার মধ্যে একটি নতুন বিষয়ের সংযোজন ঘটেছে। আধুনিক পরিভাষায় যাকে শেয়ার বলা হয়। শেয়ারের লেনদেন যেহেতু শেষ শতাব্দীর দিকে অস্তিত্বে এসেছে, ফলে পূর্ববর্তী ফকিহদের কিতাবে তার বিধান এবং বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায় না। এ কারণে বর্তমানে শেয়ার ও স্টক এক্সচেঞ্জে চলমান কিছু নতুন লেনদেন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

শেয়ারের সূচনা

আগেকার যুগে অংশীদারভিত্তিক যেসব কারবার চলতো, সেগুলো সামান্য কিছু লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো। বর্তমানে যেটিকে পার্টনারশিপ বলা হয়। তবে গত দুই তিন শতাব্দীতে নতুন এক ধরনের অংশীদারত্ব সামনে এসেছে। যেটিকে জয়েন্ট স্টক কোম্পানি বলা হয়। এটির কারণে লেনদেনে এক নতুন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এবং জয়েন্ট স্টক কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের নতুন মাসআলা সামনে এসেছে। এর ওপর নির্ভর করে সারাবিশ্বের স্টক মার্কেটগুলো কাজ করছে। আর এসব স্টক মার্কেটে কোটি কোটি বরং বিলিয়ন বিলিয়ন কারেন্সির লেনদেন হচ্ছে। আর তার বিভিন্ন পদ্ধতি সৃষ্টি হচ্ছে।

শেয়ারের বাস্তবতা কী?

আমাদেরকে প্রথমে বুঝতে হবে যে, শেয়ার কী জিনিস? কোম্পানির শেয়ারকে উর্দুতে 'হিসসা' (বাংলায় অংশ), আরবিতে 'সাহম' বলে। প্রকৃতপক্ষে এই শেয়ারগুলো কোম্পানির সম্পদের মধ্যে শেয়ার হোল্ডারদের মালিকানার আনুপাতিক অংশ বিশেষের প্রতিনিধিত্ব করে। উদাহরণস্বরূপ, আমি যদি কোনো কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করি, তাহলে কাগুজেরূপে যে শেয়ার সার্টিফিকেট পাবো, সেটি ওই কোম্পানিতে আমার মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করবে। সুতরাং কোম্পানির যেসব জিনিসপত্র এবং মালিকানাধীন সম্পদ রয়েছে, শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে তার সবকিছুর মধ্যে আনুপাতিক হারে অংশবিশেষের মালিক হয়ে গেছি।

প্রাথমিক যুগে সংক্ষিপ্ত পরিসরে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালিত হতো। দু-চারজন মানুষ মিলে অর্থায়ন করে অংশীদারত্বের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করতো। কিন্তু বড়ো ধরনের ব্যবসা বা শিল্পের জন্য যে বড়ো অংকের অর্থের প্রয়োজন পড়ে, অনেক সময় সামান্য কয়েকজন মিলে সে পরিমাণ অর্থায়ন করতে সক্ষম হতো না। এ কারণে কোম্পানি সৃষ্টির প্রয়োজন পড়ে। আর কোম্পানি সৃষ্টির লক্ষ্যে সাধারণত যে কার্যক্রম সবার কাছে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ সেগুলো হলো, কোনো কোম্পানি অস্তিত্বে আসার পর সর্বপ্রথম তার প্রোসপেক্টাস (prospectus, যার মধ্যে কোম্পানির যাবতীয় কার্যক্রমের মৌলিক রূপরেখার উল্লেখ থাকে) প্রকাশ করে। সেইসঙ্গে কোম্পানির শেয়ার ইস্যু করে। শেয়ার ইস্যু করার উদ্দেশ্য হলো, কোম্পানি সাধারণ মানুষদেরকে কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার হওয়ার আহ্বান করছে।

কোনো কোম্পানি প্রথমে যখন অস্তিত্বে আসে, তখন বাজারে তাদের শেয়ার ছাড়ে এবং সাধারণ মানুষদেরকে আহ্বান জানায় যে, এই শেয়ারগুলো ক্রয় করো। এখন যারা ওই শেয়ার ক্রয় করছে, বাস্তবে তারা কোম্পানির কারবারের মধ্যে অংশীদার হচ্ছে এবং কোম্পানির সঙ্গে অংশীদারত্বের লেনদেন করছে। সাধারণ সমাজে যদিও এ কথা বলা হয় যে, সে শেয়ার ক্রয় করেছে। কিন্তু শরয়ি দৃষ্টিকোণে সেটি ক্রয়-বিক্রয়ের লেনদেন নয়। কারণ কেউ যখন অর্থ দিয়ে শেয়ার ক্রয় করে, তখন তার বিনিময়ে কোনো পণ্য পায় না। কেননা, এখনো পর্যন্ত কোম্পানি তার কার্যক্রম শুরুই করেনি এবং কোম্পানির কোনো জিনিস বা মালিকানাও অস্তিত্বে আসেনি। বরং এখন কোম্পানির জন্ম হবে। সুতরাং প্রাথমিক পর্যায়ে যেভাবে দু-চারজন মানুষ তাদের অর্থ জমা করে কোনো কারবার শুরু করতো, অনুরূপভাবে

প্রাথমিক পর্যায়ে কোম্পানির পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষদেরকে আহ্বান জানানো হয় যে, আমাদের সঙ্গে তোমরাও এই কারবারে অংশীদার হয়ে যাও। সুতরাং এ অবস্থায় যারা ওই কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করছে, কেমন যেন তারা অংশীদারত্বের কারবার করছে। আর অংশীদারত্বের লেনদেন করার কারণে শেয়ার সার্টিফিকেট নামে তারা যে রশিদ পায়, বাস্তবিক অর্থে সেটি তার কোম্পানিতে আনুপাতিকহারে মালিক হওয়ার প্রমাণ বহন করে। এ হলো শেয়ারের বাস্তবতা।

নতুন কোম্পানির শেয়ারের হুকুম

প্রাথমিক পর্যায়ে যখন কোনো কোম্পানির শেয়ার ইস্যু করা হয়, তখন শেয়ার ক্রয় করা যাবে এই শর্তে যে, ওই কোম্পানি কোনো হারাম কারবার শুরু করবে না। সুতরাং কোনো হারাম কারবার করার জন্য যদি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা হয়; যেমন : মদ তৈরির ফ্যাক্টরি তৈরি করা হচ্ছে বা সুদি পদ্ধতিতে পরিচালনার জন্য ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে বা সুদনির্ভর ইন্সুরেন্স কোম্পানি চালু করা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই এ ধরনের কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করা জায়েজ নেই। কিন্তু যদি মৌলিকভাবে কোনো নিষিদ্ধ কারবার না করে। বরং হালাল কোনো জিনিস প্রস্তুত করার লক্ষ্যে কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করার জন্য শেয়ার ইস্যু করা হয়। যেমন : কোনো টেক্সটাইল কোম্পানি কিংবা অটোমোবাইল কোম্পানি তাহলে এমন কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ে কোনো সমস্যা নেই।

ক্রয়-বিক্রয়ের বাস্তবতা

কেউ যখন ওই শেয়ার ক্রয় করে, তখন সে ওই কোম্পানির অংশবিশেষের মালিক হয়ে যায়। কিন্তু সাধারণত এ পদ্ধতির কার্যক্রম প্রচলিত আছে যে, বিভিন্ন সময়ে শেয়ার হোল্ডার স্টক এক্সচেঞ্জে গিয়ে সেটি বিক্রি করে থাকে। সুতরাং যখন কোম্পানি প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং একেবারে ওই কোম্পানির সব শেয়ার সাবস্ক্রাইব হয়ে যায়। এরপর যখন স্টক মার্কেটে ওই শেয়ারের লেনদেন হয়। তখন সেই লেনদেনই প্রকৃত অর্থে শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয় বলে গণ্য হয়। যেমন : কোনো কোম্পানি যখন অস্তিত্বে আসলো, আমি তখন তার দশটি শেয়ার ক্রয় করলাম। তারপর এখন সে শেয়ারগুলোকে স্টক এক্সচেঞ্জে বিক্রি করছি। এখন দ্বিতীয় যে

ব্যক্তি আমার থেকে এই দশটি শেয়ার ক্রয় করলো, প্রকৃত অর্থে সে কোম্পানিতে থাকা আমার অংশ বিশেষের মালিকানা ক্রয় করে নিলো। সুতরাং এই পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করার মাধ্যমে কোম্পানিতে আমার যে মালিকানা ছিলো, আমার স্থানে সে মালিক হয়ে গেলো। শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের এটিই হলো আসল বাস্তবতা।

চারটি শর্তের সঙ্গে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েজ

অতএব যে ব্যক্তি ষ্টক মার্কেট থেকে শেয়ার ক্রয় করতে চায় সে চারটি শর্ত পালনের মাধ্যমে শেয়ার ক্রয় করতে পারে—

প্রথম শর্ত :

কোম্পানি কোনো হারাম কারবারির সঙ্গে জড়িত হবে না। যেমন : সুদি ব্যাংক না হওয়া। সুদ বা জুয়ার পদ্ধতিতে পরিচালিত ইন্সুরেন্স কোম্পানি না হওয়া। মদ তৈরির ফ্যাক্টরি না হওয়া। এ ছাড়াও অন্য কোনো হারাম কারবারের কোম্পানি হবে না। যদি এ ধরনের নিষিদ্ধ জিনিসের কারবার করে, তাহলে কোনো অবস্থাতেই এমন কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করা জায়েজ হবে না। চাই সেটা প্রাথমিক অবস্থায় ইস্যু হওয়ার সময় নেওয়া হোক বা পরবর্তী সময়ে স্টক মার্কেট থেকে নেওয়া হোক।

দ্বিতীয় শর্ত :

ওই কোম্পানির সব আসবাব ও মালিকানাধীন সম্পদ লিকুইড তথা তরল অর্থে (নগদ কারেন্সিরূপে) না থাকতে হবে। বরং তার কিছু ফিক্সড অ্যাসেট থাকতে হবে। যেমন : তার মালিকানাধীন কোনো বিল্ডিং বা ক্রয়কৃত জমি থাকা। সুতরাং যদি কোম্পানির কোনো ফিক্সড অ্যাসেট না থাকে। বরং সব সম্পদ লিকুইড হিসেবে থাকে, তাহলে এমন অবস্থায় ওই কোম্পানির শেয়ার তার গায়ের মূল্য থেকে কমবেশিতে বিক্রি করা জায়েজ নেই। বরং তার গায়ের মূল্যে বিক্রি করা আবশ্যক।

এটি সুদ হওয়ার কারণ এই যে, ওই কোম্পানিতে যারা তাদের অর্থ সাবক্রাইব করেছে, সে অর্থ দিয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো কিছু ক্রয় করা হয়নি। তা দিয়ে কোনো বিল্ডিং নির্মাণ, মেশিন ক্রয় বা অন্য কোনো আসবাবও ক্রয় করা হয়নি, এখনো পর্যন্ত সব অর্থ নগদ রয়েছে। তাহলে এমন ক্ষেত্রে ১০ টাকা মূল্যের শেয়ার ১০ টাকারই প্রতিনিধিত্ব করছে। এই শেয়ারের অবস্থা ঠিক ওই বন্ডের মতো, যেখানে ১০ টাকার বন্ড ১০ টাকারই প্রতিনিধিত্ব করে. অথবা যেমন ১০ টাকার নোট ১০ টাকারই প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং ১০ টাকার শেয়ার যখন ১০ টাকারই প্রতিনিধিত্ব করে, তখন সেটিকে এগারো বা নয় টাকায় ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েজ নেই। কেননা, সেটি ১০ টাকার নোটকে ৯ টাকা বা ১১ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করার মতো হয়ে যাবে। যেটি সুদ হওয়ার কারণে নিশ্চিত নাজায়েজ লেনদেনে পরিণত হবে। তবে কোম্পানির কিছু সম্পদ যদি ফিক্সড অ্যাসেট হিসেবে থাকে। তথা তরল সম্পদ নয়, এমন কিছু সম্পদ থাকে। যেমন : কিছু কাঁচামাল ক্রয় করলো। বা কিছু প্রস্তুতকৃত মাল ক্রয় করলো। বা কোনো বিল্ডিং নির্মাণ করলো অথবা মেশিন ইত্যাদি ক্রয় করলো, তাহলে এমন অবস্থায় দশ টাকার শেয়ারকে কমবেশিতে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে।

এমন লেনদেন জায়েজ হওয়ার একটি শরয়ি কারণ এই যে, যখন স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে বা পয়সাকে পয়সার বিনিময়ে বিক্রি করা হয়, তখন উভয় দিকের পরিমাণকে পরিপূর্ণভাবে সমান করে ক্রয়-বিক্রয় করা জরুরি। তবে যদি তার সঙ্গে অন্যকিছু মিলিত হয়, যেমন : স্বর্ণের একটি হারের সঙ্গে মুক্তা মেলানো আছে, তাহলে এ ক্ষেত্রে স্বর্ণের ব্যাপারে এই হুকুম হবে যে, সেটিকে পরিপূর্ণভাবে সমান সমান করে ক্রয়-বিক্রয় করতে হবে। কিন্তু মুক্তার ক্ষেত্রে এই হুকুম প্রযোজ্য হবে না। এ কারণে দশটি মুক্তার বিনিময়ে বারোটি মুক্তা নেওয়া জায়েজ আছে। সুতরাং যদি এমন একটি হার ক্রয় করা হয়, যেটি স্বর্ণ ও মুক্তার মিশ্রণে তৈরি, তাহলে ওই হারের মধ্যে যে পরিমাণ স্বর্ণ রয়েছে, তার চেয়ে কিছু বেশি স্বর্ণ দিয়ে ওই হারটি ক্রয় করা জায়েজ আছে। উদাহরণস্বরূপ মনে করুন, ওই হারের মধ্যে এক ভরি স্বর্ণ আর কিছু মুক্তা রয়েছে। এখন যদি কেউ একভরি ও এক তোলা স্বর্ণের বিনিময়ে ওই হারটি ক্রয় করতে চায়, তাহলে তার জন্য সেটি ক্রয় করা

জায়েজ হবে। জায়েজের কারণ হলো, এখানে একথা বলা হবে যে, এক ভরি স্বর্ণের বিনিময়ে এক ভরি স্বর্ণ রয়েছে। আর অবশিষ্ট এক তোলা স্বর্ণ মুক্তার বিনিময়ে। এভাবে ওই লেনদেনটি সহিহ্ হবে।

অনুরূপভাবে এখানে মনে করুন যে, কোম্পানির কিছু সম্পদ নগদ টাকা হিসেবে রয়েছে, আর কিছু রয়েছে ফিক্সড অ্যাসেট বা কাঁচামাল হিসেবে, তাহলে সেখানেও ফিকহের এই নীতিটি প্রযোজ্য হবে।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে এটিকে বোঝার চেষ্টা করুন! কোনো একটি কোম্পানি একশো টাকার শেয়ার ইস্যু করলো এবং দশজন ব্যক্তি সেটি ক্রয় করলো। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ছিলো ১০ টাকা, আর প্রত্যেকে কোম্পানিকে ১০ টাকা দিয়ে একটি করে শেয়ার ক্রয় করেছে। এরপর ওই টাকা দিয়ে এখনো পর্যন্ত কোম্পানি কোনো কিছু ক্রয় করেনি, তাহলে এখানে মূল বিষয় এটি থাকবে যে, একশো টাকার যে ১০ টি শেয়ার ছিলো, সে শেয়ার ১০ টি ওই একশো টাকারই প্রতিনিধিত্ব করছে। সুতরাং এখন যদি ধরে নেওয়া হয় যে, 'A' নামক একজনের কাছে একটি শেয়ার আছে। সে এখন ১০ টাকার পরিবর্তে এগারো টাকায় ওই শেয়ারটি বিক্রি করতে চাচ্ছে, তাহলে তার জন্য এমন পদ্ধতিতে বিক্রি করা জায়েজ হবে না। জায়েজ না হওয়ার কারণ হলো, এটি কেমন যেন ১০ টাকা দিয়ে এগারো টাকা নেওয়ার মতো। কেননা, এখনো পর্যন্ত সে টাকা দিয়ে কোম্পানি কোনো কিছু ক্রয় করেনি। বরং কোম্পানির কাছে নগদ হিসেবেই সেটি জমা রয়েছে।

তবে কোম্পানি যদি এমন করে যে, তার কাছে টাকা জমা হওয়ার পর একশো টাকার ৪০ টাকা দিয়ে বিল্ডিং, ২০ টাকা দিয়ে মেশিন, ২০ টাকা দিয়ে কাঁচামাল ক্রয় করলো। ১০ টাকা তার কাছে নগদ জমা রাখলো। আর বিভিন্ন পণ্য বিক্রয় করার কারণে লোকদের জিম্মায় পরিশোধযোগ্য ১০ টাকা ঋণ রয়ে গেলো। নিচের নকশা থেকে একথা বোঝার চেষ্টা করুন—

উসুল যোগ্য ঋণ	বিল্ডিং ক্রয় বাবদ	মেশিন ক্রয় বাবদ	কাঁচামাল ক্রয় বাবদ	নগদ	মোট
১০/=	৪০/=	২০/=	২০/=	১০/=	১০০ /=

নকশা অনুযায়ী কোম্পানির মোট সম্পদ পাঁচ ভাগে বিভক্ত হবে। এখন ‘A’ এর কাছে ১০ টাকা মূল্যের যে শেয়ার রয়েছে সেটি ওই বণ্টনের হারে বিভক্ত হবে। এর ব্যখ্যা হলো, ‘A’ এর কাছে ১০ টাকা মূল্যের যে শেয়ারটি রয়েছে তার ১ টাকা উসুলযোগ্য ঋণের মোকাবিলায়, ১ টাকা কোম্পানির নগদ টাকার মোকাবিলায়, ৪ টাকা বিল্ডিং ক্রয়ের, ২ টাকা মেশিন ক্রয়ের আর ২ টাকা কাঁচামাল ক্রয়ের মোকাবিলায়। সুতরাং এখন যদি ‘A’ ইচ্ছে করে যে, তার ১০ টাকার শেয়ারটি ১২ টাকায় বিক্রি করবে, তাহলে তার জন্য এমনটি করা জায়েজ আছে। কারণ, সেটি বিক্রি করার উদ্দেশ্য এই দাড়ায় যে, ‘A’ তার ১০ টাকা মূল্যের শেয়ারের ১ টাকায় নগদ ১ টাকা আর ১ টাকার বিনিময়ে ১ টাকার ঋণ বিক্রি করলো। আর বাকি ১০ টাকার অবশিষ্ট অংশের বিনিময়ে অন্যান্য জিনিস বিক্রি করলো। অনুরূপভাবে ‘A’ এর জন্য এমন ব্যাখ্যা দেওয়া সহিহ্ হবে যে, ওই লেনদেনের মধ্যে সে যে ২ টাকা লাভ করলো, সেটি নগদ ও ঋণের বিনিময়ে নয়। বরং অন্যান্য জিনিসের ওপর লাভ করেছে এবং সেগুলোর ওপর লাভ করা জায়েজ আছে।

কিন্তু কখনো যদি নগদ ও উসুলযোগ্য ঋণের পরিমাণ ১০ টাকার চেয়ে বেশি হয়ে যায়, তাহলে সে ক্ষেত্রে ‘A’ এর জন্য ১০ টাকা মূল্যের শেয়ারকে ১০ টাকার কমে তথা ৯ টাকায় বিক্রি করা জায়েজ হবে না। উদাহরণস্বরূপ মনে করুন যে, কোম্পানির কার্যক্রম যখন সামনে অগ্রসর হলো এবং উন্নতি করলো। যার ফলে তার উসুলযোগ্য ঋণের পরিমাণ হলো ১০০ টাকা। আর নগদ থাকলো ১০০ টাকা। ৪০ টাকার বিল্ডিং এবং ২০ টাকার কাঁচামাল ও ২০ টাকার মেশিন রয়েছে। এভাবে কোম্পানির মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ালো ২৮০ টাকা। আর একটি শেয়ারের ব্রেক আপ ভেলু দাঁড়িয়েছে ২৮ টাকা। নিচের নকশার মাধ্যমে বুঝুন—

উসুল যোগ্য ঋণ	বিল্ডিং ক্রয় বাবদ	মেশিন ক্রয় বাবদ	কাঁচামাল ক্রয় বাবদ	নগদ	মোট
১০০/=	৪০/=	২০/=	২০/=	১০০/=	২৮০/=

এ নকশা অনুযায়ী ‘A’ যদি এখন তার দশ টাকার শেয়ারটি বিক্রি করতে চায়, তাহলে ২১ টাকার কমে বিক্রি করতে পারবে না। কেননা, এখন দশটাকা মানুষের কাছে পাওনা উসুলযোগ্য ঋণের বিনিময়ে ও দশটাকা

নগদ টাকার বিনিময়ে রয়েছে। আর অবশিষ্ট একটাকা অন্যান্য জিনিসের বিনিময়ে রয়েছে। এ পদ্ধতিতে লেনদেনটি সহিহ্ হয়ে যাবে। তবে এখন 'A' যদি তার ওই শেয়ারকে ২১ টাকার পরিবর্তে ১৯ টাকায় বিক্রি করে তাহলে সেটি নাজায়েজ হবে। কারণ এ ক্ষেত্রে কেমন যেন ২০ টাকার পরিবর্তে ১৯ টাকা নেওয়া হলো। শরয়ি দৃষ্টিতে যেটি জায়েজ নেই।

অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত কোম্পানি কোনো কিছু না কিনে নগদ টাকাকে (তরল) Liquid সম্পদ হিসেবে জমা রাখবে অথবা উসুলযোগ্য ঋণ Receiveable হিসেবে রেখে দেবে। ততক্ষণ পর্যন্ত ওই কোম্পানির শেয়ারকে কমবেশিতে ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েজ হবে না। বরং তার ফেস ভ্যালু তথা গায়ের মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করতে হবে।

সুতরাং এখনো পর্যন্ত যেসব কোম্পানি অস্তিত্বে আসেনি। তবে স্টক মার্কেটে তার শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় শুরু হয়ে গেছে। যেমন : প্রোভিসনাল লিস্টেড কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সাধারণত এসব কোম্পানি বাস্তবে অস্তিত্ব লাভ করেনি। তাই এ ধরনের কোম্পানির শেয়ারকে কমবেশিতে ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েজ নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কিছুদিন পূর্বে স্টক মার্কেটে খুব গতি এসেছিলো। আর তখন অনেক কোম্পানি ফ্লোট হতে থাকে এবং খুব দ্রুতগতিতে লেনদেন হতে থাকে। সে সময় একটি কোম্পানি বাস্তবে অস্তিত্বে আসার আগে ১০ টাকা মূল্যে তার শেয়ার ইস্যু করে। কিন্তু কোম্পানি অস্তিত্বে আসার পূর্বেই স্টক মার্কেটে ১৮০ টাকা পর্যন্ত মুল্যে তার শেয়ার লেনদেন হতে থাকে!

মোটকথা, দ্বিতীয় শর্তের সারকথা এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোম্পানির কোনো সম্পদ ফিক্সড অ্যাসেটে না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে কোম্পানির শেয়ারকে কমবেশিতে লেনদেন করা জায়েজ নেই।

তৃতীয় শর্ত

তৃতীয় শর্তটি বুঝার আগে এ বিষয়টি জেনে নেওয়া আবশ্যক যে, বর্তমানে যত কোম্পানি রয়েছে, তার অধিকাংশ কোম্পানি এমন যে, তার মৌলিক কার্যক্রম হারাম নয়। যেমন : টেক্সটাইল বা অটোমোবাইল কোম্পানি ইত্যাদি। তবে সম্ভবত এমন কোনো কোম্পানি নেই, যেটি কোনোভাবেই

সুদি কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত নয়। এসব কোম্পানি দু-ভাবে সুদি কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত থাকে—

১. কোম্পানিগুলো তাদের ফান্ড বৃদ্ধির জন্য ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে থাকে এবং সেটির মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে।

২. কোম্পানির কাছে অতিরিক্ত ও উদ্বৃত্ত যে সম্পদ থাকে, সেগুলো সুদি অ্যাকাউন্টে জমা রাখে। এ অর্থের ওপর তারা ব্যাংক থেকে যে পরিমাণ সুদ পায়, সেই সুদও তাদের আমদানির অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং কেউ যদি ইচ্ছে করে যে, সে এমন কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করবে, যেটি কোনোভাবেই কোনো ধরনের সুদি কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, তাহলে এমন কোম্পানি পাওয়া খুব কঠিন। এখন প্রশ্ন হয় যে, তাহলে তো কোনো কোম্পানির শেয়ারই ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েজ না হওয়া উচিত।

এ ধরনের কোম্পানির ব্যাপারে সমকালীন আলেমদের অভিমত মতভেদপূর্ণ। আলেমদের একটি জামাত এমন অভিমত দিয়েছেন যে, এ ধরনের কোম্পানিগুলো যেহেতু হারাম কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং পরিমাণের দিক থেকে সে হারামের পরিমাণ যদিও অনেক কম; তারপরও সে যেহেতু হারাম কাজ করছে; তাই একজন মুসলিমের জন্য জায়েজ হবে না যে, সে কোম্পানির সঙ্গে হারাম কাজে অংশ নেবে। কারণ, কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে সে ওই কোম্পানির কার্যক্রমে অংশীদার হয়ে যাচ্ছে। আর কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এক শরিক অন্য শরিকের উকিল বা এজেন্ট হয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে যেন শেয়ার হোল্ডার কোম্পানিকে এ কাজের জন্য উকিল ও এজেন্ট বানাচ্ছে যে, তুমি সুদি ঋণ নাও এবং সুদি পদ্ধতিতে লাভ অর্জন করো। এ কারণে সেসব আলেমদের অভিমত অনুযায়ী ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করা জায়েজ নেই, যতক্ষণ এ ব্যাপারে আশ্বস্ত না হওয়া যাবে যে, ওই কোম্পানি কোনো ধরনের সুদি লেনদেন করে না।

আলেমদের অন্য জামাতের অভিমত হলো, যদিও এসব কোম্পানিতে এ সমস্যা রয়েছে। তবে তারপরও সমষ্টিগতভাবে কোনো কোম্পানির মৌলিক কার্যক্রমগুলো যদি হালাল হয়ে থাকে, তাহলে দুটি শর্তের ভিত্তিতে এ ধরনের কোম্পানির শেয়ার নেওয়ার সুযোগ আছে। হাকিমুল উম্মত মাওলানা

আশরাফ আলি থানবি রহ. ও আমার সম্মানিত পিতা মুফতি মুহাম্মাদ শফি রহ.-এর অভিমত এটিই। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমিও এ অভিমতকে সঠিক মনে করছি। সে শর্ত দুটি হলো—

ক. শেয়ার হোল্ডারকে কোম্পানির মধ্যে চলমান সুদি কার্যক্রমের বিপক্ষে অবশ্যই দাবি তুলতে হবে। যদিও তার দাবিটি প্রত্যাখ্যাত হোক না কেন। আমার ধারণা অনুযায়ী এমন দাবি তোলার উত্তম পদ্ধতি হলো, কোম্পানির পক্ষ থেকে বাৎসরিক যে মিটিং (A.G.M) হয় সেখানে এই দাবি তুলবে যে, আমরা সুদি লেনদেনকে সঠিক মনে করি না। আমরা সুদি লেনদেনের পক্ষে নেই। বিধায় সেটি বন্ধ করতে হবে। এখন এ কথা স্পষ্ট যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে এমন দাবি তোলা নিরর্থক। নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তার এমন দাবি প্রত্যাখ্যাত হবে। তবে থানবি রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী সে এমন দাবি তোলার মাধ্যমে নিজের ব্যাপারে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। [৮২]

চতুর্থ শর্ত

চতুর্থ শর্তটি হলো মূলত তৃতীয় শর্তের একটি অংশ। যখন কোম্পানির [Income statement] লভ্যাংশ [Dividend] বণ্টন করা হবে; তখন শেয়ার হোল্ডার কোম্পানির ইনকাম স্টেটমেন্টের মাধ্যমে জেনে নেবে যে, কোম্পানি সুদি অ্যাকাউন্ট থেকে কি পরিমাণ লাভ করেছে। যেমন : মনে করুন কোম্পানির লাভের পাঁচ পার্সেন্ট এসেছে সুদি ডিপোজিট থেকে, তাহলে এ ক্ষেত্রে ওই শেয়ার হোল্ডার তার প্রাপ্ত লাভের পাঁচ পার্সেন্ট সদাকা করে দেবে। সুতরাং যদি কোম্পানির আসল কার্যক্রম হালাল হয়, তবে সেইসঙ্গে ওই কোম্পানি ব্যাংক থেকে সুদি লোন নেয় অথবা তার উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যাংকে রেখে সেখান থেকে সুদ গ্রহণ করে আর এ ক্ষেত্রে যদি উল্লিখিত শর্ত দুটির ওপর আমল করা হয়, তাহলে এমন কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করার সুযোগ রয়েছে। আর আমি মনে করি যে, বৈধতার এই সিদ্ধান্ত একটি মধ্যমপন্থি এবং ইসলামি উসুলভিত্তিক সিদ্ধান্ত। যেটি সাধারণ মানুষদেরকে সহজের রাস্তা দেখাবে।

---

[৮২] দ্বিতীয় শর্ত মূল উর্দু মাকালায় উল্লেখ করা হয়নি।

উপরের আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হলো যে, শেয়ার (ফেস ভ্যালুর চেয়ে কমবেশিতে) ক্রয়-বিক্রয় করার জন্য মোট চারটি শর্ত রয়েছে। যথা—

১. কোম্পানির মৌলিক কার্যক্রম হালাল হবে।

২. কোম্পানির সম্পদের মধ্যে কিছুটা হলেও স্থায়ী সম্পদ (Fixed assets—ফিক্সড অ্যাসেট) থাকতে হবে। শুধু নগদ সম্পদ হলে হবে না।

৩. কোম্পানি যদি কোনো ধরনের সুদি লেনদেন করে, তাহলে বাৎসরিক মিটিং (A.G.M)-এ তার বিপক্ষে দাবি তুলতে হবে।

৪. লভ্যাংশ বণ্টনের পর এর যে পরিমাণ সুদি পদ্ধতিতে এসেছে সে পার্সেন্ট অনুযায়ী প্রাপ্ত লভ্যাংশ থেকে সদাকা করতে হবে।

এ চারটি শর্ত বাস্তবায়নের শর্তে কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েজ আছে।

শেয়ার ক্রয়ের দুটি উদ্দেশ্য

বর্তমানে স্টক মার্কেটে শেয়ারের যে লেনদেন হয়, সেটি দুটি উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে—

ক. অনেকে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয় করে থাকে। অর্থাৎ তাদের উদ্দেশ্য থাকে যে, শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে আমরা কোনো কোম্পানির অংশীদার হয়ে যাবো। এরপর বাৎসরিক লাভ পেতে থাকবো। এ ধরনের শেয়ার ক্রেতাদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপরে করেছি যে, এমন লোকদের জন্য চারটি শর্তের সঙ্গে শেয়ার ক্রয় করা জায়েজ আছে।

খ. শেয়ার এবং (Capital Gain) ক্যাপিটাল গেইন

অন্যদিকে এমন কিছু লোক আছে, যারা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয় করে না। বরং তাদের উদ্দেশ্য থাকে ক্যাপিটাল গেইন। তারা অনুমান করে যে, কোন কোম্পানির শেয়ারের মূল্য বাড়ার সম্ভবানা রয়েছে। সুতরাং তারা এ ধরনের কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করার পর কিছুদিন নিজেদের কাছে রেখে দেয়। মূল্য বৃদ্ধি হলে পরে সেগুলো বিক্রি করে লাভ অর্জন করে। অথবা কোনো কোম্পানির

শেয়ারের মূল্য কমে গেলে তার শেয়ার ক্রয় করে পরবর্তী সময়ে সেগুলো বিক্রি করে দেয়। এভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে লাভ অর্জনই তাদের মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কোম্পানির অংশীদার হওয়া এবং বছর শেষে তার থেকে লাভ অর্জন তাদের মূল উদ্দেশ্য থাকে না। বরং স্বয়ং শেয়ারকে তারা একটি ব্যবসায়িক পণ্য বানিয়ে সেটির লেনদেন করে। এখানে প্রশ্ন হয় যে, শরয়ি দৃষ্টিতে এ ধরনের শেয়ারের লেনদেনের কতটুকু সুযোগ রয়েছে?

এ প্রশ্নের উত্তর হলো, যেভাবে শেয়ার ক্রয় করা জায়েজ আছে, সেভাবেই সেটি বিক্রি করা জায়েজ আছে। তবে তার জন্য শর্ত হলো, উল্লিখিত শর্তগুলো পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করতে হবে। আর যেভাবে আজ একটি জিনিস ক্রয় করে কাল সেটিকে বিক্রি করে দেওয়া, আবার আগামীকাল ক্রয় করে পরশু বিক্রি করা জায়েজ আছে ঠিক তেমনিভাবে শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয়ও জায়েজ আছে।

ডিফারেন্স সমান করে নেওয়া জুয়ার অন্তর্ভুক্ত

তবে স্টক এক্সচেঞ্জে বড়ো ধরনের ভূমিকা পালনকারী ‘ডিফারেন্স সমান করার’ বিষয়টি থাকাকালে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়কে জায়েজ বলা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় এ ক্ষেত্রে শেয়ারের লেনদেন মূল উদ্দেশ্য থাকে না। বরং শেষ পর্যন্ত উভয় মূল্যের মধ্যে সমন্বয় করে নেওয়া হয়। শেয়ার কবজা করা হয় না এবং কবজা করার বিষয়টিও সামনে আসে না। অতএব যেখানে শেয়ার কবজা করা হয় না এবং শেয়ার লেনদেন করাও উদ্দেশ্য থাকে না বরং সেখানে মূল উদ্দেশ্য থাকে জুয়ার মাধ্যমে উভয় মূল্যের মধ্যকার পার্থক্য সামান করে নেওয়া, সেসব ক্ষেত্রে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা স্পষ্ট হারাম এবং শরিয়তে এর কোনো অনুমতি নেই।

শেয়ার ডেলিভারি হওয়ার আগে বিক্রি করে দেওয়া

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, অনেক সময় কেউ শেয়ার ক্রয় করে কিন্তু তখনো পর্যন্ত শেয়ার কবজা করেনি এবং সেটি ডেলিভারি হয়নি। এ পদক্ষেপগুলো সম্পন্ন হওয়ার আগেই সে ওই শেয়ারকে অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয়। যেমন : আজ কোনো একটি কোম্পানির শেয়ার বাজারে ছাড়া হয়েছে। তবে এখনো পর্যন্ত ওই শেয়ারের আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পন্ন হয়নি। অথচ সেই শেয়ারের ওপর দশবার বিক্রয় কার্যক্রম হয়ে গেছে। এমনটি হওয়ার কারণ হলো, সাধারণভাবে শেয়ারের

উপস্থিত লেনদেনের ক্ষেত্রে সেটিও বিক্রি হওয়ার পর ডেলিভারি হতে কমপক্ষে এক সপ্তাহ সময়ের প্রয়োজন হয়। এখন প্রশ্ন হয় যে, এভাবে কবজা ও ডেলিভারি হওয়ার আগে এ শেয়ার বিক্রি করা জায়েজ আছে কি?

এ সম্পর্কে প্রথমে একটি মূলনীতি বুঝে নিন। এরপর বাস্তব অবস্থা পরখ করা সহজ হবে। সে মূলনীতিটি হলো, আপনি যে জিনিস ক্রয় করেছেন, কবজা করার আগে অন্যের কাছে সেটি বিক্রি করা জায়েজ নেই। তবে হস্তগত করার অর্থ সবসময়ই আক্ষরিক অর্থে হস্তগত করা নয়। বরং প্রাপ্তি স্বীকারই যথেষ্ট। অর্থাৎ সে জিনিসটি যদি আমার জিম্মায় চলে আসে, তাহলে সেটি বিক্রি করা জায়েজ হয়ে যায়।

শেয়ার কবজা করা

এখন দেখার বিষয় হলো যে, শেয়ারের কবজা বলতে কি বুঝায়? সেটিকে কীভাবে কবজা করা হয়? আমরা যে কাগজকে শেয়ার সার্টিফিকেট বলি, সেটির নাম শেয়ার নয়। বরং শেয়ার হলো, সেই মালিকানার নাম, যেটি ওই কোম্পানির মধ্যে রয়েছে। আর আমাদের হাতে থাকা এই সার্টিফিকেট সেই মালিকানার আলামত, প্রমাণ এবং সাক্ষী। সুতরাং যদি ধরে নেওয়া হয় যে, ওই কোম্পানির মধ্যে জনৈক ব্যক্তির মালিকানা রয়েছে তবে এখনো পর্যন্ত সে সার্টিফিকেট পায়নি, তবুও শরয়ি দৃষ্টিতে এমন ক্ষেত্রে সে ওই কোম্পানির মালিক হিসেবে বিবেচিত হবে।

একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝুন যে, আপনি একটি প্রাইভেটকার ক্রয় করেছেন। সেটি আপনার কাছে রয়েছে। কিন্তু যার কাছ থেকে আপনি সেটি ক্রয় করেছেন, এই কারটি এখনো পর্যন্ত তার নামে রেজিষ্ট্রি রয়েছে। এখনো পর্যন্ত তার রেজিষ্ট্রি পরিবর্তন হয়নি। এখন যেহেতু কারটি আপনার কবজায় রয়েছে তাই শুধু রেজিষ্ট্রি না হওয়ার কারণে এ কথা বলা যাবে না যে, এখনো পর্যন্ত কারের ওপর পরিপূর্ণ কবজা হয়নি। (শেয়ার সার্টিফিকেটও কার রেজিষ্ট্রির মতোই।)

ঝুঁকি পরিবর্তন হওয়াই যথেষ্ট

এখন প্রশ্ন হয় যে, কোম্পানির সেই আসল অংশ, যেটির প্রতিনিধিত্ব করছে এই শেয়ার সার্টিফিকেট, এই শেয়ার সার্টিফিকেটের মাধ্যমে কোম্পানির ওই অংশটি

মালিকানায় এসেছে কি না? এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, কোম্পানির অংশটি এমন নয় যে, শেয়ারের বাহক সেখানে গিয়ে তার অংশটি উসুল করবে এবং সেটি কবজা করবে। এভাবে কবজা করা তো কখনোই সম্ভব নয়। সুতরাং আসল অংশের মালিক হওয়ার উদ্দেশ্য হলো, সে ওই অংশের দায়ভার বহন এবং লাভের অংশিদার হওয়া।

যেমন : স্টক মার্কেট থেকে আজ আমি একটি শেয়ার ক্রয় করলাম। এখনো পর্যন্ত শেয়ার সার্টিফিকেট উসুল এবং ডেলিভারি হয়নি। এরই মধ্যে বোমা পড়ে কোম্পানিটি ধ্বংস হয়ে গেলো। তার কোনো কিছুই আর বাকি থাকলো না। এ ক্ষেত্রে ক্ষতির দায়ভার যদি আমার ওপর বর্তায়, তাহলে এর অর্থ হলো, এ শেয়ারের রিস্ক আমি বহন করেছি এবং এ ক্ষেত্রে সেটিকে অন্যের কাছে বিক্রিও করতে পারবো। আর ক্ষতির দায়ভার যদি আমার ওপর না বর্তে বিক্রেতার ওপর বর্তায়, তাহলে এর অর্থ হলো, এ শেয়ারের রিস্ক আমি বহন করছি না। এ ক্ষেত্রে শেয়ার সার্টিফিকেট কবজা করার আগে ওই শেয়ার বিক্রি করা আমার জন্য জায়েজ হবে না।

এখন প্রশ্ন হয় যে, প্রকৃত অবস্থা কি? শেয়ার ক্রয় করার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবে তার রিস্ক ক্রেতার ওপর বর্তায় কি না? এটি এমন একটি প্রশ্ন, আমি এখনো পর্যন্ত যার সঠিক উত্তর জানতে পারিনি। এ কারণে এ সম্পর্কে আমি চূড়ান্ত কোনো কথা বলছি না। তবে আমি মূলনীতি বলে দিয়েছি যে, রিস্ক হস্তান্তর হওয়ার ক্ষেত্রে সেটি বিক্রি করা জায়েজ আছে। অবশ্য সতর্কতার দাবি হলো, শেয়ার ডেলিভারি হওয়ার আগ পর্যন্ত সেটিকে অন্যের কাছে বিক্রি না করা।

বদলার লেনদেন করা জায়েজ নেই

স্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ার লেনদেনের আরও একটি পদ্ধতি রয়েছে। যেটিকে বদলা বলা হয়। এটিও অর্থায়নের একটি পদ্ধতি। এ পদ্ধতির প্রায়োগিক রূপ হলো, এমন একজনের নগদ অর্থের প্রয়োজন, যার কাছে শেয়ার রয়েছে। সে অন্যের কাছে শেয়ার নিয়ে গিয়ে বলে যে, আজ আপনার কাছে এই শেয়ারগুলো এই মূল্যে বিক্রি করছি। আর এক সপ্তাহ পরে এর এই পরিমাণ মূল্য বৃদ্ধি করে আমি সেটি ক্রয় করে নেবো। কেমন যেন বিক্রয়ের সময় শর্তারোপ করলো যে, এই শেয়ারগুলোর মূল্য বৃদ্ধি করে ফিরিয়ে নেবো। ক্রেতা সেটিকে অন্যের

কাছে বিক্রি করতে পারবে না। প্রশ্ন হলো, শরয়ি দৃষ্টিতে বদলার এই পদ্ধতিটি জায়েজ আছে কি?

এ প্রশ্নের উত্তর একেবারেই স্পষ্ট। আর তা হলো : এমন পদ্ধতি জায়েজ নেই। কেননা, ইসলামি ফিকহের মূলনীতি রয়েছে যে, কোনো বিক্রয়চুক্তির মধ্যে উক্ত চুক্তির সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো শর্তারোপ করা জায়েজ নেই। বিশেষত মূল্য বাড়িয়ে দ্বিতীয়বার ওই পণ্য ফিরিয়ে নেওয়ার শর্তটি স্পষ্ট হারাম এবং এটি একটি ফাসেদ শর্ত। সুতরাং বদলার এই পদ্ধতি স্পষ্ট সুদের একটি ভিন্ন শিরোনাম। শরিয়তে এমন পদ্ধতির কোনো অনুমতি নেই।

শেয়ারের জাকাত

আরও একটি মাসআলা হলো শেয়ারের জাকাত। প্রশ্ন হয়, শেয়ারের ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে কি না? যদি জাকাত ওয়াজিব হয়, তাহলে কীভাবে হিসেব করতে হবে? কীভাবে আদায় করতে হবে? শুরুতে আমি বলেছি যে, শেয়ার কোম্পানিতে থাকা মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং কেউ যদি এ উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয় করে যে, আগামীতে সেটি বিক্রি করে লাভ অর্জন করবে; বছর শেষে কোম্পানির অংশীদার হিসেবে লাভের অংশীদার হবে না। তাহলে এ ক্ষেত্রে ওই শেয়ারের মার্কেট মূল্য অনুযায়ী তার ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে।

তবে শেয়ার ক্রয়ের সময় যদি ক্যাপিটাল গেইন করার ইচ্ছে না থাকে। বরং বছর শেষে লাভ অর্জন করা আসল উদ্দেশ্য থাকে। তবে সেইসঙ্গে এমনটি ইচ্ছে ছিলো যে, যদি ভালো লাভ পাওয়া যায়, তাহলে বিক্রি করে দেবো। তাহলে এ ক্ষেত্রে ওই শেয়ারের মার্কেট মূল্যের ওই অংশের ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে, যে অংশ জাকাতযোগ্য সামগ্রীর বিনিময়ে হবে। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝুন।

যেমন : একটি শেয়ারের মার্কেট ভ্যালু ১০০ টাকা। যার ৬০ টাকা বিল্ডিং ও মেশিন ইত্যাদির বিনিময়ে রয়েছে। আর অবশিষ্ট ৪০ টাকা কাঁচামাল, প্রস্তুতকৃত পণ্য এবং নগদরূপে রয়েছে, তাহলে এ ক্ষেত্রে ওই শেয়ারের ৪০ টাকা যেহেতু জাকাতযোগ্য সম্পদের বিনিময়ে রয়েছে এ কারণে ৪০ টাকার মধ্যে ২.৫০% টাকা জাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে। আর অবশিষ্ট ৬০ টাকার ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে না। নকশার মাধ্যমে এটি আরও স্পষ্ট হবে।

শেয়ারের মার্কেট রেট ১০০ টাকা।

জাকাতযোগ্য নয় এমন সম্পদ

বিল্ডিং বাবদ	মেশিন বাবদ	মোট
৩০/=	৩০/=	৬০/=

জাকাতযোগ্য সম্পদ

প্রস্তুতকৃত পণ্য	কাঁচামাল বাবদ	নগদ অর্থ	মোট
১৫/=	১৫/=	১০/=	৪০/=

সারকথা, শুধু এমন কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েজ আছে, যার মৌলিক কার্যক্রম হালাল ও বৈধ। একই সঙ্গে সেসব শর্ত পূরণ করতে হবে, যেগুলো উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে শরিয়তের হুকুমের ওপর চলার তাওফিক দিন। আমিন।

নিরেট স্বত্ব ক্রয়-বিক্রয় করা

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

'নিরেট স্বত্ব ক্রয়-বিক্রয় করা' এটি আরবি মাকালা 'بيع الحقوق المجردة'-এর অনুবাদ। ১৪০৯ হিজরির জুমাদাল উলা মাসের ১-৬ তারিখ অনুযায়ী ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ১০-১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত কুয়েতে অনুষ্ঠিত 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি'-এর পঞ্চম অধিবেশনে এটি উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তী সময়ে 'বুহুস ফি কজায়া ফিকহিয়্যা মুআসারা'-এর প্রথম খণ্ডে এটি প্রকাশ করা হয়।

—আবদুল্লাহ মায়মান

মাকতাবাতুল ইসলাম মাকতাবাতুল ইসলাম

নিরেট স্বত্ব ক্রয়-বিক্রয় করা

বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার স্বত্বের প্রচলন ঘটেছে, যেগুলো বাস্তবে কোনো পণ্য নয়। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে এর লেনদেন সমাজে হচ্ছে। প্রচলিত আইনে এসব স্বত্বের কোনোটার কিছু স্বত্ব ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। আর কিছু রয়েছে যা বিক্রি অবৈধ। তবে এ ধরনের লেনদেনে বাজার একেবারে পরিপূর্ণ। উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি—বাড়ি বা দোকানের পজিশন, ব্যবসায়িক লোগো, ট্রেডমার্ক (Trade Mark), অথবা ট্রেড লাইসেন্স ইত্যাদি ব্যবহার এবং সেসব স্বত্ব যাকে বর্তমানের পরিভাষায় মেধাস্বত্ব বা সাহিত্য ও শাস্ত্রীয় স্বত্ব যেমন : আবিষ্কারস্বত্ব, প্রকাশনাস্বত্ব ও শিল্পকর্মের স্বত্ব ইত্যাদি।

আধুনিক ব্যবসা মহলে এসব স্বত্বের মালিকানাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। যার ওপর পণ্য ও মালিকানার বিধিবিধান প্রযোজ্য হয়। কারণ, সেগুলো ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, ভাড়া দেওয়া হয়, দান করা হয় এবং তার মধ্যে মিরাস জারি হয়। অর্থাৎ এ ধরনের স্বত্ব পুরোপুরি অন্যান্য নিরেট পণ্য ও ধাতব পদার্থের মতোই।

সুতরাং এখন প্রশ্ন হলো, শরিয়তের দৃষ্টিতে এগুলোকে পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সেগুলোর ক্রয়-বিক্রয় সহিহ্ হবে কি? অথবা কোনো বৈধ পদ্ধতিতে সেগুলোর বিনিময় নেওয়া জায়েজ আছে কি?

আগেকার আলেমদের যুগে এ মাসআলাটি এতটা ব্যাপক আকারে প্রচলিত ছিলো না। তাই এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, আমাদের যুগের এ সমস্ত শাখাগত মাসআলা তাদের গ্রন্থাবলিতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরং আগের আলেমদের অধিকাংশই সেসকল

স্বত্ব ও তার লেনদেন নিয়ে আলোচনা করেছেন, যা তাদের যুগে প্রচলিত ও বোধগম্য ছিলো। ফলে তাদের অনেকে নিরেট স্বত্বের বিনিময় নেওয়াকে নিষিদ্ধ করেছেন। আবার অনেকে কিছু নিরেট স্বত্বের বিনিময় নেওয়া বৈধ বলেছেন।

এ বিষয়ে ফকিহগণ যা কিছু লিখেছেন, সেগুলো পরখ করলে দেখতে পাই যে, সেখানে বিভিন্ন ধরনের স্বত্ব রয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে ফকিহদের বক্তব্যও বিভিন্ন রকম। এখনো পর্যন্ত আমি এমন কোনো সামগ্রিক বক্তব্য পাইনি, যার মধ্যে সব ধরনের স্বত্বের হুকুম পাওয়া যাবে অথবা এমন কোনো মূলনীতি পাওয়া যাবে, যার ওপর এ অধ্যায়ের মাসআলার ভিত রচনা করা যায়। ফলে এ বিষয় কেন্দ্রিক কুরআন-হাদিসের দলিল এবং ফিকহি কিতাবে বর্ণিত আমাদের আলোচনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নির্ভরযোগ্য শাখাগত মাসআলা থেকে একটি মূলনীতি বের করা প্রয়োজন মনে করছি। মহান আল্লাহর কাছে কামনা করি, তিনি যেন আমাদের পদক্ষেপগুলোকে সুষ্ঠু করে দেন এবং তার সন্তুষ্টির পথে আমাদের অন্তর খুলে দেন। তিনিই তাওফিকদাতা এবং সাহায্যকারী।

স্বত্বের প্রকারভেদ

ফকিহগণ যেসব স্বত্বের বিনিময় নেওয়া সম্পর্কে তাদের কিতাবে আলোচনা করেছেন সেগুলো অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, এ ধরনের স্বত্ব দু-ভাগে বিভক্ত—

১. শরয়ি স্বত্ব : অর্থাৎ যেটি শরিয়তের পক্ষ থেকে প্রমাণিত এবং সেটি প্রমাণে কিয়াসের কোনো ভূমিকা নেই।

২. প্রচলিত স্বত্ব : অর্থাৎ সামাজিক প্রচলনের মাধ্যমে যেটি প্রমাণিত এবং শরিয়তও যেটিকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।

শরয়ি ও প্রচলিত স্বত্বের প্রত্যেকটি আবার দু-ভাগে বিভক্ত—

১. এমন স্বত্ব, যা তার অধিকারীর ক্ষতি প্রতিহত করার জন্য হয়ে থাকে।
২. এমন স্বত্ব, যা সত্তাগতভাবে প্রমাণিত।

সত্তাগতভাবে প্রমাণিত স্বত্ব আবার কয়েকভাগে বিভক্ত। যথা—

১. এমন স্বত্ব যা কোনো জিনিসের স্থায়ী উপকারিতাকে বোঝায়।

যেমন : রাস্তায় চলাচলের অধিকার। পানি নেওয়ার অধিকার। পানি প্রবাহিত করার অধিকার ইত্যাদি।

২. এমন স্বত্ব, যা বৈধ জিনিসে ব্যক্তি বিশেষের সর্ব প্রথম নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অর্জিত হয়। এ ধরনের স্বত্ব বা অধিকারকে অগ্রাধিকার স্বত্ব বা নির্দিষ্ট করণের মাধ্যমে অর্জিত অধিকার বলা হয়।

৩. এমন স্বত্ব যা অন্যের সঙ্গে কোনো চুক্তি নবায়ন করা বা চুক্তি বাকি রাখার অধিকারকে বোঝায়। যেমন : জমি, বাড়ি, দোকান ইজারা নেওয়ার অধিকার। অথবা ওয়াকফ কেন্দ্রিক কোনো চাকরি জারি রাখার অধিকার।

বর্ণিত স্বত্বসমূহের বিনিময় দু-ভাবে নেওয়া যেতে পারে। যথা—

১. বিক্রির মাধ্যমে বিনিময় নেওয়া। এ পদ্ধতির প্রায়োগিক রূপ হলো, বিক্রেতা তার মালিকানাধীন স্বত্বের আনুষাঙ্গিক সবকিছুকে ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করবে।

২. অধিকারত্যাগ বা সমঝোতার মাধ্যমে বিনিময় নেওয়া। এ পদ্ধতির বাস্তবরূপ হলো, স্বত্বত্যাগকারী তার অধিকার ছেড়ে দেবে। কিন্তু অধিকার প্রত্যাহারের কারণে যার জন্য অধিকার ত্যাগ করেছে তার কাছে অধিকারটা স্থানান্তর হয় না। তবে অধিকার প্রত্যাশীর বিপরীতে অধিকার ত্যাগকারী থাকে না এতটুকুই।

এ দুটি পদ্ধতির পার্থক্য সম্পর্কে আল্লামা করাফি রহ. বলেন—

اعلم أن الحقوق والأملاك ينقسم التصرف فيها إلى نقل وإسقاط ، فالنقل ينقسم إلى ما هو بعوض في الأعيان ، كالبيع والقرض ... وإلى ما هو بغير عوض كالهدايا والوصايا فإن ذلك كله نقل ملك في أعيان بغير عوض .

وأما الإسقاط فهو إما بعوض كالخلع ، والعفو على مال ... فجميع هذه الصور يسقط فيها الثابت ، ولا ينتقل إلى الباذل ما كان يملكه المبذول له من العصمة وبيع العبد ونحوهما.

স্বত্ব ও মালিকানার স্থানান্তর এইভাবে হয় যে, স্বত্বাধিকারী তা অন্যের কাছে হস্তান্তর করে বা অধিকার ছেড়ে দেয়। সুতরাং পণ্যের ক্ষেত্রে

কখনো বিনিময়ের মাধ্যমে স্থানান্তর হয়ে থাকে। (যেমন : বিক্রি বা ঋণ দেওয়ার মাধ্যমে।) আবার কখনো বিনিময়হীন হয়ে থাকে। (যেমন : উপহার দেওয়া বা অসিয়ত করার মাধ্যমে।) এগুলো হলো বিনিময়হীন অন্যের কাছে কোনো পণ্যের মালিকানা স্থানান্তর করা।

আর অধিকার ছেড়ে দেওয়াও কখনো কখনো বিনিময়ের মাধ্যমে হয়। যেমন : খুলা তালাক বা অর্থের বিনিময়ে ক্ষমা করে দেওয়া। এসব পদ্ধতিতে অধিকারটি রহিত হয়ে যাবে। তবে প্রদানকারীর কাছে স্থানান্তর হবে না যেভাবে মূল মালিকের অধিকারে ছিলো। যেমন সংরক্ষণ, দাস বিক্রি বা এ ধরণের অন্য কিছু।'[৮৩]

ফকিহগণ তাদের কিতাবে যেসব স্বত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন আমরা শুরুতে সেগুলো উল্লেখ করে তার প্রত্যেকটির ওপর ফকিহদের বক্তব্য নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা করবো। এরপর তাদের আলোচনার সারাংশ বের করবো, যা আমাদের যুগের মানুষের মধ্যে প্রচলিত স্বত্বসমূহের শরয়ি হুকুম জানতে সহায়তা করবে। আর আমরা যেসব স্বত্বের বিনিময় নেওয়ার হুকুম জানতে চাচ্ছি, সে দিকে পথ দেখাবে। মহান আল্লাহই তাওফিকদাতা এবং সাহায্যকারী।

প্রথম আলোচনা : শরয়ি স্বত্ব

শরয়ি স্বত্ব বলতে আমাদের উদ্দেশ্য হলো সেসব স্বত্ব, যেগুলো শরিয়ত কর্তৃক প্রমাণিত। সেখানে কিয়াস বা অনুমানের কোনো দখল নেই। শরিয়ত কর্তৃক স্পষ্ট বা অস্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে সেটি স্বত্বাধিকারীর জন্য সাব্যস্ত। যদি শরয়ি প্রমাণ না থাকতো, তাহলে এ স্বত্বটি প্রমাণিত হতো না। যেমন : শোফা বা প্রতিবেশির ক্রয়ের অগ্রাধিকার অধিকারস্বত্ব, অভিভাবকত্ব, মিরাস বা উত্তারাধিকারস্বত্ব, বংশ, কিসাস, স্ত্রী সম্ভোগ, তালাক, সন্তান প্রতিপালন ও স্ত্রীর জন্য স্বামীকে কাছে পাওয়ার অধিকার।

শরয়ি স্বত্ব দু-ভাগে বিভক্ত

ক. এমন স্বত্ব, যা সত্তাগতভাবে প্রমাণিত নয়। বরং স্বত্বাধিকারীর ক্ষতি প্রতিহত

[৮৩] আল-ফুরুক, আল্লামা করাফি রহ., ফরক নং ৭৯, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১১০।

করার জন্য শরিয়ত তাকে বৈধ করেছে। এ ধরনের স্বত্বকে আমরা 'হুকুকে জরুরিয়া. (আবশ্যকীয় স্বত্ব) বলতে পারি।

খ. এমন স্বত্ব যেগুলো সত্তাগতভাবে তার অধিকারীর জন্য প্রমাণিত। কোনো ক্ষতি প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে প্রমানিত নয়। এ ধরনের স্বত্বকে আমরা 'হুকুকে আসলিয়া' (আসল স্বত্ব) বলতে পারি।

হুকুকে জরুরিয়া

হুকুকে জরুরিয়ার একটি উদাহরণ হলো : শোফার হক (ক্রয় অগ্রাধিকার হক)। সত্তাগতভাবে এ হকটি প্রমাণিত নয়। কারণ, মূলনীতি হলো, ক্রেতা-বিক্রেতা তাদের সন্তুষ্টিতে যখন কোনো লেনদেন করবে, তখন সেখানে তৃতীয় ব্যক্তির কোনো অধিকার থাকবে না। কিন্তু শরিয়ত জমির অংশীদার, পানি সিঞ্চনের অংশীদার ও প্রতিবেশীর জন্য তাদের ক্ষতি প্রতিহত করার উদ্দেশে শোফার অধিকার রেখেছে। আরেকটি উদাহরণ হলো : স্ত্রীর জন্য নির্দিষ্ট সময় পর স্বামীকে কাছে পাওয়ার অধিকার। স্ত্রীর সমস্যা দূর করার জন্য এ অধিকার রাখা হয়েছে। অন্যথায় স্বামীর জন্য এমন স্বাধীনতা ছিলো যে, তার ইচ্ছে মতো যে-কোনো স্ত্রীকে ব্যবহার করবে এবং যখন যার কাছে ইচ্ছে তার কাছে রাত কাটাবে। এ ধরনের আরও কিছু অধিকার হলো, সন্তান প্রতিপালন, এতিমের অভিভাবকত্ব, তালাকগ্রহণের অধিকার প্রাপ্ত স্ত্রীর অধিকার।

এ ধরনের স্বত্বের হুকুম হলো, এগুলোর বিনিময় নেওয়া জায়েজ নেই। বিক্রয়, সমঝোতা বা স্বত্বত্যাগ কোনোভাবেই তার বিনিময় নেওয়া জায়েজ নেই। এ ক্ষেত্রে যৌক্তিক দলিল হলো, সত্তাগতভাবে এ অধিকারগুলো তার মালিকের জন্য প্রমাণিত নয়। বরং তার ক্ষতি প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে এগুলো প্রমাণিত। এখন এ ধরনের অধিকারের মালিক সেটিকে যদি অন্য কাউকে দিতে বা স্বত্বত্যাগে রাজি থাকে, তাহলে এটি প্রমাণিত হবে যে, এ অধিকারটি না থাকলে তার কোনো ক্ষতি হবে না। ফলে বিষয়টি তার আসল অবস্থায় ফিরে যাবে। আর আসল অবস্থা হলো তার জন্য অধিকারটি প্রমাণিত না হওয়া। সুতরাং এ ধরনের অধিকারের মালিকের জন্য কোনো বিনিময় দাবি করা জায়েজ নেই। যেমন : শোফার ক্ষেত্রে শোফার দাবিদার

যখন তার অবস্থান থেকে সরে দাঁড়াবে তখন প্রমাণিত হবে যে, জমি বিক্রয়ে তার কোনো ক্ষতি হবে না। ফলে ওই বিক্রয়চুক্তি বাতিল করার ব্যাপারে তার যে অধিকার প্রমাণিত হয়েছিলো সেটি রহিত হয়ে যাবে। আর তখন এই অধিকার ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে কোনো কিছু নেওয়া জায়েজ হবেনা।

দ্বিতীয় উদাহরণ হলো, নির্দিষ্ট সময় পরে স্বামীকে স্ত্রীর কাছে পাওয়ার অধিকারটি স্ত্রীর ক্ষতি প্রতিহত করার জন্য প্রমাণিত। সুতরাং সে যখন তার অধিকার থেকে সরে দাঁড়াবে তখন প্রমাণিত হবে যে, স্বামীকে না পাওয়ার কারণে তার কোনো ক্ষতি হবে না, ফলে তার জন্য এ ধরনের অধিকার থেকে সরে দাঁড়ানোর বিনিময় নেওয়া জায়েজ হবে না।

তৃতীয় উদাহরণ হলো, স্ত্রী নিজে তালাকগ্রহণের অধিকার। তার সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে তার জন্য এ অধিকার রাখা হয়েছে। এখন সে যদি এ কথা বলে যে, আমি স্বামীর কাছে থাকবো এবং স্বামী আমাকে অর্থ দিলে তার বিনিময়ে আমি আমার এ অধিকার বাতিল করবো। তখন বুঝা যাবে যে, স্বামীর সঙ্গে থাকতে তার কোনো সমস্যা নেই। ফলে এ কারণে সে কোনো বিনিময় পাবে না।

চতুর্থ উদাহরণ হলো পুরুষত্বহীন পুরুষের স্ত্রীর জন্য অধিকার আছে যে, তার সমস্যার প্রতিকার হিসেবে সে বৈবাহিক সম্পর্ক বাতিল করবে। সুতরাং সে যদি অর্থের বিনিময়ে ওই স্বামীর সঙ্গে থাকতে রাজি হয়, তাহলে বোঝা যাবে যে, তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ঠিক রাখলে স্ত্রীর কোনো ক্ষতি হবে না। ফলে তার জন্য সে কারণে কোনো বিনিময় নেওয়া জায়েজ হবে না।

হুকুকে আসলিয়া

শরয়ি হকের দ্বিতীয় প্রকার হলো, হুকুকে আসলিয়া (সত্তাগত হক)। সেগুলো হলো এমন হক যা তার অধিকারীর জন্য সত্তাগতভাবে প্রমাণিত। শুধু অধিকারীর ক্ষতি প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে প্রমাণিত নয়। যেমন : কিসাস, স্ত্রীর মাধ্যমে উপকৃত হওয়া বৈবাহিক সম্পর্ক বাকি থাকার কারণে, মিরাস ও অন্যান্য অধিকার।

এ ধরনের স্বত্বের হুকুম হলো, বিক্রয়ের মাধ্যমে তার বিনিময় নেওয়া

জায়েজ নেই। অর্থাৎ এই সুযোগ নেই যে, বিক্রয়ের মাধ্যমে স্বত্বাধিকারী তার স্বত্বকে ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করবে এবং ক্রেতা তার অধিকারী হয়ে যাবে। তাই কোনো নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের জন্য এমনটি করা জায়েজ নেই যে, অন্যের কাছে তাদের কিসাসের স্বত্ব বিক্রি করে দেবে। অর্থাৎ স্বত্বাধিকারীর পরিবর্তে ক্রেতা কিসাস নেওয়ার অধিকারী হবে এমনটা হবে না। অনুরূপভাবে কারও জন্য এমনটি করাও জায়েজ নেই যে, তার স্ত্রী সম্ভোগের হক বা স্বত্বকে অন্যের কাছে বিক্রি করে দেবে, ফলে নতুন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে সম্ভোগ করবে। এমনিভাবে কোনো ওয়ারিসের জন্য অন্যের কাছে তাদের মিরাসের হক বা স্বত্ব বিক্রি করা জায়েজ নেই যে, আসল ওয়ারিসের পরিবর্তে ওই ব্যক্তি মিরাসের অধিকারী হবে। কেননা, শরিয়তের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট গুণের সঙ্গে এ হকগুলি রাখা হয়েছে। তাই যখন সেই গুণাগুণ থাকবে না, তখন হকগুলোও থাকবে না। সুতরাং নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের জন্য শরিয়তের পক্ষ থেকে কিসাসের হক রাখা হয়েছে এই শর্তে যে, তারা নিহত ব্যক্তির অভিভাবক। অতএব যখনই অভিভাবকত্ব থাকবে না, তখনই কিসাসের হক থাকবে না।

অন্যভাবে বললে এ কথা বলতে হয় যে, শরয়ি দৃষ্টিতে এ ধরণের হকগুলো একজন থেকে অন্যের কাছে স্থানান্তর হতে পারে না। ফলে সেটি বিক্রি করা, দান করা কিংবা তার মধ্যে মিরাস জারি করা যায় না। তবে কিসাসের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে মিরাস জারি হওয়া বাস্তবে কোনো মিরাস জারি হওয়া নয়। বরং নিকটতম কোনো ওয়ারিস না থাকার কারণে দূরতম ওয়ারিস মৌলিকভাবে তার মিরাস পাচ্ছে। এভাবে মিরাস পাচ্ছে না যে, নিকটতম ওয়ারিস থেকে দূরতম ওয়ারিসের দিকে সেটি স্থানান্তর হচ্ছে।

এ প্রকৃতির হককে একজন থেকে অন্যের কাছে হস্তান্তরের ব্যাপারে শরিয়ত যেহেতু অনুমতি দেয়নি। সুতরাং বদলা বা বিক্রির পদ্ধতিতে তার বিনিময় নেওয়া জায়েজ নেই। এ হুকুমের উৎস হলো ইবনু উমর রা.-এর হাদিস—

> أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع الولاء وهبته.
>
> 'মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাস বিক্রি ও দান করতে নিষেধ করেছেন।'[৮৪]

---

[৮৪] বুখারি, অধ্যায় : আজাদ করা, পরিচ্ছেদ : দাসের মিরাস বিক্রি করা। মুসলিম, অধ্যায় :

তবে সমঝোতা বা স্বত্বত্যাগের মাধ্যমে এ ধরনের স্বত্বের বিনিময় নেওয়া জায়েজ আছে। অর্থাৎ এ ধরনের স্বত্বাধিকারী তার অধিকার ব্যবহারের কারণে যে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তার থেকে অর্থপ্রাপ্তির বিনিময়ে সে নিজ অধিকার ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে। যেমন : নিহত ব্যক্তির অভিভাবক। সে যখন কিসাস নেওয়ার অধিকারী প্রমাণিত হবে, তখন হত্যাকারী থেকে অর্থের বিনিময়ে সে তার সঙ্গে সমঝোতা করতে পারবে। এই অর্থ হবে তার অধিকার ব্যবহার থেকে বিরত থাকার বিনিময়স্বরূপ। হত্যাকারী তার মৃত্যুর ক্ষতি প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে এই অর্থ ব্যয় করছে। কুরআন, হাদিস এবং আলেমদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এমনটি করা জায়েজ আছে।

আরেকটি হক হলো স্ত্রীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক ঠিক রেখে তাকে উপভোগ করা। তবে স্বামী তার এই অধিকার ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে স্ত্রীর পক্ষ থেকে প্রদেয় অর্থের বিনিময়ে। সেটি হলো খুলা করা এবং অর্থের বিনিময়ে তালাক দেওয়া। কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্য এবং আলেমদের ঐকমত্যে এমনটি করা জায়েজ আছে।

হানাফি ফকিহদের মধ্যে আল্লামা ইবনু বিরি রহ. 'আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ের' কিতাবের ব্যাখ্যায় হুকুকে জরুরিয়া ও হুকুকে আসলিয়ার মধ্যে এই পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। আর আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ. তার আলোচনাকে সংক্ষিপ্ত করে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন—

وحاصله أن ثبوت حق الشفعة للشفيع، وحق القسم للزوجة، وكذلك حق الخيار في النكاح للمخيرة إنما هو لدفع الضرر عن الشفيع والمرأة، وما ثبت لذلك لا يصح الصلح عنه، لأن صاحب الحق لما رضي علم أنه لا يتضرر بذلك، فلا يستحق شيئا. أما حق الموصي له بالخدمة، فليس كذلك، بل ثبت له على وجه البر والصلة، فيكون ثابتا له أصالة، فيصح الصلح عنه إذا نزل عنه لغيره، ومثله ما مر عن الأشباه من حق القصاص والنكاح والرق، حيث صح الاعتياض عنه، لأنه ثابت لصاحبه أصالة، لا على وجه دفع الضرر عن صاحبه.

'সারকথা, শোফা দাবীকারীর জন্য শোফার হক, স্ত্রীর জন্য নির্দিষ্ট সময় পর স্বামীকে কাছে পাওয়া, তালাক গ্রহণের অনুমতিপ্রাপ্তা স্ত্রীর

আজাদ করা, পরিচ্ছেদ : দাসের মিরাস বিক্রি করা।

তালাক কার্যকর করার অধিকার। এগুলোকে শোফা দাবীকারী বা স্ত্রীর সমস্যা দূর করার উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছে। এ ধরনের যেসব হক রয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে সমঝোতা করা জায়েজ নেই। কেননা, হকের অধিকারী যখন সমঝোতা করতে রাজি হবে, তখন বোঝা যাবে যে, এ হক না থাকলে তার কোনো ক্ষতি হবে না। ফলে সে কোনো কিছুই পাবে না। তবে যে ব্যক্তির জন্য সেবা করার ওসিয়ত করা হয়েছে তার হকটি এমন নয়। বরং সেটি সৌজন্য ও সৌহার্দের ভিত্তিতে প্রমাণিত। ফলে সত্তাগতভাবে সেটি প্রমাণিত। অতএব অন্যের জন্য সেটি ছেড়ে দিলে তার বিনিময় নেওয়া যাবে।

আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ের গ্রন্থে বর্ণিত অনুরূপ আরও হক হলো কিসাসের হক, বিবাহ বহাল রাখার হক, দাস আজাদের হক। এ সমস্ত হকের ক্ষেত্রে বিনিময় নেওয়া বৈধ আছে। কারণ, এ হকসমূহ তার অধিকারীর জন্য সত্তাগতভাবেই প্রমাণিত। কোনো ক্ষতি প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে এগুলো প্রমাণিত হয়নি।'[৮৫]

তবে সমঝোতার ভিত্তিতে এ ধরনের হকের বিনিময় নেওয়া তখন জায়েজ আছে, যখন সেগুলো বিদ্যমান থাকবে। তবে হকগুলো যদি ভবিষ্যতের সম্ভাব্য হক হয়, বর্তমানে বিদ্যমান না থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে তার বিনিময় নেওয়া জায়েজ নেই। বিক্রি বা সমঝোতা, যেভাবেই বিনিময় নেওয়া হোক না কেন। যেমন : যার মিরাস পাবে, সে জীবিত থাকা অবস্থায় তার মিরাসের বিনিময় নিয়ে মিরাস ছেড়ে দেওয়া জায়েজ নেই। কেননা, যার মিরাস পাবে তার জীবদ্দশায় হকটি বিদ্যমান হচ্ছে না। এটি এমন এক সম্ভাবনাময় হক, যা হওয়া না হওয়ার সমান সম্ভাবনাই রয়েছে। যার মিরাস পাবে তার মৃত্যুর পরই কেবল হকটি স্থির বা বিদ্যমান হবে। অনুরূপভাবে গোলাম জীবিত থাকাবস্থায় মালিকের মিরাসের হকটি বিদ্যমান নয়। বরং গোলামের মৃত্যুর পরই সেটি অস্তিত্বে আসবে। সুতরাং গোলামের মৃত্যুর আগেই অর্থের বিনিময়ে স্বত্বত্যাগ বৈধ নয়। তবে যার মিরাস পাবে তার বা গোলামের মৃত্যুর পর হকটি পূর্ণাঙ্গরূপে তার পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্যে চলে যাবে। তখন মিরাসের বণ্টন অনুসারে প্রাপ্ত অংকের স্বত্বত্যাগ বা বিক্রয় বৈধ হবে।

---

[৮৫] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫৩০।

দ্বিতীয় আলোচনা : প্রচলিত হক

হক-এর দ্বিতীয় প্রকারকে আমরা প্রচলিত তথা হুকুকে উরফিয়া বলতে পারি। প্রচলিত স্বত্ব বলতে এমন সব বৈধ হক বোঝানো হচ্ছে, যেগুলো সামাজিক প্রচলন ও নিয়মের ভিত্তিতে তার মালিকের জন্য সাব্যস্ত। এ হকগুলো এভাবে শরিয়তসম্মত যে, সামাজিক প্রচলন ও মানুষের ব্যবহারের কারণে শরিয়ত সেটিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে তার আসল উৎস হলো, সামাজিক প্রচলন, শরিয়ত নয়। যেমন : রাস্তায় চলাচলের হক, পানি গ্রহণের হক, পানি প্রবাহিত করার হক ও অন্যান্য হক।

হুকুকে উরফিয়া বা সামাজিক স্বত্বের প্রকার

কোনো বস্তু থেকে উপকৃত হওয়ার হক

এ ধরণের স্বত্ব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কোনো স্থায়ী জিনিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সুবিধা লাভ করার অধিকার। উপকৃত হওয়াটি যদি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত হয়, তাহলে ইজারার মাধ্যমে তার বিনিময় নেওয়া জায়েজ আছে। আর তখন তার ওপর ইজারার বিধিবিধান প্রযোজ্য হবে। যেমন : নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কোনো বাড়ি ব্যবহার করা। বাড়ির মালিকের জন্য এ পদ্ধতিতে তার বিনিময় নেওয়া জায়েজ আছে যে, নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সেটিকে ভাড়া দেবে।

আর মালিক যদি তার এই উপকারকে স্থায়ীভাবে অন্যের কাছে হস্তান্তর করতে চায়, তাহলে সেটি হবে ওই উপকারকে বিক্রি করে দেওয়া। হানাফি মাজহাবের ফকিহগণ এ মাসআলাকে নিরেট স্বত্ব বিক্রি করা নামেও বর্ণনা করেছেন। এ ধরনের স্বত্ব বিক্রি করা জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে ফকিহদের দৃষ্টিভঙ্গির মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। তাদের অনেকে শর্তহীনভাবে এ ধরনের বিক্রিকে জায়েজ বলেছেন। আর অনেকে শর্তহীনভাবে নাজায়েজ বলেছেন। আবার অনেকে কিছু হকের বিক্রিকে জায়েজ বলেছেন, আর কিছু হকের বিক্রিকে নাজায়েজ বলেছেন। ফকিহগণ এ প্রকৃতির হকের যেসব প্রকার উল্লেখ করেছেন পর্যায়ক্রমে সেগুলো বর্ণনা করার ইচ্ছে করছি। সেইসঙ্গে সে সম্পর্কে তারা কী বলেছেন সেটি উল্লেখ করবো। এরপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিকে যাবো ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহই সঠিক বিষয়ের তাওফিকদাতা।

বিভিন্ন ধরনের হক

ফকিহগণ এ প্রকৃতির যেসব হকের আলোচনা করেছেন সেগুলোর তালিকা—

- রাস্তায় চলার হক।
- ওপর তলা বিক্রির হক।
- পানি প্রবাহিত করার হক।
- পানির নালার হক।
- দেওয়ালের ওপর কাঠ রাখার হক।
- গেট করার হক।

হানাফি মাজহাবের ফকিহদের প্রসিদ্ধ অভিমত হলো, এগুলো হুকুকে মুজাররদা (নিরেট স্বত্ব)। এগুলো বিক্রি করা জায়েজ নেই। তবে অন্যান্য তিন মাজহাবের ফিকহি কিতাবে এ হকগুলোর অধিকাংশের বিনিময় নেওয়া জায়েজের কথা প্রসিদ্ধ আছে।

বিক্রয়ের সংজ্ঞা

এ মতানৈক্যের মূল কারণ হলো বিক্রয়ের সংজ্ঞা। সুতরাং যারা বিক্রয়ের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন যে, মালের বিনিময়ে মালের লেনদেন করা। এবং মাল হচ্ছে তাদের মতে এমন কিছু যা দৃশ্যমান ও বাহ্যিকভাবে অনুভব সম্ভব। তারা হুকুকে মুজার্‌রাদা (নিরেট স্বত্ব) বিক্রিকে নিষিদ্ধ বলেছেন। কেননা, সেগুলো কোনো সম্পদ বা মাল নয়। আর যারা বিক্রয়ের সংজ্ঞাকে এতটা ব্যাপক রেখেছেন যে, যার মধ্যে উপকারিতা বিক্রির বিষয়টিও রয়েছে তারা এ সকল হকের বিক্রিকে জায়েজ বলেছেন।

এসকল ক্ষেত্রে তিন ইমামের মাজহাব

শাফিয়ি মাজহাব

শাফিয়ি মাজহাবে বিক্রয়ের সংজ্ঞা উপকারিতাকে স্থায়ীভাবে বিক্রি করাকেও অন্তর্ভুক্ত করে। আল্লামা ইবনু হাজার হাইতামি রহ. এভাবে বিক্রয়ের সংজ্ঞা দিয়েছেন—

عقد يتضمن مقابلة مال بمال بشرطه الآتي لاستفادة ملك عين أو منفعة مؤبدة.

'বিক্রয় এমন একটি চুক্তি, যেখানে মালের আদানপ্রদান রয়েছে তার শর্তসাপেক্ষে। এবং উদ্দেশ্য থাকে সম্পদের মালিকানা বা তার উপকারিতার স্থায়ী মালিকানা লাভ।'

আল্লামা শারওয়ানি রহ. ইবনু হাজার হাইতামি রহ.-এর 'স্থায়ী' শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন—

قوله (مؤبدة) كحق المر إذا عقد عليه بلفظ البيع.

'তার বক্তব্য 'স্থায়ী' যেমন : রাস্তায় চলার হক। যখন বিক্রয়ের শব্দে সেটির চুক্তি করবে।'[৮৬]

আল্লামা খতিব শিরবিনি রহ. বলেন—

وحده بعضهم بأنه عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد ، فدخل بيع حق المر ونحوه ، وخرجت الإجارة بقيد التأقيت فإنها ليست بيعا.

'কোনো কোনো ফকিহ এভাবে বিক্রয়ের সংজ্ঞা দিয়েছেন যে, বিক্রয় হলো একটি আর্থিক বিনিময় চুক্তি, যার মাধ্যমে কোনো বস্তু বা উপকারিতার স্থায়ী মালিকানা অর্জিত হয়। ফলে রাস্তায় চলাচলের হক বা অনুরূপ হক এ সংজ্ঞার অধীনে রয়েছে। আর ইজারা সাময়িক হওয়ার কারণে তা বিক্রয়ের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে না।'[৮৭]

আল্লামা ইবনু কাসেম গাজ্জি রহ. আবু শুজা-এর বক্তব্যের ব্যাখ্যায় বলেন—

فأحسن ما قيل في تعريفه أنه تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي ، أو تمليك منفعة مباحة على التأبيد بثمن مالي ... ودخل في منفعة تمليك حق البناء.

'বিক্রয়ের সর্বোত্তম সংজ্ঞা হলো, শরয়ি পদ্ধতিতে কোনো মূল্যমান

[৮৬] হাওয়াশি শারওয়ানি আলা তোহফাতিল মোহতাজ, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২১৫। উরফুর রমালি ফি নেহায়াতিল মোহতাজ, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৬১।

[৮৭] মুগনিল মোহতাজ, আল্লামা শিরবিনি রহ.-এর রচিত, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩।

জিনিসের মালিক বানানো। অথবা মূল্যের বিনিময়ে কোনো বৈধ উপকারিতার স্থায়ী মালিক বানানো। উপকারিতার মধ্যে বাড়ি নির্মাণের হকের মালিক বানানো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।'

আল্লামা বাজুরি রহ. ইবনু কাসেম গাজ্জি রহ.-এর বক্তব্য উল্লেখপূর্বক বলেন—

قوله ودخل في منفعة إلخ ، إنما قال : دخل إلخ ، لأن المنفعة تشتمل حق الممر ، ووضع الأخشاب على الجدار ... ولا بد من تقدير مضاف في كلامه بأن يقال : ودخل في تمليك منفعة ، ليناسب قوله (تمليك حق البناء) . وصورة ذلك أن يقول له : بعتك حق البناء على هذا السطح مثلا بكذا ، والمراد بالحق الاستحقاق.

'তিনি 'উপকারিতার মধ্যে' ... এ কারণে বলেছেন যে, উপকারিতার মধ্যে রাস্তায় চলাচল করা এবং দেওয়ালের ওপর কাঠ রাখার হক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তার বক্তব্যের মধ্যে একটি 'মুজাফ' উহ্য মানা আবশ্যক। অর্থাৎ উহ্য বক্তব্যটি এরূপ হবে, 'উপকারিতার মালিক বানানোর মধ্যে'। যেন 'বাড়ি নির্মাণের মালিক বানানো' কথার সঙ্গে এটির মিল থাকে। বাড়ি নির্মাণস্বত্বের মালিক বানানোর পদ্ধতি এমন হবে যে, কেউ বললো, এই ছাদের ওপর এত অর্থের বিনিময়ে তোমার কাছে বাড়ি নির্মাণের অধিকার বিক্রি করলাম। অধিকার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তাকে স্বত্বের অধিকারী বানানো।'[৮৮]

আল্লামা শাতেরি রহ. 'ইয়াকুতুন নাফিস' কিতাবে এভাবে ওই কথার সারাংশ বর্ণনা করেছেন—

البيع لغة : مقابلة شيء بشيء ، وشرعا : عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين ، أو منفعة على التأبيد ، كما في بيع حق الممر ، ووضع الأخشاب على الجدار ، وحق البناء على السطح.

'বিক্রয়ের শাব্দিক অর্থ হলো, কোনো জিনিসের বিনিময়ে অন্য জিনিস বদলানো। পারিভাষিক অর্থ হলো, সম্পদ আদান-প্রদানের এমন চুক্তি যেটির মাধ্যমে কোনো জিনিস বা উপকারিতার স্থায়ী মালিকানা

---

[৮৮] হাশিয়ায়ে বাজুরি আলা শরহিল গজি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৪০।

অর্জন হয়। যেমন : রাস্তায় চলাচলের হক, দেওয়ালের ওপর কাঠ রাখার হক ও ছাদের ওপর বাড়ি নির্মাণের হক।'[৮৯]

উল্লিখিত ফিকহি বক্তব্য থেকে এটি প্রমাণিত হলো যে, শাফিয়ি মাজহাবের আলেমদের কাছে স্থায়ী উপকারিতা মাল হিসেবে গণ্য। সেটির ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ আছে।

হাম্বালি মাজহাব

হাম্বালি মাজহাবের আলেমগণের কাছেও বিক্রয়ের সংজ্ঞা শাফিয়ি মাজহাবের মতো। আল্লামা বুহুতি রহ.-এর বর্ণনা অনুযায়ী তাদের কাছে বিক্রয়ের সংজ্ঞা হলো—

مبادلة عين مالية ... أو منفعة مباحة مطلقا ، بأن لا تختص إباحتها بحال دون آخر كممر دار أو بقعة تحفر بئرا ، بأحدهما ، أي عين مالية أو منفعة مباحة مطلقا ... فيشمل نحو بيع كتاب بكتاب أو بممر دار ، أو بيع نحو ممر في دار بكتاب ، أو ممر في دار أخري.

'দৃশ্যমান সম্পদের আদান-প্রদান ও বৈধ সাধারণ সুযোগ-সুবিধার লেনদেনকে ক্রয়-বিক্রয় বলা হয়। এই ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতা সবসময়।'

যেমন : বাড়ি থেকে বের হওয়ার রাস্তা বা জমিনের সে অংশ যেখানে কূপ খনন করা হয়। এ দুটির মধ্যে কোনো একটিকে অন্যের সঙ্গে পরিবর্তন করা বৈধ হবে। অর্থাৎ দৃশ্যমান কোনো জিনিসের বিনিময়ে বৈধ উপকারিতার ক্রয়-বিক্রয়। সুতরাং এ সংজ্ঞার মধ্যে সেসকল পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, যেখানে কিতাবের বিনিময়ে বা বাড়ির রাস্তার বিনিময়ে কিতাব বিক্রি করা হয়। বাড়ির রাস্তাকে কিতাবের বিনিময়ে বা অনুরূপ কোনো বাড়ির রাস্তার বিনিময়ে বিক্রি করাও এ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হবে।'[৯০]

---

[৮৯] আল-ইয়াকুতুন নাফিস ফি মাজহাবি ইবনু ইদরিস, প. ৭৪। আল-গয়াতুল কুসওয়া, আল্লামা বাইজবি রহ.-এর রচিত, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৫৫। ফাতহুল জাওয়াদ আলা মতানিল ইরশাদ, আল্লামা ইবনু হাজার রহ.-এর রচিত, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৭৩।

[৯০] শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৪০।

আল্লামা মারদাবি রহ. 'আল-ইনসাফ' কিতাবে বিক্রয়ের একাধিক সংজ্ঞা উল্লেখ করে তার অধিকাংশের সমালোচনা করার পর বলেন—

وقال في الوجيز: هو عبارة عن تمليك عين مالية، أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالى». ويرد عليه أيضا: الربا والقرض، وبالجملة: قل أن يسلم حد. قلت: لو قيل: «هو مبادلة عين أو منفعة مباحة مطلقا، بأحدهما كذلك على التأبيد فيهما، بغير ربا ولا قرض»، لسلم.

'আল-ওয়াজিজ কিতাবে লিখেছেন, বিক্রয় হলো কোনো দৃশ্যমান জিনিস বা বৈধ উপকারিতাকে স্থায়ীভাবে কোনো মূল্যবান জিনিসের বিনিময়ে লেনদেন করা। ঋণ ও সুদের মাধ্যমে এ সংজ্ঞার ওপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। সারকথা, খুব কম সংজ্ঞা প্রশ্নমুক্ত রয়েছে। আমি বলি, যদি এভাবে সংজ্ঞা দেওয়া হয় যে, বিক্রয় বলা হয় কোনো বস্তু বা শর্তহীন বৈধ উপকারিতাকে ঋণ ও সুদ ছাড়া অন্য কোনো বস্তু বা শর্তহীন বৈধ উপকারিতার বিনিময়ে স্থায়ী মালিক বানিয়ে দেওয়া, তাহলে এ সংজ্ঞা প্রশ্নমুক্ত থাকবে।'[৯১]

আল্লামা বুহুতি রহ. 'কাশশাফুল কেনা' কিতাবে লেখেন—

ويصح أن يشتري ممرا في ملك غيره دارا كان أو غيرها وأن يشتري موضعا في حائط يفتحه بابا وأن يشتري بقعة في أرض يحفرها بئرا، بشرط كون ذلك معلوما، لأن ذلك نفع مقصود، فجاز بيعه كالدور ويصح أيضا أن يشتري علو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا، أو ليضع عليه خشبا موصوفا، لأنه ملك البائع، فجاز بيعه كالأرض، معني «موصوفا» أي معلوما ... وكذا لو كان البيت الذي اشتري علوه غير مبني إذا وصف العلو والسفل ليكون معلوما، وإنما صح لأنه ملك للبائع، فكان له الاعتياض عنه ويصح فعل ذلك أي ما ذكر من اتخاذ ممر في ملك غيره، أو موضوع في حائطه يفتحه بابا، أو بقعة في أرضه يحفرها بئرا، أو علو بيت يبني عليه بنيانا، أو يضع عليه خشبا معلومين صلحا أبدا أي مؤبدا، وهو في معني البيع ... ومتي زال البنيان أو الخشب(فله إعادته) لأنه استحق إبقاءه بعوض (سواء زال

[৯১] আল-ইনসাফ ফি মারেফাতির রাজেহ মিনাল খিলাফ, আল্লামা মারদাবি রহ.-এর রচিত, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৬০।

لسقوطه) أي سقوط البنيان أو الخشب (أو) زال (لسقوط الحائط) الذي استأجره لذلك أو زال لغير ذلك كهدمه إياه ... وله أي لرب البيت الصلح على زواله أي إزالة العلو عن بيته أو الصلح بعد انهدامه على عدم عوده سواء كان ما صالحه به مثل العوض الذي صولح به على وضعه أو أقل أو أكثر ، لأن هذا عوض عن المنفعة المستحقة له ، فيصح بما اتفقا عليه.

‘অন্য কারও মালিকানাধীন চলার রাস্তা ক্রয় করা জায়েজ আছে। সেটি বাড়ি হোক বা অন্যকিছু হোক। অনুরূপভাবে গেট করার জন্য অন্যের দেওয়ালের নির্দিষ্ট জায়গা ক্রয় করা বা কূপ খননের জন্য একটি জমির নির্দিষ্ট অংশ ক্রয় করা জায়েজ আছে। তবে তার জন্য শর্ত হলো, স্থানটি নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত হতে হবে। কেননা, স্থানটি চিহ্নিত ও নির্দিষ্ট হওয়া উপকারিতার অন্তর্ভুক্ত। এটি একটি কাঙ্ক্ষিত উপকারিতা। ফলে সেটি বিক্রি করা জায়েজ হবে। যেমন : নির্দিষ্ট গুণের কামরা তৈরি করার জন্য কোনো বাড়ির উপরের অংশ ক্রয় করা জায়েজ আছে। অথবা তার ওপর নির্দিষ্ট গুণের কাঠ রাখার জন্য উপরের অংশ ক্রয় করা জায়েজ। কারণ, সেটি বিক্রেতার মালিকানাধীন। ফলে জমির মতো সেটিও বিক্রি করা জায়েজ আছে। গুণ দ্বারা উদ্দেশ্য সেটি নির্দিষ্টভাবে জানা থাকবে। অনুরূপভাবে সে বাড়ির উপরের অংশ ক্রয় করা জায়েজ আছে, যা এখনো নির্মাণ করা হয়নি। তবে নির্দিষ্ট করার স্বার্থে তার ওপর ও নিচের অংশের স্পষ্ট বর্ণনা থাকতে হবে। এমন বিক্রি জায়েজ হওয়ার কারণ হলো, সেটি বিক্রেতার মালিকানাধীন। তাই সে তার বিনিময় নিতে পারবে। একইভাবে স্থায়ী চুক্তির ভিত্তিতে এ ধরনের বিক্রয় জায়েজ আছে। অর্থাৎ অন্যের মালিকানাধীন জায়গায় রাস্তা বানানো, দেওয়ালের ওপর কাঠ রাখার অধিকার, অন্যের দেওয়ালে গেট করার জায়গা, কূপ খননের জন্য অন্যের জমির একটি অংশ ক্রয়, কামরা তৈরির জন্য অন্যের বাড়ির উপরের অংশ ক্রয় বা তার ওপর কোনো কাঠ রাখার জন্য স্থায়ী অধিকার ক্রয় করা জায়েজ আছে। তবে এসব নির্দিষ্ট হতে হবে। আর যখন বাড়ি বা কাঠ ভেঙে পড়বে, তখন দ্বিতীয়বার সে পুনঃনির্মাণ করতে পারবে। কারণ, বিনিময়ের মাধ্যমে সে ওইগুলো রাখার অধিকারী হয়েছে। চাই সেটি নির্মিত কামরা বা

কাঠ ভেঙে যাওয়ার কারণে বা যে বাড়ি বা দেওয়াল ভাড়া নিয়েছে সেটি ভেঙে যাওয়ার কারণে অথবা অন্য কোনো কারণে ভেঙে যাক। যেমন : সেটি ধসে গেলো। তখন বাড়ির মালিকের জন্য বৈধ আছে যে, উপরের অংশটি সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে বা একবার ধসে পড়ার পর দ্বিতীয়বার সেটি নির্মাণ না করার ব্যাপারে সমঝোতা করা। চাই দ্বিতীয় চুক্তির মূল্যটি আগের সমপরিমাণ হোক বা তার চেয়ে কমবেশি হোক। কারণ, এটি হলো তার অধিকারভুক্ত হকের বিনিময়। সুতরাং তারা যে মূল্যের ওপর একমত হবে সেটিতে চুক্তি করা সহিহ হবে।'[৯২]

আল্লামা ইবনু কুদামা রহ. বলেন—

ولا يجوز أن يبني دكانا، ولا يخرج روشنا ولا ساباطا على درب غير نافذ إلا بإذن أهله ... وإن صالح أهل الدرب من ذلك على عوض معلوم جاز. وقال القاضي وأصحاب الشافعي: لا يجوز، لأنه بيع للهواء دون القرار، ولنا أنه يبني فيه بإذنهم، فجاز، كما لو أذنوا له بغير عوض، ولأنه ملك لهم، فجاز لهم أخذ عوضه كالقرار.

إذا ثبت هذا، فإنما يجوز بشرط كون ما يخرجه معلوم المقدار في الخروج والعلو. وهكذا الحكم فيما إذا أخرجه إلى ملك إنسان معين لا يجوز بغير إذنه، ويجوز بإذنه بعوض وبغيره إذا كان معلوم المقدار.

'যে গলির বিপরীত দিক থেকে বের হওয়ার পথ নেই, সে গলির লোকদের অনুমতি ছাড়া সেখানে দোকান, আলো জ্বালানোর স্থান বা বসার স্থান তৈরি করা জায়েজ নেই। তবে কেউ যদি ওই গলির প্রতিবেশিদের সঙ্গে নির্দিষ্ট বিনিময়ে চুক্তি করে নেয়, তাহলে সেটি জায়েজ আছে। আল্লামা কাজি ও শাফিয়ি মাজহাবের ইমামগণ বলেন, এমন চুক্তি করা জায়েজ নেই। কেননা, এ ক্ষেত্রে শূন্যস্থান বিক্রি করা হচ্ছে। জমি বিক্রি করা হচ্ছে না। আমাদের সপক্ষে দলিল হলো, সে যেহেতু গলির লোকদের অনুমতি নিয়ে এগুলো তৈরি করছে। তাই সেটি জায়েজ হবে। যেমন কোনো বিনিময় ছাড়া তারা অনুমতি দিলে জায়েজ হতো। আর এটি যেহেতু তাদের মালিকানাধীন, তাই তাদের

[৯২] কাশশাফুল কেনা, আল্লামা বুহুতি রহ.-এর রচিত, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৯১-৩৯২। (১৩৯৪ হিজরি সনে মক্কা থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)

জন্য সেটির বিনিময় নেওয়া জায়েজ আছে। যেমন : জমির বিনিময় নেওয়া জায়েজ আছে।

এ বিষয়টি যখন প্রমাণিত হলো, (তখন বলা যায় যে,) চলাচলস্বত্ব ও বাড়ির ছাদ ব্যবহারের অধিকারের ব্যাপারে যেখানে নির্দিষ্টতা পাওয়া যাবে, সেখানে লেনদেন জায়েজ আছে। অনুরূপভাবে যখন কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির মালিকানায় এমন কোনো স্বত্ব থাকবে, তার ক্ষেত্রেও একই হুকুম হবে। তার অনুমতি ছাড়া সেখানে কিছু তৈরি করা জায়েজ হবে না। আর যদি পরিমাণটি নির্দিষ্ট হয়, তাহলে বিনিময় দিয়ে বা বিনিময় ছাড়া তার অনুমতিক্রমে সেখানে যে-কোনো কিছু তৈরি করা জায়েজ আছে।'

আল্লামা ইবনু কুদামা রহ. আরও বলেন—

ولا يجوز أن يفتح في الحائط المشترك طاقا ولا بابا إلا بإذن شريكه ، لأن ذلك انتفاع بملك غيره ، وتصرف فيه بما يضر به ، ولا يجوز أن يغرز فيه وتدا ، ولا يحدث عليه حائطا ، ولا يستره ، ولا يتصرف فيه نوع تصرف ، لأنه تصرف في الحائط بما يضر به ، فلم يجز كنقضه ، ولا يجوز له فعل شيء من ذلك في حائط جاره بطريق الأولي ، لأنه إذا لم يجز فيما له فيه حق ، ففيما لا حق له فيه أولى، وإن صالحه عن ذلك بعوض جاز

'অংশীদারের জন্য কোনো দেওয়ালে শরিকের অনুমতি ছাড়া মেহরাব বা গেট করা জায়েজ নেই। কারণ, সেটি অন্যের মালিকানা থেকে উপকৃত হওয়ার নামান্তর। আর এতে তার ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। সেখানে কোনো পেরেক ঢুকানো, তার ওপর দেওয়াল দেওয়া, সেটি ঢেকে রাখা বা অনুরূপ কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করা জায়েজ নেই। কেননা, এটা এমন এক ধরনের হস্তক্ষেপ, যা দেওয়ালের জন্য ক্ষতিকর। অতএব, শরিকানা দেওয়াল ভেঙে ফেলা যেমন নাজায়েজ; এটাও তেমন নাজায়েজ। অনুরূপভাবে নিজ প্রতিবেশির দেওয়ালে এ ধরনের কাজ করা তো অবশ্যই নাজায়েজ। কেননা, যেখানে তার অধিকার ছিলো সেখানে যখন জায়েজ হলো না, তখন যেখানে তার অধিকার নেই সেখানে জায়েজ না হওয়ার ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট। তবে

কোনো বিনিময়ের মাধ্যমে যদি চুক্তি করে নেয়, তাহলে এমনটি করা জায়েজ হবে।'[৯৩]

তিনি আরও বলেন—

« ولا يجوز أن يحفر في الطريق النافذة بئرا لنفسه ، سواء جعلها لماء المطر أو ليستخرج منها ما ينتفع به ولا غير ذلك ... ولو صالح أهل الدرب عن ذلك بعوض جاز

'চলাচলের রাস্তায় ব্যক্তিগত কূপ খনন করা জায়েজ নেই। চাই সেটি বৃষ্টির পানি জমিয়ে রাখার জন্য হোক বা প্রয়োজন পূরণের জন্য পানি নেওয়ার উদ্দেশ্যে অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে হোক। তবে রাস্তার প্রতিবেশিদের সঙ্গে কোনো বিনিময়ের মাধ্যমে খননের অনুমতি নিলে জায়েজ আছে।'[৯৪]

মালিকি মাজহাব

মালিকি মাজহাবে বিক্রয়ের প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা যাকে আল্লামা ইবনু আরাফা রহ.-এর প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়। সে সংজ্ঞাটি এরূপ—

عقد معاوضة على غير منافع ، ولا متعة لذة

'বিক্রয় হলো এমন একটি বিনিময় চুক্তি, যেটি শুধু উপকারিতা নয় এবং উপভোগের বিষয়ও নয় এমন ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়।'[৯৫]

উপকারিতার বিষয়টি থাকার কারণে বিক্রয়ের এ সংজ্ঞা থেকে ইজারা ও ভাড়াচুক্তি বেরিয়ে গেলো। আর উপভোগের বিষয় হওয়ার কারণে বিয়ের চুক্তিও অন্তর্ভুক্ত হবে না। এ সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট হয় যে, মালিকি মাজহাবের আলেমদের কাছে ধাতব বস্তুর মধ্যে বিক্রয়চুক্তি সীমাবদ্ধ। তাদের অভিমত অনুযায়ী কোনো স্বত্ব বা উপকারিতার ওপর বিক্রয়চুক্তি হবে না।

---

[৯৩] আল-মুগনি, আল্লামা ইবনু কুদামা রাহ.-এর রচিত, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩৬।

[৯৪] আল-মুগনি, আল্লামা ইবনু কুদামা রাহ.-এর রচিত, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩৬।

[৯৫] হাশিয়াতুদ দুসুকি আলা শরহিল কাবির, আল্লামা দারদির রহ.-এর রচিত, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২। জুরকানি আলা মুখতাসারিল খলিল, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১২, খিরাশি আলা মুখতাসারি খলিল, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৪, মাওয়াহিবুল জালিল, আল্লামা হাত্তাব রহ.-এর রচিত, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২২৫। মানহুল জালিল, শায়খ মুহাম্মাদ উলাইশ রহ.-এর রচিত, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৬০।

তবে সংজ্ঞার বিপরীতে তাদের পক্ষ থেকে এমন কিছু বিক্রয়ের বৈধতার মতামত পাওয়া যায়, যেগুলো স্বত্ব ও উপকারিতার বিক্রয়। যেমন : তাদের কাছে বাড়ির উপরে কামরা নির্মাণ ও দেওয়ালের ওপর কাঠ রাখার স্বত্ব বিক্রি করা জায়েজ আছে। আল্লামা দারদির রহ. শরহুল কাবির কিতাবে বলেন—

(وجاز) بيع (هواء) بالمد ، أي فضاء ، (فوق هواء) بأن يقول شخص لصاحب أرض : يعني عشرة أذرع مثلا ما تبينه بأرضك (إن وصف البناء) الأسفل والأعلى لفظا أو عادة ، للخروج من الجهالة والغرر ، ويملك الأعلى جميع الهواء الذي فوق بناء الأسفل ، ولكن ليس له أن يبني ما دخل عليه إلا برضا الأسفل ... (و) جاز عقد على (غرز جذع) أي جنسيه فيشمل المتعدد (في حائط) لآخر بيعا أو إجارة . وخرق موضوع الجذع على المشتري أو المكتري

'শূন্যের ওপর শূন্য জায়গা বিক্রি করা জায়েজ আছে। যেমন : কেউ কোনো জমির মালিককে বললো, তোমার জমির ওপর যে বাড়ি তৈরি করবে, আমার কাছে তার উপরের দশহাত জায়গা বিক্রি করো। তবে তার জন্য শর্ত হলো, শব্দ বা সামাজিক প্রচলনের মাধ্যমে নিচের বাড়ি ও উপরের কামরার পূর্ণাঙ্গ গুণাবলি নির্দিষ্ট করতে হবে। অস্পষ্টতার কারণে যেন কোনো ধরনের ধোঁকার সুযোগ না থাকে। উপরের ক্রেতা নিচের বাড়ির উপরের সব শূন্য জায়গার মালিক হবে। তবে উপরের মালিকের জন্য নিচের মালিকের সন্তুষ্টির বাইরে কোনো কিছু নির্মাণ করা জায়েজ নেই। বিক্রয় বা ইজারার ভিত্তিতে কারও দেওয়ালের ওপর কাঠ রাখা বা গেঁথে দেওয়ার অনুমতি নেওয়া জায়েজ আছে। ক্রেতা বা ইজারাগ্রহীতার জন্য কাঠ রাখার স্থানটি কাটা বা ভাঙার অনুমতি আছে।'[৯৬]

আল্লামা হাত্তাব রহ. এ মাসআলাটি বর্ণনা করার পর বলেন—

ولا يجوز لمبتاع الهواء بيع ما على سقفه إلا بإذن البائع لأن الثقل على حائطه ... ويفهم منه أنه ملك ما فوق بنائه من الهواء ، إلا أنه لا يتصرف فيه لحق البائع في الثقل

[৯৬] হাশিয়াতুদ দুসুকি আলা শরহিল কাবির, আল্লামা দারদির রহ.-এর রচিত, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৪। মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৫১।

'উপরের শূন্য জায়গার ক্রেতার জন্য এমনটি করা জায়েজ নেই যে, বিক্রেতার অনুমতি ছাড়া ক্রেতা তার ছাদের উপরের শূন্য জায়গাকে অন্যের কাছে বিক্রি করে দেবে। কারণ, উপরের ভার নিচের মালিকের দেওয়ালের ওপর পড়বে। এখান থেকে বোঝা যায় যে, বাড়ির উপরের জায়গার ক্রেতা তার উপরের শূন্য জায়গার মালিক হয়ে যায়। তবে দেওয়ালের ভারের বিষয়টি বিক্রেতার অধিকারে থাকার কারণে ক্রেতা সেখানে কোনো কিছু করতে পারছে না।'[৯৭]

আল্লামা মাওয়াক রহ. এ বক্তব্যের ওপর আরও একটু বাড়িয়ে বলেন—

يجوز في قول مالك شراء طريق في دار رجل ، وموضع جذوع من حائط يحملها عليه إذا وصفها

'ইমাম মালিক রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী কারও মালিকানাধীন বাড়িতে থাকা রাস্তা বা দেওয়ালের ওপর কাঠ রাখার অধিকার ক্রয় করা জায়েজ আছে। তবে তার জন্য শর্ত হলো, উভয়টি নির্দিষ্ট হতে হবে।'[৯৮]

ইমাম মালিক রহ.-এর 'মুদাওয়ানাতুল কুবরা'র বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, তার কাছে পানি প্রবাহের অধিকার বিক্রি করা জায়েজ আছে। মুদাওয়ানাতুল কুবরা কিতাবে বর্ণিত হয়েছে—

قلت : بعت شرب يوم ، أيجوز هذا أم لا ؟ قال : مالك : هو جائز . قلت : فإن بعت حظي بعت أصله من الشرب ، وإنما مالى فيه يوم من اثني عشر يوما ، أيجوز في قول مالك ؟ قال : نعم ، قلت : فإن لم أبع أصله ، ولكن جعلت أبيع منه السقي ، إذا جاء يومي بعت ما صار لى من الماء ممن يسقي به ، أيجوز هذا في قول مالك ، قال : نعم

'আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? আমি যদি একদিনের পানি প্রবাহের অধিকার বিক্রি করি, তাহলে সেটি জায়েজ হবে কি না? উত্তরে তিনি বললেন, সেটি জায়েজ হবে। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলাম, আমি যদি আমার অংশকে একেবারে বিক্রি করে দিই। আর সেখান থেকে বারোদিন পর আমি একদিন পানি নিতে

[৯৭] মাওয়াহিবুল জালিল, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৭৬।

[৯৮] আত-তাজ ওয়াল ইকলিল, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৭৫। মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৫০।

পারবো। মালিক রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী কি সেটি জায়েজ হবে, উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, আমি প্রকৃত হকটি বিক্রি না করে শুধু পানি প্রবাহের অধিকার বিক্রি করি, যেদিন আমার পানি নেওয়ার পালা আসবে, সে দিন আমার অধিকারকে যে ব্যক্তি পানি নিতে আগ্রহী তার কাছে বিক্রি করে দিলাম। ইমাম মালিক রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী সেটি কি জায়েজ হবে? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ।'[৯৯]

এ সব ফিকহি বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, মালিকি মাজহাবে উল্লিখিত হকগুলো বিক্রি করা জায়েজ আছে। এই সকল ফিকহি বক্তব্যকে এই সকল হকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বস্তুর বিক্রির ওপর প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কেননা, এ মাসআলাতে পানি বিক্রয় ও পানি নেওয়ার পালা বিক্রয়কে ভিন্ন করা হয়েছে এবং ভিন্নভাবে প্রত্যেকটির বিক্রয় জায়েজের হুকুম দেওয়া হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে, 'পানি নেওয়ার পালা বিক্রয় করা' নিরেট স্বত্ব বিক্রয় ছাড়া আর কিছুই নয়। তাছাড়া কামরা নির্মাণের উদ্দেশ্য ছাড়া শুধু শূন্য জায়গা বিক্রি করা তাদের কাছে জায়েজ নেই। যেমনটি মুদাওয়ানাতুল কুবরা কিতাবে বর্ণিত হয়েছে—

قلت : أرأيت إن باع عشرة أذرع من فوق عشرة أذرع من هواء هو له ، أيجوز هذا في قول مالك ؟ قال : لا يجوز هذا عندي ، ولم أسمع من مالك فيه شيئا ، إلا أن يشترط له بناء يبنيه ؛ لأن يبني هذا فوقه ، فلا بأس بذلك

'আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার অভিমত কী? কেউ যদি তার মালিকানাধীন দশহাত শূন্যের উপরের দশহাত বিক্রি করে, তাহলে ইমাম মালিক রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী কি সেটি জায়েজ হবে? উত্তরে তিনি বলেন, আমার অভিমত অনুযায়ী এটি জায়েজ নেই এবং এ ব্যাপারে ইমাম মালিক রহ. থেকে কিছু শুনিনি। তবে এ শর্তে জায়েজ আছে যে, শূন্য জায়গায় মালিক তার বাড়ি নির্মাণ করবে। যেন এই ক্রেতা তার ওপর কামরা তৈরি করতে পারে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই।'[১০০]

---

[৯৯] মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ১২১।

[১০০] মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১।

এরপর আল্লামা জুরকানি রহ. বিক্রয়ের প্রকারসমূহের মধ্যে উপকারিতার বিক্রয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি বলেন—

البيوع جمع بيع ، وجمع لاختلاف أنواعه ، كبيع العين ، وبيع الدين ، وبيع المنفعة.

'البيوع' শব্দটি 'بيع' শব্দের বহুবচন। বিক্রয় বিভিন্ন প্রকার হওয়ার কারণে এখানে বহুবচন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন : বস্তু, ঋণ ও উপকারিতার বিক্রয়।'[১০১]

সুতরাং এসব ফিকহি বক্তব্যের সমষ্টি থেকে যেটি স্পষ্ট হয়, তা হলো আল্লামা ইবনু আরাফা রহ. বিক্রয়ের সংজ্ঞা থেকে যে উপকারিতাকে বের করে দিয়েছেন, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সাময়িক উপকারিতা। যার ওপর ইজারা ও ভাড়ার চুক্তি করা হয়ে থাকে। অতএব মালিকি মাজহাবে স্থায়ী উপকারিতা বিক্রি করাও জায়েজ আছে। মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

হানাফি মাজহাব

হানাফি মাজহাবের ফকিহদের কাছে বিক্রয়ের প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা হলো—

مبادلة المال بالمال.

'মালের বিনিময়ে মাল বিক্রি করা।'

আর অনেক আলেম বিক্রয়ের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে—

مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب.

'কোনো কাম্য বস্তুকে অন্য একটি কাম্য বস্তুর বিনিময়ে পরিবর্তন করা।'

তবে তাদের কাছে কাম্য বস্তুর উদ্দেশ্য হলো মাল। কারণ, আল্লামা কাসানি রহ., যিনি কাম্য বস্তুর মাধ্যমে বিক্রয়ের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি অন্য এক জায়গায় বলেছেন—বিক্রয় বলা হয় মালের বিনিময়ে মাল পরিবর্তন করা। অনুরূপভাবে দুররুল মুখতার গ্রন্থের প্রণেতা মুলতাকাল আবহুর কিতাবের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, কাম্য বস্তুর উদ্দেশ্য হলো মাল হওয়া।

---

[১০১] শরহুজ জুরকানি আলাল মুয়াত্তা, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৫০।

তবে মালের সংজ্ঞার ব্যাপারে হানাফি মাজহাবের ফকিহগণের বক্তব্যে ভিন্নতা দেখা দিয়েছে। আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ. বলেন—

المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة ، والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم ، والتقوم يثبت بها ، وبإباحة الانتفاع به شرعا.

'মাল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন জিনিস যার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। আর প্রয়োজনের জন্য সেটিকে জমা করে রাখা যায়। সব মানুষ বা কিছু মানুষ কোনো জিনিসকে মাল হিসেবে সাব্যস্ত করার মাধ্যমে মাল হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়ে যাবে। আর মাল হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে এবং শরয়ি দৃষ্টিতে সেটির ব্যবহার বৈধ হওয়ার মাধ্যমেও মূল্যমান প্রমাণিত হয়।'[১০২]

এরপর আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ. হাবিল কুদসি কিতাব থেকে বর্ণনা করেছেন—

المال اسم لغير الآدمي خلق لمصالح الآدمي ، وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار.

'মানুষ ছাড়া এমন বস্তুকে মাল হিসেবে গণ্য করা হয়, যেটিকে মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আর ইচ্ছে অনুযায়ী সেটিকে জমা রাখা এবং ব্যবহার করা সম্ভব হয়।'[১০৩]

উল্লিখিত সংজ্ঞা দুটির মধ্যে এমন কোনো বিষয় নেই, যার মাধ্যমে মালকে কোনো বস্তুর সঙ্গে বিশেষিত করা যায় এবং স্বত্ব বা উপকারিতাকে একেবারে তার সংজ্ঞা থেকে বের করে দেওয়া যায়। তবে আদ্দুররুল মুখতার কিতাবের রচয়িতা আল্লামা আলাউদ্দিন হাসকাফি রহ. মুলতাকাল আবহুর-এর ব্যাখ্যায় মালের এমন একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন, যা মালকে বস্তুর সঙ্গে বিশেষিত করে। তিনি বলেন—

والمراد بالمال عين يجري فيه التنافس والابتذال.

---

[১০২] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫০১।

[১০৩] আল-বাহরুর রায়েক, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৫৭। রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫০১।

'মাল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন বস্তু, যার প্রতি মানুষের আগ্রহ পাওয়া যায় এবং সেটিকে ব্যবহার করা যায়।'[১০৪]

মালের শেষোক্ত সংজ্ঞা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, তা বস্তু হওয়া উচিত। যদিও আল্লামা হাসকাফি রহ. ছাড়া আর কোনো হানাফি ফকিহ থেকে মাল বস্তু হওয়ার ব্যাপারে এ ধরনের সুস্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায় না। তবে হানাফি মাজহাবের মুতাআখখিরিন ফকিহদের বক্তব্য এবং তাদের সংজ্ঞা থেকে যে বিষয়টি বেরিয়ে আসে সেটি হলো, মালের সংজ্ঞায় বস্তু হওয়ার ব্যাপারটি তাদের কাছে লক্ষণীয় ছিলো। এ কারণে উসতাজ শায়খ মুসতফা জারকা রহ. উল্লিখিত সবগুলো সংজ্ঞার সমালোচনা করে স্বতন্ত্র একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। তার সে সংজ্ঞাটি হলো—

المال : هو كل عين ذات قيمة مادية بين الناس

'মাল হলো এমন একটি বস্তু যা মানুষের কাছে সত্তাগতভাবে অবয়ব বিশিষ্ট এবং মূল্যবান হিসেবে বিবেচিত হবে।'[১০৫] শেষোক্ত সংজ্ঞা দুটির উদ্দেশ্য হলো, মাল সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারটি দৃশ্যমান বস্তুর ওপর নির্ভরশীল। ফলে মালের সংজ্ঞা স্বত্ব ও উপকারিতাকে অন্তর্ভুক্ত করবে না। এ কারণে হানাফি মাজহাবের ফকিহগণ নিরেট স্বত্ব ও উপকারিতা বিক্রয়কে নাজায়েজ বলেছেন। তারা এ কথা বলেছেন যে, ওপর তলার শূন্য স্বত্ব বিক্রি করা জায়েজ নেই। আল্লামা কাসানি রহ. বলেন—

سفل وعلو بين رجلين انهدما ، فباع صاحب العلو علوه لم يجز ، لأن الهواء ليس بمال

'নিচের অংশ একজনের আর উপরের অংশ অন্যজনের এমন কোনো বাড়ি যদি ধ্বংস হয়ে যায়। আর উপরের মালিক তার অংশটি বিক্রি করে দেয়, তাহলে তার বিক্রি জায়েজ হবে না। কারণ, বাতাস কোনো মাল নয়।'[১০৬]

হিদায়া গ্রন্থপ্রণেতা বলেন—

---

[১০৪] আদ্দুররুল মুনতাকা, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩। মাজমাউল আনহুর-এর সঙ্গে প্রকাশিত।
[১০৫] আল-ফিকহুল ইসলামি ও আদিল্লাতুহু, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৪৫।
[১০৬] বাদায়েউস সনায়ে, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৪৫।

لأن حق التعلي ليس بمال، لأن المال ما يمكن إحرازه

'কেননা, ওপর তলার স্বত্ব কোনো মাল নয়। কারণ, মাল বলা হয় এমন জিনিসকে যেটি জমা করে রাখা যায়।'[১০৭]

অনুরূপভাবে পানি প্রবাহের স্বত্ব বিক্রয় নাজায়েজ হওয়ার বিষয়টিকে হানাফি মাজহাবের ফকিহগণ স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন। হানাফি মাজহাবের এমন কোনো ফকিহকে পাইনি যিনি ওপরতলা ও পানি প্রবাহের স্বত্ব বিক্রি করার ব্যাপারে জায়েজের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।[১০৮] তবে তাদের অনেকে চলাচলের স্বত্ব ও নালার স্বত্ব বিক্রয়কে জায়েজ বলেছেন। এ সম্পর্কে হানাফি মাজহাবের ফকিহগণ যা বলেছেন সেগুলো উল্লেখ করছি।

হানাফিদের কাছে চলাচলের স্বত্ব বিক্রি করার হুকুম

চলাচলের স্বত্ব বিক্রয়ের ব্যাপারে হানাফি মাজহাবের ফকিহদের থেকে দু-ধরনের বর্ণনা রয়েছে। একটি হলো জিয়াদাত কিতাবের বর্ণনা। আর সেটি হলো এ ধরনের বিক্রয় জায়েজ নেই। আর অন্য বর্ণনাটি হলো কিতাবুল কিসমাহ-এর বর্ণনা। আর সেটি হলো এ ধরনের বিক্রয় জায়েজ আছে। হিদায়া গ্রন্থের প্রণেতা বলেন—

(وبيع الطريق وهبته جائز، وبيع مسيل الماء وهبته باطل) والمسألة تحتمل وجهتين : بيع رقبة الطريق والمسيل، وبيع حق المرور والتسييل ، فإن كان الأول فوجه الفرق بين المسألتين أن الطريق معلوم ، لأن له طولا وعرضا معلوما وأما المسيل فمجهول ، لأنه لا يدري قدر ما يشغله من الماء . وإن كان الثاني ، ففي بيع حق المرور روايتان ، ووجه الفرق على إحداهما بينه وبين حق المسيل أن حق المرور معلوم ، لتعلقه بمحل معلوم ، وهو الطريق . أما المسيل على السطح فهو نظير حق التعلي ، وعلى الأرض مجهولة لجهالة محله ، ووجه الفرق بين حق المرور وحق التعلي على إحدي الروايتين أن حق التعلي يتعلق بعين

---

[১০৭] ফাতহুল কাদির, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২০৪।

[১০৮] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৩২। শরহু মাজাল্লা, আল্লামা খালেদ আতাসি রহ.-এর রচিত, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১১৭।

، وهو البناء ، فأشبه المنافع . أما حق المرور يتعلق بعين تبقي ، وهو الأرض ، فأشبه الأعيان

'রাস্তা বিক্রি করা এবং দান করা জায়েজ। আর পরনালা বিক্রি করা ও দান করা জায়েজ নেই। এ মাসআলাটির দুটি ক্ষেত্র হতে পারে। যথা :

- আসল রাস্তা ও পরনালা বিক্রি করা।
- রাস্তায় চলাচলের স্বত্ব এবং পানি প্রবাহিত করার স্বত্ব বিক্রি করা।

যদি প্রথমটি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে দুই মাসআলার মধ্যে পার্থক্য হওয়ার কারণ হলো, রাস্তা একটি নির্দিষ্ট জায়গা। কারণ, তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ জানা যায়। আর পানি প্রবাহের জায়গা অনির্দিষ্ট। কারণ, কি পরিমাণ জায়গা দিয়ে পানি যাবে সেটি জানা যায় না। আর যদি দ্বিতীয়টি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে রাস্তায় চলাচলের স্বত্ব বিক্রয়ের ব্যাপারে দু-ধরনের বর্ণনা রয়েছে। যে বর্ণনাতে রাস্তায় চলাচলের স্বত্ব বিক্রি করা জায়েজের কথা বলা হয়েছে, সে বর্ণনা অনুযায়ী রাস্তায় চলাচলের স্বত্ব আর পানি প্রবাহিত করার স্বত্বের মধ্যে পার্থক্য হলো, চলাচলের স্বত্বটি নির্দিষ্ট জায়গা তথা রাস্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে সেটিও নির্দিষ্ট। আর সে নির্দিষ্ট জায়গাটি হলো রাস্তা। পক্ষান্তরে পানি প্রবাহিত করার স্বত্ব ছাদের উপরে হওয়ার ক্ষেত্রে সেটি শূন্যের স্বত্বের মতো। আর মাটির ওপর দিয়ে প্রবাহিত করার ক্ষেত্রেও সেটি কী পরিমাণ জায়গা দিয়ে প্রবাহিত হবে সেটি অনির্দিষ্ট হওয়ার কারণে স্বত্বটিও অনির্দিষ্ট। আর এক বর্ণনা অনুযায়ী রাস্তায় চলাচলের স্বত্ব আর ওপর তলার স্বত্বের মধ্যে পার্থক্য হলো, ওপর তলার স্বত্বটি এমন একটি জিনিসের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যেটি স্থায়ী নয়। আর সেটি হলো বিল্ডিং। ফলে ওপরতলার স্বত্বটি উপকারিতার সঙ্গে সাদৃশ্যময় হয়ে গেছে। আর চলাচলের স্বত্ব একটি স্থায়ী জিনিসের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। আর সেটি হলো জমি। ফলে চলাচলের স্বত্বটি বস্তু সদৃশ হলো।'[১০৯]

আল্লামা ইবনু হুমাম রহ. এই পার্থক্যের ওপর প্রশ্ন তুলে বলেন, যেমন করে স্থায়ী কোনো বস্তুর বিক্রি হতে পারে। তেমনি অস্থায়ী জিনিসও বিক্রি হতে পারে। সুতরাং স্থায়ী বস্তু ও অস্থায়ী বস্তুর মধ্যে কোনো পার্থক্য করা ঠিক না।

[১০৯] ফাতহুল কাদির, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২০৫-২০৬।

এরপর তিনি ভিন্ন একটি পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন—

أن حق المرور حق يتعلق برقبة الأرض، وهي مال هو عين، فما يتعلق به يكون له حكم العين. أما حق التعلي فحق يتعلق بالهواء، وهو ليس بعين مال.

'চলাচলের স্বত্ব জমির সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর জমি হলো এমন একটি মাল, যা ধাতব এবং অনুভূত। ফলে তার সঙ্গে সম্পৃক্ত স্বত্বকে বস্তুর হুকুম দেওয়া হবে। আর শূন্যের স্বত্ব এমন একটি স্বত্ব, যা বাতাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর শূন্য কোনো বস্তু ও মাল নয়।'[১১০]

এরপর বলেছেন, ফকিহ্ আবুল লাইস রহ. জিয়াদাত কিতাবের বর্ণনাকে সহিহ্ বলেছেন। অর্থাৎ নাজায়েজ হওয়ার বর্ণনা। কারণ, নিরেট স্বত্ব বিক্রি করা জায়েজ নেই। তবে আদ্দুররুল মুখতার কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অধিকাংশ আলেম জায়েজের অভিমতকে গ্রহণ করেছেন। আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ. বলেন—

قوله: وبه أخذ عامة المشايخ» قال السائحاني: «وهو الصحيح وعليه الفتوي، (مضمرات). والفرق بينه وبين حق التعلي حيث لا يجوز، هو أن حق المرور حق يتعلق برقبة الأرض، وهي مال هو عين، فما يتعلق به له حكم العين، أما حق التعلي فمتعلق بالهواء وهو ليس بعين مال.

'অধিকাংশ আলেম এটিকে গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে আল্লামা সায়িহানি রহ. বলেন, এটিই সহিহ্ এবং এর ওপরই ফতোয়া। মুজমারাত কিতাবে অনুরূপ আছে। চলাচলের স্বত্ব আর ওপর তলার স্বত্ব, যেটি বিক্রি করা জায়েজ নেই তার মধ্যে পার্থক্য হলো, চলাচলের স্বত্বটি জমির সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর সেটি এমন মাল, যা একটি বস্তু। ফলে তার সঙ্গে যে জিনিস সম্পৃক্ত থাকবে, সেটিরও তার অনুরূপ হুকুম হবে। আর শূন্যের স্বত্ব হলো এমন একটি স্বত্ব, যা বাতাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর বাতাস কোনো মাল ও বস্তু নয়।'[১১১]

এখান থেকে স্পষ্ট হয় যে, মুতাআখখিরিন হানাফিদের কাছে গ্রহণযোগ্য

---

[১১০] ফাতহুল কাদির, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২০৫-২০৬।

[১১১] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৩২।

অভিমত হলো চলাচলের স্বত্ব বিক্রি করা জায়েজ। কেননা, সেটি এমন একটি স্বত্ব, যা নির্দিষ্ট বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত। ফলে তার জায়েজের ব্যাপারে বস্তু বিক্রয়ের হুকুম দেওয়া হবে। এই মূলনীতি অনুযায়ী জমির উপরের পানি প্রবাহিত করার স্বত্ব বিক্রি করা জায়েজ হওয়া উচিত। কারণ, সেটি এমন একটি স্বত্ব, যা বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর সে বস্তুটি হলো জমি। তবে পানি প্রবাহের জায়গার পরিমাণ অনির্দিষ্ট হওয়ার কারণে তারা এ ধরনের স্বত্ব বিক্রিকে নাজায়েজ বলেছেন। শুধু নিরেট স্বত্ব হওয়ার কারণে সেটির বিক্রয়কে নাজায়েজ বলেননি। যেমনটি হিদায়া কিতাবের প্রণেতার দর্শানো কারণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। তার বর্ণিত কারণের দাবি হলো, পানি প্রবাহের জায়গা নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে যদি এই অজ্ঞতা ও অনিশ্চয়তা দূর করা যায়, তাহলে পানি প্রবাহিত করার স্বত্ব বিক্রি করা জায়েজ হবে। নির্দিষ্টের পদ্ধতি এমন হবে যে, পানি ওই নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করবে না।

পানি প্রবাহিত করার স্বত্ব বিক্রি করা

পানি প্রবাহিত করার স্বত্ব বিক্রয়ের ব্যাপারে ফকিহদের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে। সুতরাং হানাফি মাজহাবের জাহেরুর রিওয়ায়েত অনুযায়ী পানি প্রবাহিত করার স্বত্ব বিক্রি করা জায়েজ নেই। এরপর অনেক ফকিহ সামাজিক প্রচলনের ওপর নির্ভর করে এ ধরনের বিক্রিকে জায়েজ বলেছেন। রদ্দুল মুহতার কিতাবসহ অন্যান্য কিতাবে উল্লেখ আছে যে, ফতোয়া হলো নাজায়েজের ওপর। তবে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায় যে, সামাজিক প্রচলন থাকার পরও যারা এ ধরনের বিক্রয়কে নাজায়েজ বলেছেন, তাদের নাজায়েজ বলার কারণ হলো এতে অজ্ঞতা ও অনিশ্চয়তা রয়েছে। সেগুলো মাল না হওয়ার কারণে তারা নাজায়েজ বলেননি। ইমাম সারাখসি রহ. বলেন—

بيع الشرب فاسد ، فإنه من حقوق المبيع بمنزلة الأوصاف ، فلا يفرد بالبيع ثم هو مجهول في نفسه غير مقدور التسليم ، لأن البائع لا يدري أيجري الماء أم لا ؟ وليس في وسعه إجراؤه . قال « وكان شيخنا الإمام يحكي عن أستاذه أنه كان يفتي بجواز بيع الشرب بدون الأرض ، ويقول : فيه عرف ظاهر في ديارنا بنسف ، فإنهم يبيعون الماء » فللعرف

الظاهر كان يفتي بجوازه، ولكن العرف إنما يعتبر فيما لا نص بخلافه، والنهي عن بيع الغرر نص بخلاف هذا العرف فلا يعتبر.

'পানি প্রবাহিত করার স্বত্ব বিক্রি করা ফাসেদ। কারণ, সেটি পণ্যের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত পণ্যের গুণাগুণের ন্যায়, ফলে সেটিকে ভিন্নভাবে বিক্রি করা যাবে না। এরপর সেটি আবার অনির্দিষ্ট ও হস্তান্তরযোগ্য নয়। কারণ, বিক্রেতা জানে না যে, বিক্রিত নালা দিয়ে পানি যাবে কি না? আর সে পথ দিয়ে পানি প্রবাহিত করাটাও বিক্রেতার ক্ষমতাধীন নয়। তিনি বলেন, আমাদের শায়খ ও ইমাম তার উসতাজ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি জমি ছাড়া শুধু পানি প্রবাহিত করার স্বত্ব বিক্রি করার ব্যাপারে জায়েজের ফতোয়া দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদের নসফ নামক এলাকায় এ ধরনের বিক্রয়ের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। তারা এভাবে পানি বিক্রি করে থাকে। সুতরাং ব্যাপক প্রচলনের কারণে তিনি সেটি জায়েজের ফতোয়া দিয়েছিলেন। তবে কেবল সে ক্ষেত্রে সামাজিক প্রচলন গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যেখানে তার বিপরীতে কুরআন-হাদিসের কোনো বক্তব্য নেই। আর ধোঁকা ও প্রতারণামূলক বিক্রয়ের নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত হাদিসটি এই সামাজিক প্রচলনের বিপক্ষে রয়েছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সমাজিক প্রচলনকে গ্রহণ করা যাবে না।'[১১২]

ইমাম সারাখসি রহ. না জায়েজের দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন।

ক. পানি ব্যবহারের অধিকার সংক্রান্ত স্বত্ব আসলে মূল বস্তুর অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এটাকে ভিন্নভাবে বিক্রি করা যাবে না।

খ. পানি ব্যবহার সংক্রান্ত স্বত্বের ক্রয়-বিক্রয়ে অজ্ঞতা ও অনিশ্চয়তা রয়েছে। এ ধরনের বিক্রয় জায়েজের প্রবক্তাগণ যখন ব্যাপক সামাজিক প্রচলনের মাধ্যমে দলিল দিয়েছেন, ইমাম সারাখসি রহ. তখন শুধু দ্বিতীয় কারণটির মাধ্যমে তাদের বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেন, ব্যাপক সামাজিক প্রচলনের কারণে হাদিসে বর্ণিত নিষিদ্ধ ধোঁকার বিষয়টি জায়েজ হতে পারে না। তবে তিনি এ কথা বলেননি যে, ব্যাপক সামাজিক প্রচলন স্বত্ব বিক্রয়কে জায়েজ করতে পারে না।

[১১২] আল-মাবসুত, ইমাম সারাখসি রহ.-এর রচিত, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১৩৪-১৩৫।

আল্লামা ইবনু হুমাম রহ. এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করে বলেছেন—

ثم بتقدير أنه حظ من الماء فهو مجهول المقدار ، فلا يجوز بيعه ، وهذا وجه منع مشايخ بخارى بيعه مفردا.

'তারপর যদি মেনে নেওয়া হয় যে, সেটি পানির একটি অংশ, তারপরও সেটির পরিমাণ অনির্দিষ্ট। ফলে তার বিক্রয় জায়েজ হবে না। আর এটি সেই কারণ, যার ওপর নির্ভর করে বুখারা এলাকার মাশায়েখগণ ভিন্নভাবে সেটির বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন।'[১১৩]

আল্লামা বাবিরতি রহ.-এর বক্তব্য ইবনু হুমাম রহ.-এর বক্তব্য থেকে আরও স্পষ্ট। তিনি বলেন—

وإنما لم يجز بيع الشرب وحده في ظاهر الرواية للجهالة ، لا باعتبار أنه ليس بمال .

'জাহেরুর রেওয়ায়েত অনুযায়ী পানি প্রবাহিত করার স্বত্ব বিক্রয় নাজায়েজ হওয়ার কারণ হলো অজ্ঞতা। সেটি মাল নয় এ কারণে নাজায়েজ নয়।'[১১৪]

এরপর আল্লামা সারাখসি রহ. 'কিতাবুশ শিরবে' আরও ব্যাপকভাবে এই মাসআলাটি পুনরায় বর্ণনা করেছেন। সে আলোচনার শেষে হানাফি মাজহাবের মুতাআখখিরিনের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা ব্যাপক সামাজিক প্রচলনের কারণে পানি প্রবাহিত করার স্বত্ব বিক্রি করাকে জায়েজ বলেছেন। আর তাদের এ অভিমতকে কোনোভাবে সমালোচনা করেননি। তিনি বলেন—

وبعض المتأخرين من مشايخنا رحمهم الله أفتي أن يبيع الشرب وإن لم يكن معه أرض للعادة الظاهرة فيه في بعض البلدان ، وهذه عادة معروفة بنسف ، قالوا : المأجور الاستصناع للتعامل وإن كان القياس يأباه ، فكذلك بيع الشرب بدون الأرض .

'মুতাআখখিরিন মাশায়েখের অনেকে জমি ছাড়া পানি প্রবাহিত করার স্বত্ব বিক্রয়কে জায়েজের ফতোয়া দিয়েছেন। কোনো কোনো

[১১৩] ফাতহুল কাদির, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২০৫।

[১১৪] আল-ইনায়াহ, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২০৪। ফাতহুল কাদির-এর সঙ্গে প্রকাশিত।

এলাকায় এমন সামাজিক প্রচলন থাকার কারণে তারা এমন ফতোয়া দিয়েছেন। 'নাসফ' নামক এলাকায় এটি পরিচিত একটি বিষয়। তারা বলেন, সামাজিক প্রচলনের কারণে অর্ডারের মাধ্যমে মাল তৈরিকে জায়েজ বলা হয়েছে। যদিও কিয়াস সেটির নাজায়েজকে দাবি করে। সুতরাং অনুরূপভাবে জমি ছাড়া পানি প্রবাহিত করার স্বত্ব বিক্রি করা জায়েজ হবে।'[১১৫]

পানি প্রবাহিত করার স্বত্ব বিক্রয়ের ক্ষেত্রে হানাফি মাজহাবের আলেমগণ যে অভিমত পোষণ করেছেন, সেখান থেকে হুবহু সে কথা পাওয়া যায়, যা রাস্তায় চলাচলের ও পানি প্রবাহ স্বত্বের ব্যাপারে পাওয়া গেছে। আর সেটি হলো, স্বত্বটি যদি নির্দিষ্ট কোনো বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, তাহলে সেখানে অজ্ঞতা, ধোঁকা বা নিষিদ্ধ হওয়ার অন্য কোনো কারণ না থাকলে সেটি বিক্রি করা জায়েজ আছে।

এরপর হানাফি মাজহাবের মুতাআখখিরিন আলেমদের কেউ কেউ বলেছেন, যেসব স্বত্ব বিক্রি করা জায়েজ নেই যেমন : চলাচলস্বত্ব, পানিপ্রবাহস্বত্ব ও পানি পান করার স্বত্ব, এগুলোর ক্ষেত্রে শুধু বিক্রয়ের মাধ্যমে বিনিময় নেওয়া নিষিদ্ধ। তবে সমঝোতার মাধ্যমে এগুলোর বিনিময় নেওয়া জায়েজ আছে। আল্লামা খালেদ আতাসি রহ. অর্থের বিনিময়ে চাকুরি থেকে সরে দাঁড়ানোর মাসআলা আলোচনা করার পর বলেন—

أقول : وعلى ما ذكروه من جواز الاعتياض عن الحقوق المجردة بمال ينبغي أن يجوز الاعتياض عن حق التعلي ، وعن حق الشرب ، وعن حق المسيل بمال ، لأن هذه الحقوق لم تثبت لأصحابها لأجل دفع الضرر عنهم ، بل ثبتت لهم ابتداء بحق شرعي . فصاحب حق العلو إذا انهدم علوه ، قالوا : إن له حق إعادته كما كان جبرا عن صاحب السفل. فإذا نزل عنه لغيره بمال معلوم ينبغي أن يجوز ذلك على وجه الفراغ والصلح ، لا على وجه البيع ، كما جاز النزول عن الوظائف ونحوها ، لا سيما إذا كان صاحب حق العلو فقيرا قد عجز عن إعادة علوه ، فلو لم يجز ذلك له على الوجه الذي ذكرناه ، يتضرر . فليتأمل وليحمد ، والله سبحانه أعلم.

---

[১১৫] আল-মাবসুত, ইমাম সারাখসি রহ.-এর রচিত, খণ্ড : ২৩, পৃষ্ঠা : ১৭১।

'আমি বলি, নিরেট স্বত্বের বিনিময়ে অর্থ নেওয়া জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে ফকিহগণ যে অভিমত দিয়েছেন, তার ভিত্তিতে ছাদের উপরের শূন্যস্থানস্বত্ব, পানি ব্যবহার করা ও প্রবাহিত করার স্বত্বের বিনিময় নেওয়া জায়েজ হওয়া উচিত। কারণ, এ স্বত্বগুলো তার অধিকারী থেকে সমস্যা দূর করার জন্য প্রমাণিত নয়। বরং সরাসরি শরিয়ত এ স্বত্বগুলো তাদের জন্য সাব্যস্ত করেছে। সুতরাং উপরের মালিকের অংশ যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তার এ অধিকার রয়েছে যে, সে আগের মতো কামরা নির্মাণ করবে। সুতরাং সে যদি নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে অন্যের কাছে তার এ অধিকার হস্তান্তর করে, তাহলে সমঝোতার ভিত্তিতে সেটি জায়েজ হওয়া উচিত, বিক্রয়ের পদ্ধতিতে নয়। যেমনিভাবে চাকরিস্বত্ব থেকে সরে দাঁড়ানো জায়েজ ছিলো। বিশেষকরে সে ক্ষেত্রে যেখানে উপরের শূন্যস্থানের মালিক এমন দরিদ্র হয়, যার পক্ষে দ্বিতীয়বার কামরা নির্মাণ করা সম্ভব নয়। কেননা বর্ণিত অবস্থায় যদি এটিকে নাজায়েজ বলা হয়, তাহলে উপরের মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'[১১৬] মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

এ হলো ফকিহগণ থেকে উপকারিতা ও বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত স্বত্বের ব্যাপারে প্রাপ্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ।

এ ধরনের স্বত্বের হুকুমের সারসংক্ষেপ

আলোচনা সামনে বাড়ানোর আগে ফকিহদের বক্তব্য থেকে এ বিষয়ে যা কিছু জানতে পারলাম, তার সারসংক্ষেপ পেশ করা ভালো মনে করছি।

১. বিক্রয়ের সংজ্ঞা এমন একটি বিষয়, যার ব্যাপারে ফকিহদের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে। শাফিয়ি ও হাম্বালি মাজহাবের ফকিহগণ বিক্রয়পণ্য কোনো বস্তু হওয়ার শর্তারোপ করেননি। বরং তারা স্থায়ী উপকারিতা বিক্রয়কেও জায়েজ বলেছেন। আর মালিকি মাজহাবের কিছু শাখাগত মাসআলা থেকে বস্তুর উপকারিতা বিক্রয় জায়েজ মনে হয়।

২. বিক্রয়ের ক্ষেত্রে হানাফি মাজহাবের ফকিহগণ যদিও এরূপ শর্তারোপ

---

[১১৬] শরহু মাজাল্লাহ, আল্লামা খালেদ আতাসি রহ.-এর রচিত, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১২১। ধারা নং ২১৭ এর আগে।

করেছেন যে, পণ্যটি নির্দিষ্ট কোনো বস্তু হতে হবে। তবে তারা চলাচলের স্বত্ব বিক্রয়কে জায়েজ বলেছেন। আর তার কারণ বর্ণনা করেছেন যে, সেটি এমন একটি স্বত্ব, যা কোনো বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত। ফলে তার বিক্রয় জায়েজ হওয়ার ক্ষেত্রে সেটিকে বস্তুর হুকুম দেওয়া হবে।

৩. এখান থেকে বোঝা যায় যে, হানাফি মাজহাবের আলেমদের কাছে যেসব স্বত্ব কোনো বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত, সেগুলোকে বস্তুর হুকুম দেওয়া হবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে নিষিদ্ধের কোনো কারণ না থাকলে এ ধরনের স্বত্ব বিক্রয় করা জায়েজ হবে। সে নিষিদ্ধের কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে ধোঁকা ও অজ্ঞতা।

৪. যেসব স্বত্ব কোনো বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, হানাফি মাজহাবের আলেমদের মতে সেগুলো বিক্রি করা জায়েজ নেই। তবে তাদের কতক ফকিহের মতে সমঝোতার মাধ্যমে এ ধরনের স্বত্বের বিনিময় নেওয়া জায়েজ আছে।

এই চারটি পয়েন্টের ভিত্তিতে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, তিন হিজাজি ইমামের কাছে এ ধরনের সামাজিক প্রচলিত স্বত্ব ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েজ আছে। যেমন : কোনো বস্তু থেকে উপকৃত হওয়া। তবে হানাফি মাজহাবের আলেমগণ এ ধরনের স্বত্ব বিক্রিকে নাজায়েজ বলেছেন। তারা বলেন, নিরেট স্বত্বের বিনিময় নেওয়া জায়েজ নেই। তবে তাদের বক্তব্যের ভাষা থেকে হুকুমটি যেমন ব্যাপক বোঝা যায়, তেমন ব্যাপক নয়। বরং তাদের ফকিহগণ এমন কিছু স্বত্বকে এ হুকুম থেকে ভিন্ন রেখেছেন, যেগুলো বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। আর কিছু কিছু জিনিসকে মালের অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে সামাজিক প্রচলনের বেশ ভূমিকা রয়েছে। কেননা, আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ.-এর বর্ণনা অনুযায়ী মানুষ কোনো জিনিসকে মাল হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে সেটি মাল সাব্যস্ত হয়। সুতরাং সামাজিক প্রচলনে যদি কিছু স্বত্বকে মূল্যবান মাল বলে সাব্যস্ত করা হয় এবং মানুষের মধ্যে মাল হিসেবে সেটির প্রচলন ঘটে, তাহলে হানাফি মাজহাবের ফকিহদের কাছেও সেটি বিক্রয় করা জায়েজ হবে। তবে তার জন্য নিচের শর্তগুলো থাকা আবশ্যক। যথা—

১. স্বত্বটি তাৎক্ষণিক বিদ্যমান থাকা। ভবিষ্যতের সম্ভাব্য স্বত্ব হলে হবে না।

২. স্বত্বটি তার মালিকের জন্য সত্তাগতভাবে প্রমাণিত থাকা। শুধু তার সমস্যা দূর করার জন্য স্বত্বটি সাব্যস্ত হতে পারবে না।

৩. স্বত্বটি একজন থেকে অন্যের কাছে হস্তান্তরযোগ্য হওয়া।

৪. স্বত্বটি নির্ধারণ করার মাধ্যমে নির্ধারিত হওয়ার যোগ্য হওয়া। সেখানে কোনো ধরনের ধোঁকা বা অস্পষ্টতা থাকতে পারবে না।

৫. ব্যবসায়ীদের কাছে লেনদেনের ক্ষেত্রে ধাতব বস্তুর মতো ও স্বতন্ত্র সম্পদের মতো সেটির ব্যবহার হতে হবে।

অগ্রাধিকার স্বত্ব

সামাজিক প্রচলন নির্ভর স্বত্বের দ্বিতীয় প্রকারকে আমরা হকে আসবাকিয়া (অগ্রাধিকার স্বত্ব) নামে নামকরণ করতে পারি। সেটি এমন মালিকানা বা বৈশিষ্ট্যের স্বত্ব, যা কোনো বৈধ জিনিসকে আগে নেওয়ার মাধ্যমে অর্জন হয়ে থাকে। যেমন : পরিত্যক্ত ভূমি আগে চাষাবাদ করার মাধ্যমে সেখানে মালিকানা অর্জন হওয়া।

শাফিয়ি ও হাম্বালি মাজহাবের কিছু আলেম এ প্রকৃতির স্বত্ব বিক্রয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আর এ বিষয়টির প্রতি সব ফকিহ একমত যে, চাষাবাদ করা ছাড়া কেউ কোনো পরিত্যক্ত জমির মালিক হতে পারবে না। আর আগে গিয়ে জমির সীমানা নির্ধারণ করার কারণে মালিকানা প্রমাণিত হয় না; বরং এর মাধ্যমে চাষাবাদের দ্বারা মালিকানা অর্জনের অধিকার প্রমানিত হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি আগে গিয়ে কোনো পরিত্যক্ত জমির সীমানা করবে, সে ওই সীমানাকৃত জমি চাষাবাদের অধিকারী হবে। তবে সীমানা করার মাধ্যমে অর্জিত হক বা স্বত্ব বিক্রয় জায়েজ আছে কিনা? এ ব্যাপারে শাফিয়ি মাজহাবের ফকিহগণ মতানৈক্য করেছেন। আল্লামা রমলি রহ.-এর 'নিহায়াতুল মোহতাজ' কিতাবে বর্ণিত আছে—

ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمه ، كحفر الأساس أو علم على بقعة بنصب أحجار ، أو غرز خشبا ، أو جمع ترابا ، أو خط خطوطا ، فمتحجر عليه ، أي مانع لغيره منه بما فعله ، بشرط كونه بقدر كفايته وقادرا على عمارته حالا ، وحينئذ هو أحق به من غيره اختصاصا لا ملكا ... لكن الأصح أنه لا يصح بيعه ولا هبته ، كما قاله الماوردي ،

خلافا للدارمي ، لما مر من أنه غير مالك ، وحق التملك لا يباع كحق الشفعة . والثاني : يصح بيعه ، وكأنه باع حق الاختصاص.

'যে ব্যক্তি কোনো পরিত্যক্ত জমি চাষাবাদ করতে শুরু করলো, কিন্তু এখনো সেটি পরিপূর্ণ করতে পারেনি। যেমন : ভিতরে খনন কাজ শুরু করলো বা পাথরের মাধ্যমে জমির সীমা নির্ধারণ করলো। অথবা কোনো ডাল গাড়লো, মাটি জমা করলো বা দাগ দিলো। এগুলোর মাধ্যমে জমিটি সীমানাকৃত হয়ে যাবে। অর্থাৎ তার এই কাজের কারণে অন্য কেউ সেখানে কিছু করতে পারবে না। তবে তার জন্য আরও একটি শর্ত হলো যে, ওই সময় সীমানাকৃত জমি চাষাবাদ বা সেখানে স্থাপনা নির্মাণের সামর্থ থাকতে হবে। এ অবস্থায় সে ওই জমির ব্যাপারে অগ্রাধিকার পাবে কিন্তু তার মালিক হবে না।...... তবে সর্বাধিক বিশুদ্ধ অভিমত হলো, এ ধরনের জমি বিক্রয় বা দান করা সহিহ নয়। যেমনটি আল্লামা মাওয়ারদি রহ. বলেছেন। অন্যদিকে আল্লামা দারিমি রহ.-এর বিপরীত বলেছেন। তার কারণ ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সে ওই জমির মালিক নয় বরং মালিকানা অর্জনের অধিকারী হয়েছে। আর যেভাবে 'শোফা'র অধিকারকে বিক্রি করা যায় না, তেমনি মালিকানা অর্জনের অধিকারকেও বিক্রি করা যায় না। আর দ্বিতীয় অভিমত হলো, অগ্রাধিকারস্বত্ব বিক্রি করা জায়েজ আছে। যেন সে ওই ভূমির মালিকানা অর্জনের অগ্রাধিকার—বিক্রি করলো। '[১১৭]

আল-মাজমু শরহু মুহাজ্জাব' কিতাবে বর্ণিত হয়েছে—

وإن تحجر رجل مواتا ، وهو أن يشرع في إحيائه ولم يتمم ، صار أحق به من غيره ... وإن نقله إلى غيره صار الثاني أحق به ... وإن مات انتقل ذلك إلى وارثه ، لأنه حق تملك ثبت له ، فانتقل إلى وارثه كالشفعة . وإن باعه ففيه وجهان : أحدهما ، وهو قول أبي إسحاق ، أنه يصح ، لأنه صار أحق به فملك بيعه ، والثاني : أنه لا يصح ، وهو المذهب ، لأنه لم يملك بعد ، فلم يملك بيعه كالشفيع قبل الأخذ.

[১১৭] নিহায়াতুল মোহতাজ, আল্লামা রমলি রহ.-এর রচিত, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩৩৬। জাদুল মোহতাজ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪০২। তোহফাতুল মোহতাজ, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২১৩।

'কেউ যদি কোনো পতিত জমিতে সীমানা দিয়ে চাষাবাদ করতে শুরু করে, তবে এখনো পর্যন্ত সেটি পরিপূর্ণ করতে পারেনি, তাহলে এ ক্ষেত্রে অন্যের অপেক্ষা সে ওই জমির ব্যাপারে বেশি হকদার হবে। এ ক্ষেত্রে সে যদি অন্যের কাছে তার এ অধিকারটি হস্তান্তর করে, তাহলে ওই দ্বিতীয় ব্যক্তি ওই জমির ব্যাপারে হকদার হবে। আর সে যদি মারা যায়, তাহলে এ অধিকারটি তার ওয়ারিসদের কাছে চলে আসবে। কেননা, তার জন্য মালিকানা অর্জনের অধিকার প্রমাণিত হয়ে গেছে, ফলে শোফার হকের মতো এ হকটি তার ওয়ারিসদের কাছে চলে আসবে। অন্যদিকে সে যদি এই অধিকারটি বিক্রি করে দেয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে দু-ধরনের অভিমত রয়েছে। ক. ইমাম আবু ইসহাক রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী বিক্রি করা সহিহ হবে। কারণ, অন্যের অপেক্ষা সে ওই জমির ব্যাপারে বেশি অগ্রাধিকারী। তাই সে জমিটি বিক্রি করতে পারবে।

দ্বিতীয় অভিমত হলো, বিক্রি করা সহিহ নেই। এটিই আসল মাজহাব। কেননা, এখনো পর্যন্ত সে ওই জমির মালিক হয়নি। ফলে তা বিক্রয় করার অধিকারী হবে না। যেমন : শফি জমি গ্রহণের আগে তা বিক্রির অধিকার রাখে না।'[১১৮]

আল্লামা খতিব শিরবিনি রহ. লিখেছেন, ইমাম আবু ইসহাক রহ. যখন এ স্বত্ব বিক্রয়কে জায়েজ বলেছিলেন, তখন তার কারণ উল্লেখ করেছেন যে, সেটি হলো বিশেষ স্বত্ব বিক্রি করা। যেমন : কামরা নির্মাণ বা বসবাসের জন্য বাড়ির নিচের অংশ ছাড়া শুধু উপরের অংশ বিক্রি করা।'[১১৯]

অনুরূপভাবে হাম্বালি মাজহাবের ফকিহগণ এ মাসআলার ব্যাপারে দু-ধরনের অভিমতের কথা উল্লেখ করেছেন। একটি হলো জায়েজের অভিমত। আর দ্বিতীয়টি হলো না জায়েজের অভিমত। আল্লামা ইবনু কুদামা রহ. বলেন—

ومن تحجر مواتا وشرع في إحيائه ولم يتم ، فهو أحق به ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) ، رواه أبو داود . فإن نقله إلى غيره صار الثاني أحق به ، لأن صاحب الحق آثره به ، فإن مات انتقل إلى وارثه ، لقول رسول الله

[১১৮] তাকমিলাতুল মাজমু শরহে মুহাজ্জাব, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৪৭১।

[১১৯] মুগনিল মোহতাজ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৬৭।

صلي الله عليه وسلم : (من ترك حقا أو مالا فهو لورثته) ، وإن باعه لم يصح ، لأنه لم يملكه ، فلم يصح بيعه كحق الشفعة ، ويحتمل جواز بيعه ، لأنه صار أحق به.

'কেউ যদি কোনো পতিত জমিতে চিহ্ন স্থাপন করে জমি চাষাবাদ করতে শুরু করে, তবে এখনো চাষাবাদ শেষ করতে পারেনি। তাহলে সে জমির মালিকানার ব্যাপারে অগ্রাধিকার পাবে। কারণ, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন বস্তুর দিকে আগে পৌঁছে গেলো, যার দিকে কোনো মুসলিম ইতোপূর্বে যায়নি সে জিনিসের ব্যাপারে ওই ব্যক্তি বেশি হকদার।' ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এখন সে যদি এই অধিকারটি অন্যের কাছে হস্তান্তর করে, তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তি সেটির অধিকারী হবে। কারণ, আসল অধিকারী তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছে। আর সে যদি মারা যায়, তাহলে এ অধিকারটি তার ওয়ারিসদের কাছে চলে যাবে। কারণ, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো অধিকার বা মাল রেখে যাবে, সেটি তার ওয়ারিসগণ পাবে।' আর ওই অধিকারটি যদি বিক্রি করে দেয়, তাহলে সেটি সহিহ হবে না। কেননা, এখনো পর্যন্ত সে সেটির মালিক হয়নি। ফলে সেটি বিক্রি করা সহিহ হবে না। যেমন : শোফার অধিকার বিক্রি করা সহিহ হয় না। আবার তা বিক্রি সহিহ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, সেই ভূমির ব্যাপারে ওই ব্যক্তি বেশি অগ্রাধিকার।'[১২০]

আল্লামা মারদাবি রহ. বলেন—

ومن تحجر مواتا لم يملكه ... وهو أحق به ، ووارثه بعده ومن ينقله إليه بلا نزاع ، وليس له بيعه . هو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح الحاثي ، وابن منجا ، والفروع ، والفائق وغيرهم » .

وقيل يجوز له بيعه، وهو احتمال لأبي الخطاب ، وأطلقهما في المحرر، والرعايتين ، والحاوي الصغير.

[১২০] আল-কাফি, আল্লামা ইবনু কুদামা রহ.-এর রচিত, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৩৯।

'যে ব্যক্তি কোনো পতিত জমির সীমানা দেবে, সে তার মালিক হয়ে যাবে না। তবে সে ওই জমির ব্যাপারে বেশি অগ্রাধিকারী হবে। তার পরবর্তী সময়ে তার ওয়ারিস এবং সে যাদের কাছে অধিকারটি হস্তান্তর করবে কোনো ধরনের সমস্যা ছাড়া তারা সেটির অধিকারী হবে। কিন্তু সে ওই অধিকারটি বিক্রি করতে পারবে না। এটিই আসল মাজহাব। এই অভিমতের ওপরই ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বালের শিষ্যগণ প্রতিষ্ঠিত। আল-ওয়াজিজ ও অন্যান্য কিতাবে এ অভিমতের বিষয়টি জোরালোভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। আল-মুগনি, শরহুল কাবির, শরহুল হারেসি, শরহু ইবনু মিনজা, আল ফুরু, আল ফায়িক ও অন্যান্য কিতাবে এ অভিমতকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

অন্য অভিমতে বলা হয়েছে যে, সেটি বিক্রি করা জায়েজ আছে। আবুল খাত্তাব রহ.-এর একটি অভিমত অনুরূপ। আল-মুহাররার, রিআয়াতাইন ও আল-হাবিস সগির কিতাবে কোনো বর্ণনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি।'[১২১]

শাফিয়ি ও হাম্বালি মাজহাবের প্রাধান্যপ্রাপ্ত অভিমত হলো, এ ধরনের অধিকার বিক্রি করা জায়েজ নেই। তবে আল্লামা বুহুতি হাম্বালি রহ. বর্ণনা করেছেন যে, নাজায়েজের অভিমতটি শুধু বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে স্বত্বত্যাগ বা সমঝোতার মাধ্যমে এ অধিকার ত্যাগের কারণে বিনিময় নেওয়া জায়েজ আছে। আল্লামা বুহুতি রহ. বলেন—

وليس له أي لمن قلنا إنه أحق بشيء من ذلك السابق (بيعه) لأنه لم يملكه كحق الشفعة قبل الأخذ ، وكمن سبق إلى مباح . لكن النزول عنه بعوض لا على وجه البيع جائز ، كما ذكره ابن نصر الله قياسا على الخلع.

'অগ্রগামিতার কারণে যে ব্যক্তি অন্যের অপেক্ষা কোনো জিনিসের বেশি অধিকারী হয়, তার জন্য ওই অধিকার বিক্রি করা জায়েজ নেই। কারণ, এখনো পর্যন্ত সে ওই জিনিসের মালিক হতে পারেনি। যেমন : শোফার অধিকার, সেটি পাওয়ার আগে তার মালিক হওয়া যায় না। অনুরূপ কোনো বৈধ জিনিসের মালিকানা লাভের ক্ষেত্রে যে অগ্রগামী তার

[১২১] আল-ইনসাফ, আল্লামা মারদাবি রহ.-এর রচিত, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩৭৩-৩৭৪।

ব্যাপারেও একই কথা। তবে বিক্রি ছাড়া সমঝোতার মাধ্যমে এই হক ছেড়ে দিয়ে তার বিনিময় নেওয়া জায়েজ আছে। যেমনটি আল্লামা ইবনু নাসরুল্লাহ খুলা তালাকের ওপর কিয়াস করে বলেছেন।'[১২২]

অগ্রাধিকার স্বত্বের মধ্যে ফকিহগণ যেসব পদ্ধতির কথা বলেছেন, সেসব অধিকারের একটি হলো মসজিদের কোনো জায়গায় আগে বসলে সে ওই জায়গার ব্যাপারে বেশি হকদার হবে। ওই জায়গার ব্যাপারে সে অন্যকে নিজের ওপর প্রাধান্য দিতে পারে। তবে তার জন্য এ অধিকারটি বিক্রি করা জায়েজ নেই। হ্যাঁ, আল্লামা বুহুতি রহ. বলেছেন, বিনিময়ের মাধ্যমে ওই জায়গা থেকে সরে যাওয়া বৈধ আছে।[১২৩]

হানাফি ও মালিকি মাজহাবের কোনো কিতাবে অগ্রাধিকারস্বত্ব বিক্রি সম্পর্কে কোনো আলোচনা পাইনি। তবে তারা একথা বলেছেন যে, সীমানা দেওয়ার মাধ্যমে জমি চাষাবাদ ও সেটির মালিক হওয়ার ব্যাপারে অগ্রাধিকার সৃষ্টি হয়। তবে এ অধিকার বিক্রয় করা সম্পর্কে তাদের থেকে কোনো বক্তব্য আমি পাইনি। তাদের অন্যান্য বক্তব্যের ওপর কিয়াস করলে বোঝা যায় যে, তাদের কাছে এ ধরনের অধিকার বিক্রয় করা জায়েজ নেই। তবে সমঝোতার মাধ্যমে বিনিময় নিয়ে সেখান থেকে সরে যাওয়া জায়েজ আছে। সুতরাং অগ্রাধিকার স্বত্ব বিক্রয়ের হুকুমের সারসংক্ষেপ হলো, যদিও কিছু ফকিহ এ ধরনের স্বত্ব বিক্রয়কে জায়েজ বলেছেন। কিন্তু তাদের অধিকাংশ না জায়েজের পক্ষে। তবে তাদের কাছে সমঝোতার ভিত্তিতে বিনিময় নিয়ে স্বত্বত্যাগ জায়েজ আছে। মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

চুক্তি স্বত্ব

স্বত্বের তৃতীয় প্রকারকে আমরা চুক্তি স্বত্ব বলে নামকরণ করতে পারি। এ স্বত্ব থেকে আমাদের উদ্দেশ্য হলো কারও সঙ্গে কোনো চুক্তি করা বা চুক্তিকে বহাল রাখার অধিকার। যেমন : বাড়ি ও দোকানের পজিশন। কেননা, এটি হলো বাড়ি বা দোকানের মালিকের সঙ্গে ইজারা চুক্তি করা বা বাকি রাখার অধিকার। অনুরূপ সরকারি বা ওয়াকফ এস্টেটের চাকরি। কারণ, সেটি হলো সরকার বা ওয়াকফের

[১২২] শরহে মুনতাহাল ইরাদাত, আল্লামা বুহুতি রহ.-এর রচিত, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৬৪।
[১২৩] শরহে মুনতাহাল ইরাদাত, আল্লামা বুহুতি রহ.-এর রচিত, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৬৪।

দায়িত্বশীলের সঙ্গে ইজারা চুক্তি বহাল রাখার অধিকার। এ দুই প্রকারের অধিকারের বিনিময় নেওয়া সম্পর্কে ফকিহগণ আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে ফকিহগণ যে আলোচনা করেছেন তার মূলকথা এখানে আলোচনা করবো। মহান আল্লাহ তাওফিকদাতা।

ক. অর্থের বিনিময়ে চাকরি থেকে পদত্যাগ করা

কেউ যদি কোনো ওয়াকফ স্টেটে চাকরিজীবি হয়, যেখান থেকে সে বেতন পায়। যেমন : মসজিদের ইমাম, মুআজ্জিন বা অন্য কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত। ওয়াকফ স্টেটের শর্তানুযায়ী তার এই দায়িত্বটি যদি স্থায়ী হয় তাহলে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি জীবনভর তার চুক্তি বহাল রাখা এবং ইজারা চুক্তিকে মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘ করার মালিক। এ ধরনের অধিকারের বিনিময় নেওয়া সম্পর্কে ফকিহগণ আলোচনা করেছেন। তবে বিক্রয়ের পদ্ধতিতে এ ধরনের অধিকারের বিনিময় নেওয়াকে কেউ জায়েজ বলেননি। কিন্তু সমঝোতা ও স্বত্বত্যাগের মাধ্যমে তার বিনিময় নেওয়ার বৈধতার ব্যাপারে ফকিহদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। সুতরাং তাদের অনেকে এমন দলিল দিয়ে সেটিকে নিষিদ্ধ করেছেন যে, এটি হলো নিরেট স্বত্ব, যার বিনিময় নেওয়া জায়েজ নেই। আবার অনেকে সেটিকে জায়েজ বলেছেন।

হানাফি মাজহাব

হানাফি মাজহাবের মুতাআখখিরিনদের একটি জামাত বিনিময় নিয়ে স্বত্বত্যাগ করা জায়েজ বলেছেন। আদ্দুররুল মুখতার' কিতাবে বর্ণিত হয়েছে—

وفي الأشباه : « لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة ، وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف » . وفيها في آخر بحث تعارض العرف مع اللغة : « المذهب عدم اعتبار العرف الخاص . لكن أفتى كثير باعتباره ، وعليه فيفتي بجواز النزول عن الوظائف بمال.

'আল-আশবাহ কিতাবে আছে যে, নিরেট স্বত্বের বিনিময় নেওয়া জায়েজ নেই। যেমন : শোফার স্বত্ব। এ মাসআলার ওপর ভিত্তি করে ওয়াকফের দায়িত্বের বিনিময় নেওয়া জায়েজ নেই। আশবাহ কিতাবের

تعارض العرف مع اللغة 'সামাজিক প্রচলন অভিধানের অর্থের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলে' শিরোনামের শেষে আছে, আসল মাজহাব হলো বিশেষ কোনো সামাজিক প্রচলন গ্রহণযোগ্য নয়। তবে অনেক ফকিহ্ সেটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে ফতোয়া দিয়েছেন। আর এই ফতোয়ার ওপর নির্ভর করে অর্থের বিনিময়ে ওয়াকফের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করাকে জায়েজের ফতোয়া দেওয়া হয়।'[১২৪]

আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ. এ মাসআলাটির অনেক দীর্ঘ বিশ্লেষণ করেছেন। আর তিনি এ কথাটি প্রমাণ করেছেন যে, এর জায়েজ হওয়া বিশেষ সামাজিক প্রচলনের ওপর নির্ভরশীল নয়। বরং অনুরূপ ফিকহি মাসআলার ওপর তার বৈধতা নির্ভরশীল। আর সেটিকে শোফার অধিকারের ওপর কিয়াস করা অযৌক্তিক। কারণ এই আলোচনার শুরুতে আল্লামা বিরি ও অন্যান্যদের থেকে উল্লেখ করেছি যে, হক্কে শোফা হলো তার অধিকারী হতে সমস্যার প্রতিকার হিসেবে অনুমোদিত। আর সমস্যার প্রতিকার হিসেবে যেসব অধিকার অনুমোদিত হয়, সেগুলোর বিনিময় নেওয়া জায়েজ নেই। আর চাকরির অধিকারটি এমন একটি অধিকার, যেটি সত্তাগতভাবে তার মালিকের জন্য প্রমাণিত। ফলে তার বিনিময় নেওয়া হারাম হবে না। যেমন : কিসাস ও অন্যান্য সত্তাগত অধিকারের বিনিময় নেওয়া হারাম হয় না। এ মূলনীতির ওপর নির্ভর করে আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ. বলেছেন স্বত্ব বা অধিকারের বিনিময় নেওয়া নাজায়েজ হওয়ার হুকুমটি ব্যাপক নয়। এরপর নিচের কথা বলে তার আলোচনা শেষ করেছেন—

ورأيت بخط بعض العلماء عن المفتي أبي السعود أنه أفتى بجواز أخذ العوض في حق القرار والتصرف وعدم الرجوع . وبالجملة فالمسألة ظنية ، والنظائر المتشابهة للبحث فيها مجال ، وإن كان الأظهر فيها ما قلنا ، فالأولى ما قاله في البحر من أنه ينبغي الإبراء العام بعده.

'মুফতি আবু সাউদ রহ. থেকে নকল করা কিছু আলেমদের লেখা যাতে দেখেছি। বসবাস, ব্যবহার ও ফিরিয়ে না নেওয়ার অধিকারের বিনিময় নেওয়া জায়েজের পক্ষে তিনি ফতোয়া দিয়েছেন। মোটকথা, এ মাসআলাটি একটি ধারণা নির্ভর মাসআলা। আর তার অনুরূপ

[১২৪] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫২০।

মাসআলাগুলো সাদৃশ্যময়। ফলে সেখানে আলোচনা করার সুযোগ রয়েছে। যদিও বেশি স্পষ্ট সেটি, যা উপরে উল্লেখ করেছি। তবে বাহরুর রায়েক কিতাবে যা বলা হয়েছে তা আরও উত্তম। সেটি হলো, অন্যকে সব ধরনের দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া উচিত।'[১২৫]

শাফিয়ি মাজহাব

অনুরূপভাবে শাফিয়ি মাজহাবের মুতাআখখিরিন আলেমগণ অর্থের বিনিময়ে দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করা জায়েজের ফতোয়া দিয়েছেন। আল্লামা রামলি রহ. বলেন—

وأفتي الوالد رحمه الله تعإلى بحل النزول عن الوظائف بالمال ، أي لأنه من أقسام الجعالة فيستحقه النازل ويسقط حقه.

'আমার পিতা রহ. অর্থের বিনিময়ে দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করা জায়েজের ফতোয়া দিয়েছিলেন। কেননা, এটি কমিশনের একটি প্রকার। ফলে পদত্যাগকারী অর্থ পেয়ে যাবে এবং তার অধিকার রহিত হবে।'[১২৬]

আল্লামা শাবরামাললুসি রহ. নিজ টীকায় এ মতামতকে সমর্থন করেছেন এবং এর ওপর নির্ভর করে অর্থের বিনিময়ে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রাপ্ত রিলিফের অধিকার থেকে সরে দাঁড়ানোকে জায়েজ বলেছেন।[১২৭] তবে তিনি এ কথা বলেছেন যে, এ হুকুমটি শুধু স্থায়ী ওয়াকফ স্টেটের চাকরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর যেসব রাষ্ট্রীয় চাকরির কোনো স্থায়িত্ব নেই, সেসব ক্ষেত্রে বিনিময় নিয়ে পদত্যাগ করা জায়েজ নেই। আল্লামা শাবরামাললুসি রহ. বলেন—

وأما المناصب الديوانية ، كالكتبة الذين يقررون من جهة الباشا فيها ، فالظاهر أنهم إنما يتصرفون فيها بالنيابة عن صاحب الدولة ، في ضبط ما يتعلق به من المصالح فهو مخير بين إبقائهم وعزلهم ولو بلا حجة

[১২৫] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫২০।

[১২৬] নিহায়াতুল মোহতাজ, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪৭৮।

[১২৭] রিলিফ কার্ড হলো, রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রাপ্ত নির্ধারিত পরিমাণ অর্থের কার্ড। হানাফি মাজহাব অনুযায়ী এগুলো বিক্রি করা জায়েজ নেই। কেননা, সেটি হবে ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয় করার অন্তর্ভুক্ত।

فليس لهم يد حقيقة على شيء ينزلون عنه ، بل متي عزلوا أنفسهم انعزلوا ، وإذا أسقطوا حقهم عن شيء لغيرهم ، فليس لهم العود إلا بتولية جديدة ممن له الولاية ، ولا يجوز لهم أخذ عوض على نزولهم.

'আর রাষ্ট্রীয় চাকরির বিষয় হলো, যেমন : মন্ত্রীর পক্ষ থেকে রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব প্রাপ্তি। এ ধরনের দায়িত্বের বিষয়টি হলো, তারা সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে উপকারিতার ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তাদেরকে ওই পদে রাখা এবং পদচ্যুত করার ক্ষমতা সরকারের হাতে। সরকার ইচ্ছে করলে কোনো ধরনের কারণ ছাড়া তাদেরকে পদচ্যুত করতে পারে আবার পদে বহালও রাখতে পারে। সুতরাং তাদের এমন কোনো অধিকার নেই যা থেকে তারা বিনিময় নিয়ে পদত্যাগ করতে পারে, বরং যখনই তারা পদত্যাগ করবে, তখনই পদচ্যুত হবে। আর তারা যখন নিজের অধিকার অন্যকে দিয়ে দেবে, তখন তারা তাদের ব্যাপারে দায়িত্বশীলদের অনুমোদন ছাড়া সে পদে ফিরতে পারবে না। আর তাদের জন্য নিজেদের পদ ছেড়ে দেওয়ার কারণে কোনো বিনিময় নেওয়া জায়েজ হবে না।'[১২৮]

হাম্বালি মাজহাব

হাম্বালি মাজহাবেও অনুরূপ হুকুম পাওয়া যায়। তারা উল্লেখ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো ওয়াকফ স্টেটে দায়িত্ব পাবে, সে ওই পদের ব্যাপারে বেশি হকদার হবে। আর অন্যের জন্য পদটি ছেড়ে দেওয়াও জায়েজ আছে। কিন্তু পদটি বিক্রি করা জায়েজ নেই।[১২৯] তবে আল্লামা বুহুতি রহ. বলেন, বিক্রয় ছাড়া সমঝোতার পদ্ধতিতে বিনিময় নিয়ে ওই পদ ছেড়ে দেওয়া জায়েজ আছে। আল্লামা বুহুতি রহ. এ ধরনের বেশকিছু মাসআলা উল্লেখ করার পর বলেন—

(وليس له) ، أي لمن قلنا إنه أحق بشيء من ذلك السابق (بيعه)

---

[১২৮] হাশিয়াতু শাবরামাললুসি আলা নিহায়াতিল মোহতাজ, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৪৭৮।

[১২৯] আল-ইনসফ, আল্লামা মুরদাবি রহ.-এর রচিত. খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩৭৬। কাশশাফুল কেনা, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২১৬।

، لأنه لم يملكه كحق الشفعة قبل الأخذ ، وكمن سبق إلى مباح ، لكن النزول عنه بعوض لا على وجه البيع جائز، كما ذكره ابن نصر الله قياسا على الخلع.

'যে ব্যক্তি কোনো জিনিসের ব্যাপারে বেশি হকদার হবে, তার জন্য ওই অধিকারটি বিক্রয় করা জায়েজ নেই। কারণ, এখনো পর্যন্ত সে ওই জিনিসের মালিক হতে পারেনি। যেমন : শোফার হক পাওয়ার আগে সেটি বিক্রি করা জায়েজ নেই, কোনো বৈধ জিনিসের দিকে আগে যাওয়ার কারণে সে ওই বস্তুর হকদার হয়ে যায় ঠিকই, তবে সে হকটি বিক্রি করা জায়েজ নেই। তবে বিক্রয় ছাড়া অন্যভাবে বিনিময় নিয়ে পদ ছেড়ে দেওয়া জায়েজ আছে। আল্লামা ইবনু নাসরুল্লাহ খুলা তালাকের ওপর কিয়াস করে অনুরূপ বলেছেন।'[১৩০]

মালিকি মাজহাব

আমার দুর্বল অনুসন্ধানে দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ সম্পর্কে মালিকি মাজহাবে স্পষ্ট কোনো বক্তব্য পাইনি। তবে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত রেশনকার্ড বিক্রয়কে তারা জায়েজ বলেছেন। ফলে অনেক সময় দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করার বিষয়টিকে তার ওপর কিয়াস করা হয়। মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

অনেক সময় অর্থের বিনিময়ে দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করার মাসআলার বৈধতার পক্ষে হাসান ইবনু আলি রা. কর্তৃক মুআবিয়া রা.-এর জন্য খিলাফত থেকে পদত্যাগের বিষয়টির মাধ্যমে দলিল দেওয়া হয়। কারণ, অর্থের বিনিময়ে তিনি মুআবিয়া রা.-এর সঙ্গে সমঝোতা করেছিলেন। আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রহ. এই হাদিসের আলোচনায় বলেন—

وفيه جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأي في ذلك صلاحا للمسلمين، وجواز أخذ المال على ذلك وإعطائه بعد استيفاء شرائطه بأن يكون المنزول له أولى من النازل ، وأن يكون المبذول من مال الباذل.

'এ হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, খলিফা যদি মুসলিমদের জন্য ভালো মনে করেন, তাহলে নিজেকে খলিফার পদ থেকে সরিয়ে নেওয়া জায়েজ

[১৩০] শরহে মুনতাহাল ইরাদাত, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৬৪।

আছে। আর এটিরও বৈধতা পাওয়া যায় যে, এ ধরনের পদত্যাগের ক্ষেত্রে বিনিময় নেওয়া এবং শর্তপূরণ হওয়ার পর দায়িত্ব হস্তান্তর করা। সে শর্ত হলো, যে খলিফা পদত্যাগ করছে তিনি অপেক্ষা পরবর্তী খলিফা ভালো হবে এবং তার পক্ষ থেকে বিনিময়টি দিতে হবে।'[১৩১]

ফকিহদের আলোচনা থেকে এ বিষয়ের যে সারনির্যাস বের হয় সেটি হলো, তাদের অভিমত অনুযায়ী দায়িত্বের/চাকরির অধিকার বিক্রি করা জায়েজ নেই। পরবর্তী অধিকাংশ আলেমদের নিকট দায়িত্ব/চাকরি থেকে পদত্যাগ করা এবং যার জন্য পদত্যাগ করবে তার থেকে অর্থ নেওয়া জায়েজ আছে।

এরপর ফকিহদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতানৈক্য হয়েছে যে, যার জন্য পদত্যাগ করলো, ওই পদটি কি তার জন্য নির্ধারিত হয়ে যাবে? এ ক্ষেত্রে একদল আলেম বলেছেন যে, পদটি তার জন্য নির্ধারিত হবে না। বরং এ ব্যাপারে দায়িত্বশীল ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকবে যে, সে তাকে বা অন্য কাউকে ওই পদে নিয়োগ করতে পারে। দায়িত্বশীল ব্যক্তি যদি তাকে নিয়োগ না করে, তাহলে সে পদত্যাগকারীকে যে অর্থ দিয়েছে সেটি ফেরত নিতে পারবে না। কারণ পদত্যাগকারী তার সাধ্যের কাজটি করেছে। সেটি হলো পদত্যাগ করা। ফলে চুক্তি অনুযায়ী সে তার অর্থের অধিকারী হয়ে গেছে। এ হলো শাফিয়ি মাজহাবের আল্লামা রামলি ও শাবরামাললুসি রহ. [১৩২] ও হানাফি মাজহাবের আল্লামা হামাবি ও আবু সাউদ রহ.-এর বক্তব্য।'[১৩৩]

তবে আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ. বলেন—

ثم إذا فرغ عنه لغيره، ولم يوجهه السلطان للمفروغ له، بل أبقاه على الفارغ أو وجهه لغيرهما، فينبغي أن يثبت الرجوع للمفروغ له على الفارغ ببدل الفراغ، لأنه لم يرض بدفعه إلا بمقابلة ثبوت ذلك الحق له، لا بمجرد الفراغ وإن حصل لغيره. وبهذا أفتي في الإسماعيلية والحامدية وغيرهما، خلافا لما أفتى به بعضهم من عدم الرجوع، لأن الفارغ فعل ما في وسعة وقدرته، إذا لا يخفى أنه غير مقصود من الطرفين، ولا سيما إذا أبقي السلطان والقاضي التيمار أو الوظيفة على

[১৩১] উমদাতুল কারি, পরিচ্ছেদ: ফিতান, খণ্ড : ২৪, পৃষ্ঠা : ২০৮।

[১৩২] নিহায়াতুল মোহতাজ, খণ্ড : । ৬, পৃষ্ঠা : ৪৭৮।

[১৩৩]শরহু আশবাহ ওয়ান নাজায়ের, আল্লামা হামাবি রহ.-এর রচিত, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৩৯।

الفارغ ، فإنه يلزم اجتماع العوضين في تصرفه ، وهو خلاف قواعد الشرع فافهم.

'দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যখন অন্যের জন্য তার পদটি ছেড়ে দিলো, আর যার জন্য পদত্যাগ করেছে, সরকার তাকে সে পদে নিয়োগ করলো না। বরং পদত্যাগকারীকে ওই পদে বহাল রাখলো বা অন্য কাউকে সেখানে নিয়োগ করলো, তাহলে এ ক্ষেত্রে যার জন্য পদত্যাগ করা হয়েছিলো সে তার বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত নিতে পারবে। কারণ, সে ওই পদ পাওয়া ছাড়া অর্থ বিনিয়োগে রাজি নয়। শুধু পদশূন্য হওয়ার ওপরও বিনিয়োগ করেনি যদিও পদটি অন্য কেউ পেয়ে যাক না কেন। ইসমাইলিয়াত, হামিদিয়াত ও অন্যান্য কিতাবে এ অভিমতের ওপর ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। এ ফতোয়াটি সেসব ব্যক্তিদের অভিমতের বিপরীত, যারা বলেছেন যে, কোনো অবস্থাতেই বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত নিতে পারবে না। কারণ, পদত্যাগকারী তার সাধ্যের কাজটি করেছে। এ বিষয়টি অস্পষ্ট নয় যে, শুধু পদত্যাগ করা উভয় পক্ষের আসল উদ্দেশ্য নয়। বিশেষ করে, সরকার বা কাজি যখন পদত্যাগকারীকেই সে পদে বা দায়িত্বে নিয়োগ করে। কারণ, তখন তার অধীনে দুটি বিনিময় একত্রিত হচ্ছে। আর এটি শরয়ি নীতি বহির্ভূত। অতএব বোঝার চেষ্টা করুন।'[১৩৪]

(শায়খুল ইসলাম আল্লামা তকি উসমানি দা. বা. বলেন) এই দুর্বল বান্দার কাছে যা স্পষ্ট হয়, তা হলো রাষ্ট্রপ্রধান বা কাজি যখন পদত্যাগকারীকে তার আগের পদে বহাল রাখবে, তখন অর্থ ফেরত দেওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট। কেননা, আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ. বলেছেন যে, তখন তার ক্ষেত্রে দুটি বিনিময় একত্রিত হওয়া আবশ্যক হচ্ছে। কারণ, সে পদত্যাগ ও পদশূন্য করার বিনিময়ে অর্থের অধিকারী হয়েছিলো। আর বাস্তবে পদশূন্য হওয়া ছাড়া যথার্থভাবে এটি পাওয়া যায় না। আর এখানে সে বাস্তবতাটি পাওয়া যায়নি। ফলে সে অর্থ পাবে না। বরং তার ওপর ওয়াজিব হলো গৃহীত অর্থ ফেরত দেওয়া।

আর কাজি বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি তার পদত্যাগকে বহাল রাখে এবং

---

[১৩৪] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫২০-৫২১।

ওই পদ শূন্য করে দেয়। কিন্তু কাজি বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যার জন্য পদত্যাগ করা হয়েছে তাকে ওই পদে নিয়োগ করলো না। বরং তৃতীয় কাউকে নিয়োগ করলো, তাহলে এ ক্ষেত্রে শরয়ি নীতির দাবি হলো, যার জন্য পদত্যাগ করা হয়েছে, সে পদত্যাগকারী থেকে অর্থ ফেরত নিতে পারবে না। কারণ, বিক্রয়ের পদ্ধতিতে পদত্যাগের বিনিময় নেওয়াকে ফকিহগণ জায়েজ বলেননি। বরং সমঝোতা ও চুক্তির মাধ্যমে তার বিনিময় নেওয়াকে জায়েজ বলেছেন। আর অধিকার বিক্রি করা এবং বিনিময় নিয়ে পদত্যাগের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হলো, বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতা যে জিনিসের অধিকারী থাকে ক্রেতা সেটির মালিক হয়ে যায়। আর পদত্যাগের ক্ষেত্রে যার জন্য পদত্যাগ করা হচ্ছে, সে ওই পদের মালিক হয় না। বরং পদত্যাগকারী পদত্যাগের মাধ্যমে তার অধিকার থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে যার জন্য পদত্যাগ করা হচ্ছে তার প্রতিদ্বন্দ্বী দূর হওয়া ছাড়া আর কোনো উপকার নেই।

আল্লামা করাফি রহ. স্থানান্তর ও রহিতকরণ নীতির মাঝে পার্থক্য নিয়ে খুব স্পষ্ট আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন—

اعلم أن الحقوق والأملاك ينقسم التصرف فيها إلى نقل وإسقاط ، فالنقل ينقسم إلى ما هو بعوض في الأعيان ، كالبيع والقرض ؛ وإلى ما هو في المنافع ، كالإجارة والمساقاة والمزارعة والقراض والجعالة ؛ وإلى ما هو بغير عوض ، كالهدايا والوصايا والعمرى والوقف والهبات والصدقات والكفارات والزكاة والمسروق من أموال الكفار والغنيمة في الجهاد ، فإن ذلك كله نقل ملك في أعيان بغير عوض .

وأما الإسقاط فهو إما بعوض كالخلع ، والعفو على مال والكتابة وبيع العبد من نفسه والصلح على الدين والتعزير ، فجميع هذه الصور يسقط فيها الثابت ، ولا ينتقل إلى الباذل ما كان يملكه المبذول له من العصمة وبيع العبد ونحوهما.

'মনে রেখো, স্বত্ব ও মালিকানার ব্যবহারটি দুইভাবে হয়ে থাকে। ১. হস্তান্তর ২. রহিত করণ। আর বস্তুর হস্তান্তর হয়ে থাকে তিনভাবে। ১. বস্তুর ক্ষেত্রে বিনিময় নেওয়ার মাধ্যমে। যেমন : বিক্রয়, ঋণ। ২. উপকারিতার ক্ষেত্রে বিনিময় নেওয়ার মাধ্যমে। যেমন : ইজারা, পানি

সেচ বা চাষাবাদের জন্য জমি বর্গা ইত্যাদি। ৩. কোনো বিনিময় ছাড়া স্থানান্তর করা। যেমন : উপহার, ওসিয়ত, ওয়াকফ, দান, সদাকা, কাফফারা, জাকাত, কাফেরদের সম্পদ থেকে চুরিকৃত মাল, যুদ্ধে পাওয়া গনিমত, কোনো ধরনের বিনিময় ছাড়া এগুলোর মালিকানা স্থানান্তরিত হয়েছে।

আর মালিকানা রহিত করার উদাহরণ হলো, খুলা তালাক, অর্থের বিনিময়ে ক্ষমা করে দেওয়া, কিতাবাত চুক্তিতে ছাড় দেওয়া, দাসকে তার কাছেই বিক্রি করা, ঋণ বা জরিমানার ওপর সমঝোতা চুক্তি করে নেওয়া। এসব ক্ষেত্রে আগের মালিকানাটি রহিত হয়ে যাবে। তবে অর্থ প্রদানকারীর মালিকানায় অর্থ গ্রহিতার মালিকানাভুক্ত জিনিসগুলো স্থানান্তর হবে না। ’[১৩৫]

ফকিহদের বক্তব্য থেকে এ বিষয়টি প্রমাণিত হলো যে, সমঝোতা ও চুক্তির মাধ্যমে দায়িত্ব থেকে পদত্যাগের বিনিময় নেওয়াকে তারা জায়েজ বলেছেন। তবে বিক্রয় এবং দায়িত্ব হস্তান্তরের পদ্ধতিতে তার বিনিময় নেওয়া জায়েজ নেই। যেমন আল্লামা বুহুতি রহ.-এর শরহু মুনতাহাল ইরাদাত কিতাবের উদ্ধৃতিতে ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং বিক্রয় ও পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর মধ্যে পার্থক্য করা আবশ্যক। আর সেটি এভাবে যে, পদত্যাগকারী কেবল পদত্যাগ করার মাধ্যমেই বিনিময় পেয়ে যাবে। তবে যার জন্য পদত্যাগ করছে, পদটি তার কাছে চলে যাবে না। আল্লাহই অধিক অবগত।

বাড়ি ও দোকানের পজিশন

এ ধরণের স্বত্ব ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে বিভিন্ন দেশে যার প্রচলন ঘটেছে তা হলো পজিশন বিক্রয়। আর পজিশন বলা হয় কোনো বাড়ি বা দোকানে থাকার অধিকার বা স্বত্বকে। অনেক সময় বিল্ডিংয়ের মালিক দীর্ঘ মেয়াদের জন্য ভাড়া দেয়। এ ক্ষেত্রে ভাড়ার চুক্তির সময় মাসিক বা বাৎসরিক ভাড়া ছাড়াও ভাড়া-গ্রহীতা থেকে নির্দিষ্ট অঙ্কের একটি অতিরিক্ত অর্থ নিয়ে থাকে। এই অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে ভাড়াগ্রহীতা তার চুক্তিকে দীর্ঘ মেয়াদি করার অধিকারী হয়। এরপর

---

[১৩৫] আল-ফুরুক, ইমাম করাফি রহ.-এর রচিত, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১১০। ফরক নং, ৭৯।

অনেক সময় ভাড়াগ্রহীতা তার এই অধিকারকে অন্যের কাছে হস্তান্তর করে এবং তার থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নেয়। যার বিনিময়ে দ্বিতীয় ব্যক্তি বিল্ডিংয়ের মালিকের সঙ্গে ভাড়া চুক্তিকে দীর্ঘ মেয়াদি রাখার অধিকারী হয়। আর দোকানের মালিক যদি দোকান ফেরত নিতে চায়, তাহলে তাদের মধ্যে সমন্বয়ের ভিত্তিতে ভাড়াগ্রহীতাকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থ দিতে হয়। এই অতিরিক্ত অর্থকে বিভিন্ন আরব দেশে 'খুলু, জিলসা, নামে নামকরণ করা হয়। আর আমাদের দেশে 'পাগড়ি ও সালামি, (পজিশন) বলে অভিহিত করা হয়।

এ ধরনের পজিশনের হুকুম হলো, সেগুলো নেওয়া জায়েজ নেই। কারণ, সেগুলো ঘুষ বা নিরেট স্বত্বের বিনিময়। তবে অনেক আলেম এটি জায়েজের ফতোয়া দিয়েছেন। সর্বপ্রথম যিনি পজিশনকে জায়েজ বলে ফতোয়া দিয়েছেন, তিনি হলেন আল্লামা নাসিরুদ্দিন লাকানি রহ.। তিনি ছিলেন দশম শতাব্দীর মালিকি মাজহাবের আলেমদের একজন। এরপর আলেমেদের একটি জামাত তার এই ফতোয়ার অনুসরণ করেছেন। আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ. বলেন—

> وقد اشتهر نسبه مسألة الخلو إلى مذهب الإمام مالك ، والحال أنه ليس فيه نص عنه ، ولا عن أحد من أصحابه ، حتى قال البدر القرافي من المالكية : إنه لم يقع في كلام الفقهاء التعرض لهذه المسألة ، وإنما فيها فتيا للعلامة ناصر الدين اللقاني المالكي ، بناها على العرف وخرجها عليه ، وهو من أهل الترجيح ، فيعتبر تخريجه وإن نوزع فيه ، وقد انتشرت فتياه في المشارق والمغارب وتلقاها علماء عصره بالقبول.

> 'পজিশনের মাসআলাটি মালিকি মাজহাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি সর্বজন পরিচিত। তবে বাস্তব অবস্থা হলো, ইমাম মালিক রহ. বা তার ছাত্রদের এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো বক্তব্য নেই। এমনকি মালিকি মাজহাবের বদর আল-করাফি রহ. বলেছেন, ফকিহদের আলোচনাতে এ মাসআলাটি আসেইনি। তবে এ ব্যাপারে আল্লামা নাসিরুদ্দিন লাকানি মালিকি রহ.-এর একটি ফতোয়া রয়েছে। সামাজিক প্রচলনের ওপর নির্ভর করে এ ফতোয়াটি দিয়েছিলেন। তিনি হলেন আহলে তারজিহদের একজন (অর্থাৎ এমন ফকিহ যিনি একাধিক মত থেকে কোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন।) সুতরাং এ ব্যাপারে বিতর্ক থাকলেও তার দেওয়া মাসআলাটি গ্রহণ করা উচিত। তার

এই ফতোয়াটি পূর্ব-পশ্চিম দিগন্তে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং তার সমকালীন আলেমগণ সেটিকে গ্রহণ করেছেন।'[১৩৬]

হানাফি মাজহাবের অনেক ফকিহ্ ফাতাওয়া তাতার খানিয়াতে উল্লিখিত একটি মাসআলার মাধ্যমে পজিশন জায়েজ হওয়ার পক্ষে দলিল দিয়ে থাকেন। সে ফতোয়াটি এরূপ—

رجل باع سكني له في حانوت لغيره ، فأخبر المشتري أن أجرة الحانوت كذا ، فظهر أنها أكثر من ذلك ، قالوا : ليس له أن يرد السكني بهذا العيب.

'কেউ অন্যের মালিকানাধীন দোকানে তার থাকার স্বত্বকে বিক্রি করলো। বিক্রেতা ক্রেতাকে জানালো যে, ভাড়া এত টাকা। পরবর্তীসময়ে প্রকাশ পেলো এই স্থানের ভাড়া এর চেয়ে বেশি। এ ক্ষেত্রে ফকিহ্গণ বলেছেন, এই দোষের কারণে সে বিক্রয়চুক্তি বাতিল করতে পারবে না।'

এ মাসআলার মাধ্যমে যারা পজিশন জায়েজের পক্ষে দলিল দিয়েছেন, তারা ধারণা করেছেন যে, মাসআলায় উল্লিখিত বসবাসের অধিকারটিই হলো পজিশন। তবে আল্লামা শুরুম্বুলালি রহ. বিশ্লেষণ করেছেন যে, এ মাসআলাতে উল্লিখিত বসবাসের অধিকার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দোকানের সঙ্গে সম্পৃক্ত আরও কিছু আসবাবপত্র যুক্ত হওয়া। সুতরাং মাসআলায় উল্লিখিত অধিকারটি প্রচলিত পজিশন নয়। অতএব হানাফিদের কাছে এ মাসআলার মাধ্যমে পজিশন জায়েজ হওয়ার দলিল দেওয়া ঠিক হবে না। সুতরাং বসবাসের অধিকার ক্রয় করার অর্থ হলো হুবহু দোকান ক্রয় করা। পজিশন ক্রয় করা নয়। এরপর আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ. ফাতাওয়ায়ে খাইরিয়্যাহ্ থেকে বর্ণনা করেন যে, কোনো মালিকি মাজহাবের কাজি যদি পজিশন আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়, তাহলে তার সিদ্ধান্ত সহিহ্ এবং কার্যকরী হবে। আলোচনার শেষ পর্যায়ে তিনি বলেন—

وممن أفتي بلزوم الخلو الذي يكون بمقابلة دراهم يدفعها للمتولي أو المالك العلامة المحقق عبد الرحمن أفندي العمادي صاحب هدية ابن العماد ، وقال : فلا يملك صاحب الحانوت إخراجه وإجارتها لغيره ، ما لم يدفع له المبلغ المرقوم، فيفتي بجواز ذلك للضرورة.

---

[১৩৬] রদ্দুল মুহতার, অধ্যায়: বুয়ু, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫২১।

'ওয়াকফের দায়িত্বপ্রাপ্তকে বা মালিককে অতিরিক্ত অর্থ দেওয়ার মাধ্যমে যে পজিশন নেওয়া হয়, সেটি আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে যিনি ফতোয়া দিয়েছেন তিনি হলেন, হাদিয়াতু ইবনুল ইমাদ কিতাবের লেখক আল্লামা মুহাক্কিক আবদুর রহমান আফিন্দি আল-ইমাদি রহ.। তিনি বলেন, মালিককে দেওয়া অর্থ ফেরত দেওয়া ছাড়া দোকানের মালিক তাকে বের করতে বা অন্যের কাছে সেটি ভাড়া দিতে পারবে না। সুতরাং প্রয়োজনের কারণে এটি জায়েজের ফতোয়া দেওয়া হচ্ছে।'

আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ. -এর এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, তিনি আমাদের যুগে প্রচলিত পজিশন জায়েজের পক্ষে ঝুকেছেন। তবে মালিকি মাজহাব, যাদের দিকে পজিশন জায়েজ হওয়ার মাসআলাকে সম্পৃক্ত করা হয়, তাদের কিতাব দেখার পর আমার মনে হয়েছে যে, তারা যে পজিশন জায়েজের ফতোয়া দিয়েছেন, সেটি আমাদের যুগের প্রচলিত পজিশন নয়। আমাদের যুগে পজিশনকে শুধু ভাড়া দেওয়ার অধিকার মনে করা হয়। ভাড়াগ্রহীতার পক্ষ থেকে দোকান বা বাড়িতে কোনো জিনিস সংযুক্ত করা হয় না। মালিকি মাজহাবে এ ধরনের পজিশন জায়েজের কথা পাইনি। বরং বিপরীতটি পেয়েছি। মালিকি মাজহাবে যে পজিশনের বিনিময় নেওয়াকে জায়েজ বলা হয়েছে, সেগুলো ভিন্ন কিছু পদ্ধতি। ভাড়াগ্রহীতার পক্ষ থেকে সেগুলোর মধ্যে দোকান বা বাড়িতে স্বতন্ত্র জিনিস থাকে। এখানে মালিকি মাজহাবের দুজন ফকিহের বক্তব্য উদ্ধৃত করছি। যার মাধ্যমে বিষয়টি একেবারেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। আল্লামা আদাবি রহ. খিরাশির কিতাবের ব্যাখ্যায় বলেন—

اعلم أن الخلو يصور بصور : منها أن يكون الوقف آيلا للخراب ، فيكريه ناظر الوقف لمن يعمره ، بحيث يصير الحانوت مثلا يكرى بثلاثين نصف فضة ، ويجعل عليه لجهة الوقف خمسة عشر ، فصارت المنفعة مشتركة بينهما ، فما قابل الدراهم المصروفة من المنفعة هو الخلو ، فيتعلق به البيع والوقف والإرث والهبة وغير ذلك ويقضى منه الدين وغير ذلك ، ولا يسوغ للناظر إخراجه من الحانوت ولو وقع عقد الإيجار على سنين معينة كتسعين سنة ، ولكن شرط ذلك أن لا يكون ريع يعمر به .

الثانية : أن يكون لمسجد مثلا حوانيت موقوفة عليه ، واحتاج

المسجد للتكميل أو العمارة ، ويكون الدكان يكرى مثلا الشهر بثلاثين نصفا ، ولا يكون هناك ريع يكمل به المسجد أو يعمره به ، فيعمد الناظر إلى الساكن في الحوانيت فيأخذ منه قدرا من المال يعمر به المسجد ، ويجعل عليه خمسة عشر مثلا في كل شهر. والحاصل أن منفعة الحانوت المذكورة شركة بين صاحب الخلو والوقف بحسب ما يتفق عليه صاحب الخلو والناظر على وجه المصلحة ، كما يؤخذ مما أفتى به الناصر كما أفاده (عج).

الثالثة : أن تكون أرض مجلسة ، فيستأجرها من الناظر ويبني فيها دارا مثلا ، على أن عليه في كل شهر لجهة الوقف ثلاثين نصف فضة ، ولكن الدار تكري بستين نصف فضة مثلا ، فالمنفعة التي تقابل الثلاثين الأخري ، يقال لها (خلو).

পজিশনের বিভিন্ন পদ্ধতি হতে পারে। একটি একটি করে উদাহরণ দেওয়া হলো।

১. ওয়াকফের সম্পদ ধ্বংস হওয়ার উপক্রম। সেই ওয়াকফের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এমন কারও কাছে সেটি ভাড়া দিলো, যে সেটিকে নির্মাণ করে নেবে। যেমন : দোকানের ভাড়া নির্ধারণ করা হয় ত্রিশ দিরহাম। যার মধ্যে ওয়াকফ ফান্ড পাবে পনেরো দিরহাম। (আর নির্মাণের বিনিময় হবে পনেরো দিরহাম।) ফলে দোকানের উপকারিতা উভয়ের মধ্যে অংশ বিশেষ হলো। ভাড়াগ্রহীতা যে দিরহাম ব্যয় করেছে, তার বিনিময়ে সে যে উপকারিতা পাচ্ছে সেটিই হলো পজিশন। সুতরাং এ পজিশনের মধ্যে সব ধরনের হস্তক্ষেপ করা যাবে। যেমন : ওয়াকফ করা, মিরাস জারি হওয়া, দান করা ইত্যাদি। সেটির মাধ্যমে ঋণ ইত্যাদি পরিশোধ করা যাবে। যদি দীর্ঘ মেয়াদ অর্থাৎ নব্বই বছরের জন্যও ভাড়া চুক্তি হয়ে থাকে, তাহলেও ওয়াকফের দায়িত্বপ্রাপ্তের জন্য ভাড়াগ্রহীতাকে সেখান থেকে বের করে দেওয়া জায়েজ হবে না। তবে এভাবে ভাড়া দেওয়ার জন্য শর্ত হলো, ওয়াকফের এমন কোনো আয় না থাকা যা দিয়ে সেটি নির্মাণ করা যাবে।

২. কোনো মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত কিছু দোকান আছে। মসজিদ সংস্কার বা পুণঃনির্মাণের প্রয়োজন। আর প্রতিটি দোকান মাসিক

ত্রিশ দিরহামে ভাড়া দেওয়া আছে। অন্যদিকে মসজিদ সংস্কার বা পুনঃনির্মাণের জন্য অর্থায়নের আর কোনো খাত নেই। ফলে মসজিদের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণের জন্য দোকানের ভাড়াটেদের থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নিলো। আর তাদের থেকে প্রতিমাসে ত্রিশ দিরহাম নেওয়ার পরিবর্তে পনেরো দিরহাম ধার্য করলো। সারকথা হলো, ওয়াকফ ও দোকানের পজিশনের মালিকের মধ্যে তাদের চুক্তি অনুপাতে দোকানের উপকারিতা অংশীদার হিসেবে থাকবে। যেমনটি আল্লামা নাসির রহ.-এর ফতোয়া থেকে বোঝা যায়।

৩. কেউ কোনো ওয়াকফকৃত জমি ভাড়া নিয়ে এ শর্তে সেখানে বিল্ডিং নির্মাণ করবে যে, বাড়িটির মাসিক ভাড়া হবে ষাট দিরহাম। তবে সে ওয়াকফের দায়িত্বপ্রাপ্তকে ত্রিশ দিরহাম দেবে। এ ক্ষেত্রে অবশিষ্ট ত্রিশ দিরহামের বিনিময়ে যে উপকারিতা রয়েছে সেটিকে পজিশন বলা হবে।'[১৩৭]

অনুরূপভাবে আল্লামা শায়খ মুহাম্মাদ আহমাদ উলাইশ রহ. আল্লামা নাসির রহ.-এর ফতোয়া নকল করার পর পজিশনের বিভিন্ন প্রকার উল্লেখ করেছেন। তার উল্লিখিত প্রকারগুলো হুবহু আল্লামা আদাবি রহ. থেকে বর্ণিত প্রকারের অনুরূপ। এরপর পজিশন সহিহ হওয়ার শর্তের ব্যাপারে একটি পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন—

فصل في شروط صحة الخلو. منها أن تكون الدراهم المرفوعة عائدة على جهة الوقف يصرفها في مصالحه، فما يفعل الآن من صرف الناظر الدراهم في مصالح نفسه بحيث لا يعود على الوقف منها شيء فهو غير صحيح، ويرجع دافع الدراهم بها على الناظر.

ومنها أن لا يكون للوقف ريع يعمر به، فإن كان له ريع يفي بعمارته مثل أوقاف الملوك، فلا يصح فيه خلو، ويرجع دافع الدراهم بها على الناظر. ومنها ثبوت الصرف في منافع الوقف بالوجه الشرعي ... وفائدة الخلو أنه يصير كالملك ويجري عليه البيع والإجارة والهبة والرهن ووفاء الدين والإرث كما يؤخذ من فتوى الناصر اللقاني.

[১৩৭] হাশিতুল আদাবি আলাল খিরাশি, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৭৯।

পজিশন সহিহ হওয়ার শর্তসমূহ

১. পজিশনের মাধ্যমে যে দিরহাম পাওয়া যাবে, সেগুলোকে ওয়াকফের কল্যাণে ব্যয় করতে হবে। বর্তমানে ওয়াকফের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ওয়াকফের অর্থ তার ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করছে। ফলে তার মাধ্যমে ওয়াকফ কোনো উপকৃত হতে পারছে না। এমনটি করা সহিহ নয়। এমন ক্ষেত্রে অর্থপ্রদানকারী ওয়াকফের দায়িত্বশীল থেকে তার অর্থ ফিরিয়ে নেবে।

২. ওয়াকফের এমন কোনো অর্থায়ন ব্যবস্থা থাকতে পারবে না, যার মাধ্যমে সেটি নির্মাণ করা যায়। তার যদি এমন অর্থায়ন ব্যবস্থা থাকে, যেখান থেকে সেটি নির্মাণ করা যায়। যেমন : রাষ্ট্রীয় ওয়াকফ, তাহলে সেখানে পজিশন জায়েজ নেই। পজিশন হিসেবে অর্থদাতা ওয়াকফের দায়িত্বশীল থেকে তার অর্থ ফিরিয়ে নেবে।

৩. শরিয়তসম্মত উপায়ে ওয়াকফের মুনাফা যথাস্থানে ব্যয় করতে হবে।

পজিশনের উপকারিতা হলো, সেটি মালিকানার মতো হবে। সেটি বিক্রয় করা, ভাড়া দেওয়া, দান করা, বন্ধক রাখা, ঋণ পরিশোধ করা ও সেখানে মিরাস জারি করার হুকুম বাস্তাবায়ন হবে। যেমনটি আল্লামা নাসির লাকানি রহ.-এর ফতোয়া থেকে নেওয়া হয়েছে।'[১৩৮]

মালিকি মাজহাবের ফকিহদের বক্তব্য থেকে বোঝা গেলো যে, আল্লামা লাকানি রহ. যে পজিশন জায়েজ হওয়ার পক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন এবং মালিকি মাজহাবের অনেক আলেম সেটিকে সমর্থন করেছেন তার সঙ্গে আমাদের যুগের পজিশনের কোনো মিল নেই। এই পজিশন থেকে সেটির অবস্থান অনেক দূরে। কারণ, তারা যে পজিশনকে জায়েজ বলেছেন সেটি হলো ওয়াকফের সম্পদে ভাড়াগ্রহীতা বিল্ডিং নির্মাণ করে তার বিনিয়োগকৃত অর্থ অনুযায়ী সে ওই বিল্ডিং-এর উপকারিতায় শরীক হবে। ফলে দোকানের ভাড়ার পরিমাণ থেকে তার জন্য একটি অংশ কমিয়ে দেওয়া হবে। আর সে ওই দোকানে স্থায়ীভাবে থাকার অধিকারী হবে। সুতরাং সে যখন অন্যের কাছে এই অধিকারটি বিক্রয় করবে, তখন সেটি নিরেট স্বত্ব বিক্রয় হবে না। বরং এমন উপকারিতা বিক্রি করা হবে, যেটি দোকানের বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর এই উপকারিতা তার মালিকানাধীন।

[১৩৮] ফাতহুল আলিয়্যিল মালিক, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৫১।

মালিকি মাজহাবের আলেমগণ এ ধরনের পজিশন বিক্রয়কে জায়েজ বলেছেন ওয়াকফের বিল্ডিং নির্মাণের প্রয়োজনে। এ কারণে তারা শর্তারোপ করেছেন যে, এমন পজিশন বৈধ হতে হলে নির্মাণের জন্য ওয়াকফের প্রয়োজনীয় অর্থায়ন ব্যবস্থা না থাকা। ওয়াকফের ফান্ডে যদি এমন অর্থায়নের ব্যবস্থা থাকে, তাহলে এ ধরনের পজিশন দেওয়া জায়েজ হবে না।

তবে এ কথায় কোনো সন্দেহ নেই যে, মালিকি মাজহাবের কিছু আলেম ওয়াকফহীন মালিকানা জমির ক্ষেত্রেও এ ধরনের পজিশন দেওয়াকে জায়েজ বলেছেন। তবে সে ক্ষেত্রে তারা এই শর্তারোপ করেছেন যে, ভাড়াগ্রহীতা সেখানে কোনো কিছু নির্মাণ করতে হবে বা স্বতন্ত্র কোনো কিছু বানাতে হবে। যেটিকে 'জাদক' নামে নামকরণ করা হয়। শায়খ মুহাম্মাদ উলাইশ রহ. বলেন—

ثم إن الخلو ربما يقاس عليه الجدك المتعارف في حوانيت مصر ، فإن قال قائل : الخلو إنما هو في الوقف لمصلحة ، وهذا يكون في الملك ، قيل له : إذا صح في وقف فالملك أولى ، لأن المالك يفعل في ملكه ما يشاء . نعم : بعض الجدكات بناء أو إصلاح أخشاب في الحانوت مثلا بإذن ، وهذا قياسه على الخلو ظاهر ... وبعض الجدكات وضع أمور مستقلة في المكان غير مستمرة فيه ، كما يقع في الحمامات وحوانيت القهوة بمصر ، فهذه بعيدة عن الخلوات ، فالظاهر أن للمالك إخراجها

'অনেক সময় পজিশনকে মিশরের দোকানগুলোতে প্রচলিত 'জাদক'-এর ওপর কিয়াস করা হয়। সুতরাং, যদি কেউ প্রশ্ন করে, প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ করে ওয়াকফ সম্পত্তিতে পজিশনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আর 'জাদক' হয় ব্যক্তিমালিকানাধীন বস্তুর ক্ষেত্রে। উত্তরে তাকে বলা হবে, ওয়াকফের মধ্যে যখন সহিহ আছে তখন মালিকানার ক্ষেত্রে আরও উত্তমভাবে সহিহ হবে। কারণ, মালিক তার মালিকানাধীন জিনিসের মধ্যে নিজ ইচ্ছে অনুযায়ী হস্তক্ষেপ করতে পারে। হ্যাঁ, কিছু 'জাদক' নির্মাণ বা মালিকের অনুমতিক্রমে দোকানের কাঠ সংস্কারের পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। এ ধরনের জাদককে পজিশনের ওপর কিয়াস করার বিষয়টি তো স্পষ্ট। আর কিছু জাদকের পদ্ধতি এমন হয় যে, ঘরে অস্থায়ী কিছু জিনিস তৈরি করা হয়। যেমন : মিশরের গোসলখানা ও কফি পানের ঘর। পজিশনের সঙ্গে এগুলোর তেমন মিল নেই। কারণ

এখানে স্পষ্ট যে, মালিকের পক্ষ থেকে তাদের বের করে দেওয়ার অধিকার আছে।’[১৩৯]

এখান থেকে বোঝা যায় যে, মালিকি মাজহাবের আলেমগণ আমাদের যুগের পজিশনকে, যেখানে নির্মাণ বা দোকানে স্থায়ীভাবে কোনো জিনিস থাকে না তাকে জায়েজ বলেননি। এ ব্যাপারে শেষ কথা সেটাই যা আল্লামা শুরুম্বুলালি রহ. থেকে বর্ণনা করেছিলাম। তিনি বলেছেন, শুধু এ ধরনের পজিশন বিক্রি করা জায়েজ নেই। বরং সেসব পজিশন বিক্রি করা জায়েজ, যেখানে দোকানের সঙ্গে অন্যকোনো বস্তু সংযুক্ত থাকবে। যেটিকে কখনো ‘সুকনা’ আবার কখনো ‘জাদক’ নামে অভিহিত করা হয়। মোটকথা আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ. ‘সুকনার’ আলোচনার পর তানকিহুল ফাতাওয়াল হামিদিয়া কিতাবে যা বলেছেন, তা হলো—

وهو غير الخلو الذي هو عبارة عن القدمية ووضع اليد ، خلافا لمن زعم أنه هو ، واستدل بذلك على جواز بيع الخلو ، فإنه استدلال فاسد ، لما علمت من أن السكنى أعيان قائمة مملوكة ، كما أوضحه العلامة الشرنبلالى في رسالة خاصة، لكن إذا كان هذا الجدك المسمى بالسكنى قائما في أرض وقف فهو من قبيل مسألة البناء أو الغرس في الأرض المحتكرة ، لصاحبه الاستبقاء بأجرة مثل الأرض ، حيث لا ضرر على الوقف ، وإن أبى الناظر ، نظرا للجانبين على ما مشى عليه في متن التنوير ... ولا ينافيه ما في التجنيس من أن لصاحب الحانوت أن يكلفه رفعه ، لأن ذلك في الحانوت الملك ، بقرينة ما في الفصولين : والفرق أن المالك قد يمتنع صاحبه عن إيجاره ، ويريد أن يسكنه بنفسه ، أو بيعه ، أو يعطله ، بخلاف الموقوف المعد للإيجار ، فإنه ليس للناظر إلا أن يؤجره ، فإيجاره من ذي اليد بأجرة مثله أولى من إيجاره من أجنبي لما فيه من النظر للوقف ولذي اليد.

‘সুকনা’ ও পজিশন এক নয়। কেননা সুকনা হলো পুরোনো ভাড়াটে হওয়া ও দখলদার হওয়া। এ কথাটি তাদের অভিমতের বিপরীত, যারা সুকনাকে পজিশন মনে করেছেন। আর এ ধারণার ওপর ভিত্তি করে পজিশন বিক্রয় জায়েজ হওয়ার পক্ষে দলিল দিয়েছেন। এটি একটি

[১৩৯] ফাতহুল আলিয়্যিল মালিক, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৫১।

ভুল দলিল। কেননা, আপনি জানেন যে, সুকনা হলো মালিকানাধীন স্থায়ী বস্তুর নাম। যেমনটি আল্লামা শুরুম্বুলালি রহ. তার একটি বিশেষ পুস্তিকায় স্পষ্ট করেছেন। তবে এই জাদক, যাকে সুকনা নামে অভিহিত করা হয়, সেটি যদি ওয়াকফের জমিতে হয় তাহলে সেটি জমিতে গাছ লাগানো বা বিল্ডিং নির্মাণের মতো হবে। এ ক্ষেত্রে যদি ওয়াকফের কোনো ক্ষতি না হয়, তাহলে ওয়াকফের দায়িত্বশীলের অস্বীকৃতি সত্ত্বেও জাদকের অধিকারীর জন্য ন্যায্য ভাড়া দিয়ে সে জমিকে নিজের কবজায় রাখা জায়েজ আছে। উভয় পক্ষের কল্যাণের প্রতি লক্ষ রেখে এমনটি করা হবে। 'তানবিরুল আবসার' কিতাবের মূল পাঠে (মতনে) এ অভিমতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাজনিস নামক কিতাবে যে বক্তব্য রয়েছে সেটি এ বক্তব্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। সেখানে আছে যে, দোকানের মালিক জোরপূর্বক জাদকের মালিককে তার জাদক উঠিয়ে নিতে বাধ্য করতে পারবে। কেননা, এ বক্তব্যটি মালিকানা দোকানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তার প্রমাণ হলো 'ফুসুলাইন' কিতাবের এই বক্তব্য : 'মালিকানা ও ওয়াকফের মধ্যে পার্থক্য হলো, মালিক তার জায়গা ভাড়া না দিয়ে নিজে ব্যবহার করতে পারে। চাইলে বিক্রি করতে পারে কিংবা এমনি ফেলে রাখতে পারে। তবে যেসব ওয়াকফের সম্পদ ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে, সেখানে ওয়াকফের দায়িত্বশীল ভাড়া না দিয়ে অন্য কিছু করতে পারবে না। সুতরাং যার কাছে ভাড়া দেওয়া আছে, তার কাছেই ভাড়া দেওয়া অন্য কোনো অপরিচিতের কাছে ভাড়া দেওয়া অপেক্ষা ঢের ভালো। কারণ সেখানে দখলদার ও ওয়াকফ উভয় পক্ষের উপকারের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে।'[১৪০]

প্রচলিত পজিশনের বিকল্প পদ্ধতি

আমাদের আলোচনা থেকে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে যে, আমাদের সমাজে পজিশন বাবদ মালিকরা ভাড়াটে থেকে যে অর্থ নিয়ে থাকে সেটি নেওয়া জায়েজ নেই। এ অর্থ শরয়ি কোনো মূলনীতির আওতাভুক্ত হয় না। সুতরাং এ অর্থ সুদ

[১৪০] তানকিহুল ফাতাওয়াল হামেদিয়া, আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ.-এর রচিত, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২০০।

এবং হারাম। তবে হ্যাঁ, নিচের পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে আমাদের সমাজে প্রচলিত পজিশনের বিকল্প পদ্ধতি বের করা সম্ভব।

১. ভাড়াদাতা ভাড়াগ্রহীতা থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নেবে। এই অর্থকে নির্দিষ্ট কয়েক বছরের অগ্রিম ভাড়া হিসেবে নেওয়া হবে। এই অর্থটি মাসিক বা বাৎসরিক ভাড়ার ওপর অতিরিক্ত নেওয়া হবে। এ অর্থের ওপর ইজারার সব ধরনের বিধিবিধান প্রযোজ্য হতে থাকবে। সুতরাং কোনো কারণে নির্দিষ্ট সময় আসার আগে যদি ইজারা চুক্তি বাতিল হয়ে যায়, তাহলে ইজারার অবশিষ্ট সময়ের বিনিময়ে যে পরিমাণ অর্থ আসবে, সেটি মালিক ভাড়াটেকে ফেরত দেবে।

২. ইজারা চুক্তি যখন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য হবে, তখন ভাড়াগ্রহীতা ওই মেয়াদ পর্যন্ত তার চুক্তি অবশিষ্ট রাখার অধিকারী হবে। এখন যদি অন্য কেউ চায় যে, সে তার অধিকার থেকে সরে যাক এবং তার স্থানে ওই তৃতীয় ব্যক্তি ভাড়াগ্রহীতা হবে, তাহলে প্রথম ভাড়াগ্রহীতার জন্য দ্বিতীয় ভাড়াটের থেকে বিনিময় দাবি করা জায়েজ আছে। আর সেটি হবে অর্থের বিনিময়ে ভাড়ার অধিকার থেকে সরে যাওয়া। অর্থের বিনিময়ে স্বত্বত্যাগ করা জায়েজের মাসআলার ওপর কিয়াস করে এমনটি করা জায়েজ আছে। তবে তার জন্য শর্ত হলো, আসল ইজারাটি নির্দিষ্ট দীর্ঘ মেয়াদি ইজারা হতে হবে। যেমন : দশ বছর। আর এ সময়ের মধ্যে প্রথম ভাড়াগ্রহীতা সরে যাবে।

৩. যদি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ইজারা চুক্তি হয়ে থাকে, তাহলে কোনো শরয়ি কারণ ছাড়া মালিকের পক্ষ থেকে সেটি বাতিল করা জায়েজ নেই। এখন সে যদি কোনো শরয়ি কারণ ছাড়া ইজারা চুক্তি বাতিল করতে চায়, তাহলে ভাড়াগ্রহীতার জন্য তার বিনিময় দাবি করা জায়েজ আছে। আর সেটি হবে অর্থের বিনিময়ে অধিকার থেকে সরে যাওয়া। সঙ্গে সঙ্গে চুক্তির শুরুতে ভাড়াগ্রহীতা এককালীন যে অগ্রিম ভাড়া পরিশোধ করেছিলো তার বাকী অংশও সে ফেরত নেওয়ার অধিকারী হবে। (যেহেতু সে সময়ের আগেই বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে।) আর এটিই হলো ১৪০৮ হিজরি সনে জিদ্দায় অনুষ্ঠিত মাজমাউল ফিকহিল ইসলামির চতুর্থ অধিবেশনের গৃহীত সিদ্ধান্ত।

স্বত্বের বিনিময় নেওয়ার ক্ষেত্রে শরয়ি হুকুমের সারাংশ

ফকিহগণ বিভিন্ন ধরনের স্বত্ব ও তার বিনিময় নেওয়া সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন সেখান থেকে আমি যেটি বুঝতে পেরেছি এখানে তা উল্লেখ করছি। ফকিহদের আলোচনা থেকে নিচের মূলনীতিগুলো পাওয়া যায়। যথা—

১. যেসব স্বত্ব সত্তাগতভাবে অনুমোদিত নয় বরং সমস্যা দূর করার জন্য অনুমোদিত, কোনো অবস্থাতেই সেসব স্বত্বের বিনিময় নেওয়া জায়েজ নেই। বিক্রয় বা সমঝোতার পদ্ধতি কোনোভাবেই তার বিনিময় নেওয়া যাবে না। যেমন শোফার অধিকার, নির্দিষ্ট সময় পর স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে কাছে পাওয়া ও তালাক গ্রহণের অনুমতিপ্রাপ্তা স্ত্রীর স্বত্ব।

২. যেসব স্বত্ব বর্তমানে বিদ্যমান নেই। বরং সেগুলো ভবিষ্যতের সম্ভাব্য স্বত্ব। কোনোভাবেই সেসব স্বত্বের বিনিময় নেওয়া জায়েজ নেই। যেমন : যার মিরাস পাওয়া যাবে, তার জীবদ্দশায় মিরাসের স্বত্বের বিনিময় নেওয়া। গোলামের জীবদ্দশায় মালিক হিসেবে তার উত্তরাধিকারী হওয়ার সম্ভাব্য স্বত্ব।

৩. যেসব স্বত্ব তার অধিকারীর জন্য সত্তাগতভাবে অনুমোদিত। তবে সেটি একজন থেকে অন্যের কাছে হস্তান্তরযোগ্য নয়। বিক্রয়ের পদ্ধতিতে এ ধরনের স্বত্বের বিনিময় নেওয়া জায়েজ নেই। তবে সমঝোতা ও চুক্তির মাধ্যমে তার বিনিময় নেওয়া জায়েজ আছে। যেমন : কিসাস, স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল রাখা। সুতরাং খোলার মাধ্যমে অর্থের বিনিময়ে তালাকের মাধ্যমে স্বামীর সঙ্গে সমঝোতা করা জায়েজ আছে।

৪. যেসব সামাজিকভাবে প্রচলিত স্বত্বকে কোনো বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী উপকারিতার মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়, যেমন : রাস্তায় চলাচলের স্বত্ব, পানি নেওয়া বা প্রবাহিত করা ইত্যাদির স্বত্ব। শাফিয়ি ও হাম্বালি মাজহাব অনুযায়ী কোনো ধরনের শর্তারোপ ছাড়া এগুলো বিক্রি করা জায়েজ আছে। মালিকি মাজহাবের কিছু শাখাগত মাসআলা থেকেও অনুরূপ হুকুম বোঝা যায়। আর হানাফি মাজহাবের মুতাআখখিরিন আলেমদের নিকট গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো, এ ধরনের স্বত্বের যেগুলো কোনো স্থায়ী বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত, সেগুলোকে হুকুমের দিক থেকে মাল হিসেবে সাব্যস্ত করা হবে। ফলে সেগুলোর ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ আছে। যেমন : রাস্তায় চলাচল, পানি নেওয়া ও প্রবাহিত করার স্বত্ব। তবে তার জন্য শর্ত হলো, ধোঁকা ও

অনির্দিষ্টতার মতো সেখানে কোনো শরয়ি নিষিদ্ধ কারণ থাকতে পারবে না। হানাফি মাজহাবের আলেমদের কাছে ওপর তলায় কামরা নির্মাণের স্বত্ব বিক্রি করা জায়েজ নেই। কারণ, সেটি কোনো স্থায়ী বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। তবে আল্লামা আতাসি রহ.-এর বক্তব্য অনুযায়ী সমঝোতার মাধ্যমে অর্থের বিনিময়ে এই হকের দাবি থেকে সরে আসা জায়েজ আছে।

৫. কিছু কিছু স্বত্বকে মালের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে সামাজিক প্রচলনের একটি ভূমিকা রয়েছে। কারণ, আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ.-এর বক্তব্য অনুযায়ী মানুষ কোনো জিনিসকে মাল হিসেবে ব্যবহার করার মাধ্যমে সেটি মাল বলে সাব্যস্ত হয়।

৬. অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অর্জিত স্বত্ব। যেমন : পরিত্যক্ত জমিতে সীমানা দেওয়ার মাধ্যমে সেটি চাষাবাদের অধিকারী হওয়া। শাফিয়ি ও হাম্বালি মাজহাবের গ্রহণযোগ্য অভিমত অনুযায়ী এ ধরনের স্বত্ব বিক্রি করা জায়েজ নেই। তবে তাদের অভিমত অনুযায়ী সমঝোতার মাধ্যমে অর্থের বিনিময়ে এ ধরনের স্বত্ব নেওয়ার দাবি থেকে সরে যাওয়া জায়েজ আছে।

৭. হানাফি মাজহাবের গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো, যদিও কোনো দায়িত্ব বা চাকরির স্বত্ব বিক্রি করা জায়েজ নেই। তবে সমঝোতার মাধ্যমে অর্থের বিনিময়ে এ ধরনের স্বত্বের অধিকার বহাল রাখা থেকে সরে যাওয়া জায়েজ আছে। অনুরূপভাবে বাড়ি বা দোকান ভাড়া নেওয়ার স্বত্ব বিক্রি করা জায়েজ নেই। তবে সমঝোতার মাধ্যমে অর্থের বিনিময়ে সেখান থেকে সরে যাওয়া জায়েজ আছে।

৮. স্বত্বের বিষয়টি স্পষ্ট করার পর বর্তমানে আমাদের সমাজে প্রচলিত সেসব স্বত্বের আলোচনা শুরু করছি, যেসব স্বত্বের বিশ্লেষণ করা আমাদের এ আলোচনার উদ্দেশ্য ছিলো। মহান আল্লাহ সঠিক পথের পথপ্রদর্শক।

ব্যবসায়িক নাম বা ট্রেডমার্ক বিক্রি করা

ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির পাশাপাশি ব্যবসায়িক নাম বা ট্রেডমার্ক সম্পর্কিত মাসআলা সৃষ্টি হচ্ছে। একজন ব্যবসায়ী বা একটি কোম্পানি মাল উৎপাদন করে বিভিন্ন মানুষের কাছে ও বিভিন্ন দেশে সেটি বিক্রয় করে। গুণগত মানের ভিন্নতার

কারণে একজাতীয় পণ্যের বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। আর পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নামে তার গুণগতমান নির্ণয় করা হয়। সুতরাং ক্রেতা যখন দেখে যে, বাজারে সুনাম ও সুখ্যাতির অধিকারী কোনো প্রতিষ্ঠান এই পণ্যটি উৎপাদন করেছে তখন শুধু কোম্পানির নাম শুনেই সেটি ক্রয় করে নেয়। অথবা পণ্যের ওপর কোম্পানির ট্রেডমার্ক দেখে সেটি ক্রয় করে নেয়।

এভাবে ব্যবসায়িক নাম বা ট্রেডমার্কের প্রতি গ্রাহকের আগ্রহ কমবেশি হয়ে থাকে। ফলে ব্যবসায়ীদের দৃষ্টিতে ব্যবসায়িক নাম বা ট্রেডমার্ক একটি মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং যেসব কোম্পানি মানুষের মধ্যে সুখ্যাতি অর্জন করেছে, তার নামে বাজারে আসা পণ্য গ্রাহকদেরকে বেশি আকৃষ্ট করে। আর সেই বিখ্যাত কোম্পানির নামে বাজারে পণ্য আনলে সেখানে বেশি লাভ করা যায়।

মানুষ যখন তাদের পণ্য মার্কেটজাত করতে সে কোম্পানির নাম ব্যবহার করা শুরু করলো, যার সম্পর্কে বাজারে সুখ্যাতি রয়েছে আর এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ ধোঁকাগ্রস্ত হতে লাগলো, তখন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ব্যাবসায়িক নাম ও ট্রেডমার্ক রেজিস্টারের আইন করা হলো। আর ব্যবসায়ীদের জন্য অন্যের কোনো রেজিস্টারকৃত ব্যাবসায়িক নাম বা ট্রেডমার্ক ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হলো।

সুতরাং রেজিস্টার করার পর এই ব্যাবসায়িক নাম বা ট্রেডমার্কটি ব্যবসায়ী মহলে একটি সত্তাগত মূল্যবান বস্তুতে পরিণত হলো। আর ব্যবসায়ীরা সেটিকে বড়ো অংকের মূল্যে বিক্রয় করা শুরু করলো। কারণ, ট্রেডমার্কের সুখ্যাতির মাধ্যমে তারা গ্রাহকের অধিক আগ্রহ এবং বেশি পরিমাণে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের আশা রাখে।

এখন প্রশ্ন হয় যে, ব্যাবসায়িক নাম বা ট্রেডমার্ক বিক্রি করা জায়েজ আছে কি? এ বিষয়টি তো স্পষ্ট যে, ব্যাবসায়িক নাম বা ট্রেডমার্ক কোনো বস্তু নয়। বরং সেটি হলো ওই ব্যাবসায়িক নাম বা ট্রেডমার্ক ব্যবহারের স্বত্ব। আর এই স্বত্বের অধিকারী রাষ্ট্রীয় নিয়ম অনুযায়ী আগে রেজিস্ট্রেশন করার মাধ্যমে সত্তাগতভাবে সেটি অর্জন করেছে। আর স্বত্বটি বিদ্যমান, ভবিষ্যতের সম্ভাব্য স্বত্ব নয়। সেইসঙ্গে সেটি একজন থেকে অন্যের কাছে হস্তান্তরযোগ্য। তবে সেটি এমন স্বত্ব নয়, যা কোনো ধাতব বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান। সুতরাং ফকিহদের আলোচনার সারসাংক্ষেপ থেকে আমরা যে মূলনীতি বের করেছি তার আলোকে সমঝোতার মাধ্যমে এ

ধরনের স্বত্ব থেকে সরে যাওয়ার বিনিময় নেওয়া জায়েজ হওয়া উচিত। তবে সেটি বিক্রি করা জায়েজ হবে না। কারণ, সেটি কোনো বস্তুর মধ্যে স্থায়ী বিদ্যমান কোনো স্বত্ব নয়।

আমাদের শায়খুল মাশায়েখ মাওলানা আশরাফ আলি থানবি রহ. একই ফতোয়া দিয়েছেন। এটিকে তিনি অর্থের বিনিময়ে পদত্যাগ করার মাসআলার ওপর কিয়াস করেছেন। আর সে ক্ষেত্রে আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ.-এর উদ্ধৃত অর্থের বিনিময়ে পদত্যাগ সম্পর্কিত বক্তব্যকে উদ্ধৃতি হিসেবে পেশ করেছেন। এরপর তিনি বলেন—

اورنام كار خانه بهي مشابه حق وظائف كي بهي . كه ثابت على وجه الأصالة بهي ، نه كه دفع ضرر كيلي ، اور دونوں بالفعل أمور إضافية سي هي ، اور مستقبل ميں دونوں ذريعة يي تحصيل مال كي ، پس اس بناير اس كي عوض ديني ميں كنجائش معلوم هوتي هي ، كوليني وإلى كيلئي خلاف تقوي هي ، مكر ضرورت ميں اس كو بهي اجازت هو جائيكي.

'আর সত্তাগতভাবে অনুমোদিত হওয়ার দিক থেকে কোম্পানির নামের মাসআলাটি অর্থের বিনিময়ে দায়িত্ব থেকে পদত্যাগের মাসআলার মতো। সেটি তার অধিকারী থেকে সমস্যা দূর করার জন্য প্রমাণিত নয়। আর উভয়টি বর্তমানে বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতে অর্থ উপার্জনের মাধ্যম। তাই মনে হচ্ছে তার বিনিময় নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। যদিও যে ব্যক্তি বিনিময় নেবে তার জন্য এটি তাকওয়ার পরিপন্থি। তবে প্রয়োজনের সময় এমনটি নেওয়ার অনুমতি রয়েছে।'[১৪১]

শায়খুল ইসলাম আল্লামা তকি উসমানি দা. বা. বলেন, এই দুর্বল বান্দার কাছে যেটি মনে হয় (মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন)। ব্যাবসায়িক নাম বা ট্রেডমার্ক যদিও সত্তাগতভাবে এমন নিরেট স্বত্ব, যা কোনো বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান নয়। তবে রাষ্ট্রীয়ভাবে অনেক অর্থ ও শ্রমের বিনিময়ে সেটি রেজিস্ট্রেশন করার পর তার একটি আইনি অবস্থান সৃষ্টি হয়। যেটির প্রতিনিধিত্ব করে তার বাহকের হাতে লিখিত নথিপত্র আর রাষ্ট্রীয় দফতর। এ অবস্থায় স্বত্বটি কোনো বস্তুতে বিদ্যমান স্বত্বের সদৃশ হয়ে গেলো। আর ব্যবসায়ী মহলে সেটি বস্তুর সঙ্গে মিলে গেছে।

[১৪১] ইমদাদুল ফাতাওয়া, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১১৯-১২০।

সুতরাং বিক্রয়ের মাধ্যমে তার বিনিময় নেওয়া জায়েজ হওয়া উচিত। আর এ কথায় কোনো সন্দেহ নেই যে, কিছু কিছু স্বত্বকে বস্তুতে পরিণত করার ব্যাপারে সামাজিক প্রচলনের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কেননা, আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ.-এর বক্তব্য অনুযায়ী সমাজ কোনো জিনিসকে মাল হিসেবে ব্যবহার করার মাধ্যমে সেটি মালে পরিণত হয়ে যায়। আর এ মাসআলাটি বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মতো। আগেকার যুগে সেটিকে মাল ও অস্তিত্বশীল মূল্যবান বস্তু মনে করা হতো না। কারণ, সত্তাগতভাবে তার কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। তখন মানুষের জন্য এসব বস্তু নিয়ন্ত্রণ করা দুঃসাধ্য ছিলো। কিন্তু বর্তমানে এগুলোকে সবচেয়ে মূল্যবান পণ্য হিসেবে সাব্যস্ত করা হয় এবং যার ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আর তার হুকুমটি এমন হওয়ার কারণ হলো, এ দুটির মাধ্যমে সীমাহীন উপকারিতা পাওয়া যায় এবং এগুলো জমা করে রাখা সম্ভব হওয়ার কারণে মানুষ সেগুলোকে মাল ও মূল্যবান হিসেবে সাব্যস্ত করেছে।

অনুরূপভাবে ব্যাবসায়িক নাম বা ট্রেডমার্ক রাষ্ট্রীয়ভাবে রেজিস্ট্রেশন করার পর ব্যবসায়ী মহলে সেটি মহামূল্যবান মালে পরিণত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে এমন কথা বলা সহিহ আছে যে, রাষ্ট্রীয়ভাবে নথিভুক্ত হওয়ার মাধ্যমে সেটি জমা রাখা সম্ভব। আর প্রত্যেক জিনিস জমা রাখার পদ্ধতি তার অবস্থার বিবেচনায় হয়ে থাকে। তার সম্পর্কে এমনটিও বলা যায় যে, প্রয়োজনের সময়ের জন্য সেটি জমা রাখা যায়। সুতরাং যেসব উপসর্গগুলো কোনো জিনিসকে মালে পরিণত করে, তার সবগুলো এই ব্যাবসায়িক নাম বা ট্রেডমার্কের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। তবে সমস্যা শুধু এতটুকু যে সত্তাগতভাবে সেটি কোনো বস্তু নয়।

এ আলোচনা থেকে এটি বোঝা যায় যে, এগুলো ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হওয়ার জন্য এগুলোকে মালের মতো ব্যবহার করতে কোনো শরয়ি বাধা নেই। তবে তার জন্য দুটি শর্ত রয়েছে। যথা :

১. আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যাবসায়িক নাম বা ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশনভুক্ত হতে হবে। কারণ, ব্যবসায়ী মহলে রেজিস্ট্রেশনহীন কোনো ব্যাবসায়িক নাম বা ট্রেডমার্ক মাল হিসেবে স্বীকৃত নয়।

২. ব্যাবসায়িক নাম বা ট্রেডমার্কের কারণে ক্রেতা কোনো ধরনের ধোঁকা বা প্রতারণার শিকার হবে না। আর সেটি রোধ করার পদ্ধতি এমন হবে যে, ট্রেডমার্কের ক্রেতার পক্ষ থেকে এই ঘোষণা দিয়ে দেবে যে, এই পণ্যটির

উৎপাদনকারী আগের উৎপাদনকারী নয়। আর এ ধরনের ট্রেডমার্কের ক্রেতার এমন ইচ্ছে থাকতে হবে যে, তার সাধ্য অনুযায়ী আগের কোম্পানির সমমানের বা তার চেয়ে উন্নত মানের পণ্য প্রস্তুত করবে।

এ ধরনের ঘোষণা ছাড়া ব্যাবসায়িক নাম বা ট্রেডমার্ক ক্রয় করার কারণে সাধারণ ভোক্তারা ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হবে। আর ধোঁকা, প্রতারণা হারাম, যা কখনোই বৈধ হবে না। মহান আল্লাহ্ সর্বাধিক অবগত।

ট্রেড লাইসেন্স

ব্যাবসায়িক নাম বা ট্রেডমার্ক বিক্রয় জায়েজের সম্পর্কে আমরা যে আলোচনা করেছি ব্যাবসায়িক লাইসেন্সের ক্ষেত্রেও হুবহু সেটি প্রযোজ্য হবে। এ ধরনের লাইসেন্সের বাস্তবতা হলো, বর্তমানে অধিকাংশ দেশ রাষ্ট্রীয় অনুমোদন ছাড়া কোনো কিছু আমদানি বা রপ্তানির অনুমতি দেয় না। আর এ ব্যাপারে যেটি স্পষ্ট হয় তা হলো, এরকম করা ব্যবসায়ীদের ওপর এক ধরনের নিষেধাজ্ঞার মতো। একেবারে নিরুপায় হওয়া ছাড়া ব্যবসায়ীদের ওপর এ ধরনের বাধ্যবাধকতাকে শরিয়ত সমর্থন করে না। তবে অধিকাংশ দেশের বাস্তবতা এটিই। সুতরাং বর্তমান অবস্থায় প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, আমদানি-রপ্তানির অনুমোদনপ্রাপ্ত কোনো লাইসেন্সধারী অন্যের কাছে তার এই লাইসেন্স বিক্রি করতে পারবে কি? অথচ সেটি কোনো ধাতব বস্তু নয়। বরং সেটি কেবল দেশের বাইরে কোনো পণ্য রপ্তানি বা বাহির থেকে আমদানি করার অনুমতি। সুতরাং ব্যাবসায়িক নাম বা ট্রেডমার্ক সত্তাগতভাবে তার অধিকারীর জন্য প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে যে আলোচনা করেছি এ ক্ষেত্রে সেটি প্রযোজ্য হবে। আর এ ধরনের লাইসেন্স পাওয়ার জন্য যেহেতু কষ্ট, সময় ও অনেক অর্থের প্রয়োজন হয়। আর তার বাহক একটি বিশেষ আইনি সুযোগের অধিকারী হয়, যার প্রতিনিধিত্ব করে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অনুমোদিত পত্র। এ কারণে এমন লাইসেন্সের অধিকারীকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয়। যার ফলে এই লাইসেন্স ব্যবসায়ী মহলে মূল্যবান জিনিসে পরিণত হয়, যা মাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং এর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হওয়ার জন্য একে বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা কোনো কঠিন বিষয় হবে না। তবে এ হুকুমটি তখনই কার্যকরী, যখন এমন লাইসেন্স অন্যের কাছে হস্তান্তরের ব্যাপারে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অনুমতি থাকবে। তবে যদি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের

কাছে হস্তান্তরের ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় অনুমতি না থাকে, তাহলে এ ধরনের লাইসেন্স বিক্রয় নাজায়েজ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, তখন এ ধরনের লাইসেন্স বিক্রয় করা ধোঁকা ও প্রতারণার কারণ হবে। কেননা, তার ক্রেতা আগের বিক্রেতার নামে সেটি ব্যবহার করবে। নিজের নামে ব্যবহার করবে না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে লাইসেন্সের বাহককে ক্রয়-বিক্রয়ের উকিল হিসেবে গ্রহণ করে চুক্তি করা ছাড়া আমদানি রপ্তানি করা জায়েজ হবে না।

আবিষ্কার ও প্রকাশনা স্বত্ব

আইন ও সামাজিক প্রচলন অনুযায়ী সে ব্যক্তি আবিষ্কারের স্বত্বের অধিকারী হবে, যে কোনো কিছু আবিষ্কার করেছে বা নতুন কোনো মডেল তৈরি করেছে। আবিষ্কার স্বত্বের উদ্দেশ্য হলো, তার আবিষ্কৃত জিনিসটির উৎপাদন ও ব্যবসা করার অধিকার একমাত্র তারই হবে। এরপর অনেক সময় অন্যের কাছে এই স্বত্ব বিক্রি করা হয়। ফলে সে প্রথম আবিষ্কারকের মতো ব্যবসার জন্য সেটি উৎপাদন করে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কোনো কিতাব রচনা করে বা সংকলন করে, সেটি ছাপা, প্রকাশনা ও ব্যবসার মাধ্যমে লাভ অর্জনের স্বত্ব তার জন্য সংরক্ষিত থাকবে। অনেক সময় সে অন্যের কাছে এই স্বত্ব বিক্রি করে দেয়। ফলে লেখক বা সংকলক সেটি ছাপা ও প্রকাশনার যে অধিকার রাখতো ক্রেতা সেটির অধিকারী হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হয় যে, আবিষ্কার, প্রকাশনা ও রচনা স্বত্ব বিক্রি করা জায়েজ কি না? এ মাসআলার ব্যাপারে সমকালীন আলেমদের মতপার্থক্য রয়েছে। তাদের অনেকে এটিকে জায়েজ বলেছেন। আবার অনেকে নাজায়েজ বলেছেন।

এ ব্যাপারে মৌলিক প্রশ্ন হলো, আবিষ্কার ও প্রকাশনা স্বত্ব কি শরিয়ত স্বীকৃত স্বত্ব? এ প্রশ্নের উত্তর হলো, যে ব্যক্তি সবার আগে কোনো জিনিস আবিষ্কার করলো, হোক সেটি ধাতব অথবা কৃত্রিম, তার মাধ্যমে সে নিজে উপকৃত হওয়া বা লাভ অর্জনের জন্য বাজারজাত করার ব্যাপারে অন্যের তুলনায় বেশি অধিকারী হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা, ইমাম আবু দাউদ রহ. আসমার ইবনু মুজরিস রা. থেকে বর্ণনা করেন—

أتيت النبي صلي الله عليه وسلم فبايعته فقال : (من سبق إلى ما لم يسبقه مسلم فهو له.

'আসমার ইবনু মুজরিস রা. বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তার কাছে বাইআত গ্রহণ করলে তিনি আমাকে বললেন, যে ব্যক্তি এমন জিনিসের দিকে অগ্রসর হলো, যার দিকে তার আগে কেউ অগ্রসর হয়নি, তাহলে আগে যাওয়া ব্যক্তি সেটির অধিকারী হবে।'[১৪২]

যদিও আল্লামা মুনাবি রহ. বলেছেন যে, পরিত্যক্ত জমি চাষাবাদ সম্পর্কে হাদিসটি বর্ণিত। তবে অনেক আলেম থেকে তিনি এ কথা বর্ণনা করেছেন যে, হাদিসটি সবধরনের কূপ, ঝরনা ও খনিজ পদার্থকে অন্তর্ভুক্ত করবে। যে ব্যক্তি এ ধরনের কোনো একটির দিকে সবার আগে যাবে, সে সেটির অধিকারী হবে।[১৪৩] আর এ কথায় কোনো সন্দেহ নেই যে, শব্দের ব্যাপকতা গ্রহণযোগ্য হয়। তার বিশেষ কারণ নয়।

যখন প্রমাণিত হলো যে, আবিষ্কার স্বত্ব এমন একটি স্বত্ব, আগে আবিস্কারের কারণে শরিয়ত যার স্বীকৃতি দিয়েছে। তখন আগে যাওয়ার মাধ্যমে অর্জিত স্বত্ব সম্পর্কে ইতোপূর্বে যা কিছু বলেছি এখানে সেসব হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর আমরা সেখানে এ বিষয়টি প্রমাণ করেছি যে, শাফিয়ি ও হাম্বালি মাজহাবের কিছু আলেম এ ধরনের স্বত্ব বিক্রি করাকে জায়েজ বলেছেন। তবে তাদের মাজহাবের গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো, এ ধরনের বিক্রি জায়েজ নেই। তবে সমঝোতার মাধ্যমে অর্থের বিনিময়ে এ ধরনের স্বত্ব থেকে সরে যাওয়া জায়েজ আছে। ইতোপূর্বে আল্লামা বুহুতি রহ. থেকে পরিত্যক্ত জমিতে সীমানা দেওয়ার মাধ্যমে অর্জিত স্বত্ব, মসজিদে আগে বসার কারণে অর্জিত স্বত্ব, বা আগে অর্জনকৃত ও বিশেষিত অন্যান্য স্বত্বের ক্ষেত্রে সমঝোতার মাধ্যমে বিনিময় নিয়ে স্বত্ব ছেড়ে দেওয়া জায়েজ হওয়ার বিষয়ে উদ্ধৃতি নকল করেছি। তার বক্তব্য অনুযায়ী সমঝোতার মাধ্যমে আবিষ্কার বা প্রকাশনা স্বত্বেও বিনিময় নিয়ে অন্যের জন্য সেটি ছেড়ে দেওয়া জায়েজ হবে। তবে এ হুকুমটি শুধু আসল আবিষ্কার ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এরপর তার সঙ্গে যদি সময়, কষ্ট ও অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় রেজিস্ট্রেশন যুক্ত হয়। যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় দফতর ও স্বত্বের বাহকের কাছে থাকা রেজিস্টারপত্র একটি আইনি অবস্থানের প্রতিনিধিত্ব করে, আর ব্যবসায়ী মহলে

---

[১৪২] সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৩০৭১। হাদিসটি বর্ণনা করার পর ইমাম আবু দাউদ ও আল্লামা মুনজিরি রহ. তার সমালোচনা থেকে বিরত থেকেছেন।। (হাদিসটির সনদ জয়িফ)

[১৪৩] ফয়জুল কাদির, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৪৮।

সেটি মূল্যবান মাল হিসেবে গণ্য হয়, তাহলে এই ব্যাপক ব্যবহার ও প্রচলনের কারণে এই রেজিস্টারকৃত স্বত্বটি বস্তু ও মালের আওতাভুক্ত হওয়া কোনো দূরবর্তী বিষয় নয়। ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, কিছু কিছু জিনিসকে মালের অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে সামাজিক প্রচলনের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কারণ, আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ.-এর বক্তব্য অনুযায়ী সাধারণ মানুষ কোনো জিনিসকে মূল্যবান হিসেবে সাব্যস্ত করার মাধ্যমে সেটি মালে পরিণত হয়। আর রেজিস্ট্রেশন করার পর এই স্বত্বকে মালের মতো সংরক্ষণ করা হয়। মালের মতো প্রয়োজনের জন্য সেটি জমা করে রাখা হয়। আর এ ধরনের সামাজিক প্রচলনকে গ্রহণ করতে কুরআন-হাদিসের কোনো বক্তব্যের বাধা নেই। এ সম্পর্কে সর্বোচ্চ বলা যেতে পারে যে, সেটি কিয়াসের বিপরীত। তবে সামাজিক প্রচলনের কারণে কিয়াসকে পরিহার করা হয়। যেমনটি এ সংক্রান্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত।

এসব দিকে লক্ষ করে সমকালীন অনেক আলেম স্বত্ব বিক্রি জায়েজ বলে ফতোয়া দিয়েছেন। তাদের মধ্য থেকে ভারতবর্ষের আলেমদের নাম উল্লেখ করছি— মাওলানা শায়খ ফাতাহ মুহাম্মাদ লাখনোবি রহ.। (ইমাম আবদুল হাই লাখনোবি রহ.-এর ছাত্র।)[১৪৪] শায়খ মুফতি মুহাম্মাদ কেফায়েতুল্লাহ রহ.। দারুল উলুম দেওবন্দের মুফতি আল্লামা শায়খ নেজামুদ্দিন রহ.।[১৪৫] শায়খ মুফতি আবদুর রহিম লাজপুরি রহ.।[১৪৬]

আবিষ্কার ও প্রকাশনা স্বত্ব বিক্রিকে যারা নাজায়েজ বলেন, তারা এভাবে দলিল দেন যে, আবিষ্কারের স্বত্ব হলো শুধু একটি স্বত্ব। সেটি কোনো বস্তু নয়। আর নিরেট স্বত্বের বিনিময় নেওয়া জায়েজ নেই। তবে ইতোপূর্বে উল্লিখিত ফকিহদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, স্বত্বের বিনিময় নেওয়া নাজায়েজ হওয়ার হুকুমটি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হুকুম নয়। বরং তার মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে, যা বিভিন্ন স্বত্বের আলোচনাতে করেছি। নাজায়েজের প্রবক্তাগণ দ্বিতীয় আরেকটি দলিল পেশ করেন। আর তা হলো যে ব্যক্তি অন্যের কাছে একটি কিতাব বিক্রি করলো, ক্রেতা ওই কিতাবের সব কিছুর মালিক হয়ে গেলো। ক্রেতার ইচ্ছে মতো সেখানে যে-কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করা জায়েজ আছে। সুতরাং ক্রেতার পক্ষ থেকে সেটি ছাপা জায়েজ হবে। এ ব্যাপারে বিক্রেতা তাকে বাধা দিতে পারবে না।

---

[১৪৪] ইতরে হিদায়া, পৃষ্ঠা : ১৯২-১৯৪।

[১৪৫] নেজামুল ফাতাওয়া, পৃষ্ঠা : ১২৮-১৩৩।

[১৪৬] ফাতাওয়া রহিমিয়া, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৪৪।

তবে এভাবে তাদের এই দলিলের উত্তর দেওয়া যেতে পারে যে, কোনো জিনিসের মধ্যে হস্তক্ষেপ করা একটি বিষয় আর তার মতো আরও জিনিস উৎপাদন করা আরেকটি বিষয়। ক্রেতা কিতাব ক্রয়ের মাধ্যমে যার মালিক হয়, সেটি হলো প্রথম প্রকারের কর্তৃত্ব। কিতাব পড়া, তার থেকে উপকৃত হওয়া, বিক্রয় করা, ধার দেওয়া, দান করা ইত্যাদি করতে পারবে। আর ক্রয়কৃত কিতাব থেকে অনুরূপ কিতাব ছাপা পণ্যের উপকারিতার আওতাভুক্ত নয়। কিতাবের মালিক হওয়ার কারণে যে ছাপা ও প্রকাশনা স্বত্বেরও মালিক হবে এমনও নয়। এ মাসআলাটি হলো রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রচলিত মুদ্রার মতো। কেউ যখন সেটি ক্রয় করে নেয়, তখন সেটি বিক্রয়, দান, ঋণ দেওয়া বা অন্যের সঙ্গে পরিবর্তন করা ইত্যাদির মতো ব্যক্তিগত সব ধরনের ব্যবহার তার জন্য জায়েজ আছে। তবে তার জন্য এই মুদ্রা ক্রয়ের মাধ্যমে অনুরূপ মুদ্রা প্রস্তুত করা জায়েজ নেই। সুতরাং এখান থেকে বোঝা যায় যে, কোনো জিনিসের মালিক হওয়া অনুরূপ জিনিস উৎপাদনের মালিকানাকে আবশ্যক করে না।

না জায়েজের প্রবক্তাগণ তৃতীয় একটি দলিল দেন যে, আবিষ্কৃত জিনিস উৎপাদন করলে বা লিখিত কোনো কিতাব ছাপলে সে কারণে আসল আবিষ্কারক বা লেখকের কোনো ক্ষতি হয় না। বেশির থেকে বেশি যে সমস্যা হয়, তা হলো তাদের উৎপাদন বা লিখিত কিতাবের লাভ কম হবে। আর লাভ কম হওয়া একটি বিষয় ও ক্ষতি হওয়া ভিন্ন বিষয়।

তাদের এ দলিলের উত্তর এভাবে দেওয়া যেতে পারে যে, লাভ কম হওয়া যদিও সরাসরি ক্ষতি নয়। তবে সেটিও একটি ক্ষতি। কারণ এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, কোনো কিছু আবিষ্কারে যে ব্যক্তি কঠিন কষ্ট সহ্য করেছে, শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমকে কাজে লাগিয়েছে এবং কিতাব রচনার জন্য বড়ো অংকের অর্থ ও মূল্যবান সময় খরচ করেছে এবং দীর্ঘদিন রাত জেগেছে ও আরাম আয়েশ পরিহার করেছে সে ব্যক্তি আবিষ্কৃত বা লিখিত জিনিস থেকে লাভ অর্জনের ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি হকদার, যে সামান্য অর্থের বিনিময়ে এক মুহূর্তে সেটি ক্রয় করে প্রথম আবিষ্কারকের বাজার বন্ধ করে দিয়েছে।

অনেক সময় বলা হয় যে, একজনের জন্য প্রকাশনা স্বত্বের স্বীকৃতি দেওয়া মূলত ইলম গোপন করার কারণ হয়ে থাকে। তবে তাদের এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হবে যে, লেখক যদি তার লিখিত কিতাব পড়তে, পড়াতে ও সেটি প্রচার করতে নিষেধ করে, তাহলে ইলম গোপন করার বিষয়টি পাওয়া যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকাশনা

স্বত্ব সংরক্ষণ করে, সে কখনো কাউকে কিতাব পড়তে, পড়াতে এবং সেটি প্রচার করতে নিষেধ করে না। এমনকি সে সেটি বিক্রয় ও তার ব্যবসা করতেও বাধা দেয় না। তবে এ কাজে বাধা দেয় যে, লাভ করার উদ্দেশ্যে তার অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ সেটি ছাপবে। সুতরাং এখানে ইলম গোপন করার কিছু নেই।

যে সকল আলেম নাজায়েজ বলেন তাদের সর্বশেষ দলিল হলো, প্রকাশনা স্বত্ব সংরক্ষণ করলে কিতাব প্রচারের পরিধি সংকীর্ণ হয়ে যাবে। প্রত্যেকের জন্য কিতাব প্রকাশ করা এবং প্রচার করার অধিকার যদি থাকে, তাহলে সেটির প্রচার বেশি হবে এবং সবাই এর উপকার পাবে।

এটি একটি বাস্তব কথা, যা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। তবে আমরা যদি অন্যদিক থেকে লক্ষ করি, তাহলে এই দলিলটি গুরুত্বহীন হয়ে যায়। সেটি হলো, আবিষ্কারক সেটির প্রতি অগ্রগামী হওয়ার পরও যদি তার আবিষ্কার থেকে লাভ করার ব্যাপারে তার অগ্রাধিকার রহিত করা হয়, তাহলে তারা যখন দেখবে যে, তাদের আবিষ্কার থেকে তেমন লাভ আসছে না তখন নতুন নতুন জিনিস আবিস্কারে তাদের কষ্ট সহ্য করার মনোবল ভেঙে পড়বে। আর এ ধরনের দ্বিমুখী বিষয়ের ক্ষেত্রে শরয়ি কোনো নিষেধাজ্ঞা না থাকলে সেখানে চূড়ান্ত ফিকহি সিদ্ধান্ত দেওয়া যায় না। কারণ, সব বৈধ জিনিসের মধ্যেই কিছু ভালো আর কিছু খারাপ থাকে। মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

—মুহাম্মাদ তকি উসমানি

পরিশিষ্ট

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করার প্রয়োজন অনুভব করছি যে, আমার সম্মানিত পিতা মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ শফি রহ. মুদ্রণ ও প্রকাশনা স্বত্ব বিক্রয় নাজায়েজের ফতোয়া দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে তিনি স্বতন্ত্র একটি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। যেটি 'জাওয়াহিরুল ফিকহ'-এর অংশ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এ পুস্তিকা লেখার পর তিনি দ্বিতীয়বার এ মাসআলাটি নিয়ে গবেষণা ও যাচাই-বাছাই করে চূড়ান্ত তাহকিক (অনুসন্ধান) করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। যাতে স্বত্ব ও এর বিনিময় নেওয়ার বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করতে পারেন। আর তিনি এই গবেষণার পর

যে-কোনো নতুন দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে উন্মুক্ত হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তার পক্ষে এ মাসআলা নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ মেলেনি। ফলে তিনি দুইবার এই দায়িত্ব আমাকে অর্পণ করেন এবং বলেন যে, এ মাসআলাটির পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ করো। তখনই আমি এই মাসআলার বিষয়বস্তু জোগাড় করতে শুরু করলাম। তবে সম্মানিত পিতার জীবদ্দশায় সেটি পরিপূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। তার মৃত্যুর দীর্ঘ সময় পর পূর্ণ করার তাওফিক হয়েছে। অনুরূপভাবে এ অলোচনাটি সম্মানিত পিতার আদেশে লেখা হয়েছে। যদিও এখানে যে সিদ্ধান্তে আমি উপনীত হয়েছি সেটি তার প্রকাশিত সিদ্ধান্তের বিপরীত। তবে তিনি নিজেই এ মাসআলার ব্যাপারে দ্বিতীয়বার গবেষণার ইচ্ছে করেছিলেন। তাই আজ এটি জানার কোনো উপায় নেই যে, আমি যেটি লিখেছি, যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি সেটি তার রায় অনুযায়ী হয়েছে না কি তার রায়ের প্রতিকূলে হয়েছে। মহান আল্লাহ্ সর্বাধিক অবগত।

'পশ্চিমা দেশগুলোর জন্য কিছু মাসআলা ও তার সমাধান' এগুলো পশ্চিমা দেশের কিছু সমস্যা কেন্দ্রিক প্রশ্নের উত্তর। ১৪০৭ হিজরির সফর মাসের ৮-১৩ তারিখ অনুযায়ী ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১১-১৬ অক্টোবর পর্যন্ত তারিখে জর্দানের রাজধানী আম্মানে অনুষ্ঠিত 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি'র তৃতীয় অধিবেশনে এটি উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তী সময়ে 'বুহুস ফি কজায়া ফিকহিয়্যা মুআসারা'-এর প্রথম খণ্ডে এটি প্রকাশ করা হয়।

পশ্চিমা দেশগুলোর জন্য কিছু আধুনিক মাসআলা ও তার সমাধান

মাসআলা—১.

অমুসলিম দেশে নাগরিকত্ব নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করা

প্রশ্ন : কোনো অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করার হুকুম কী? যেমন : আমেরিকা, ইউরোপের বিভিন্ন এলাকার নাগরিকত্ব নেওয়া কি জায়েজ? কেননা, যেসব মুসলিম এসব দেশে নাগরিকত্ব নিয়েছে বা নেওয়ার চেষ্টা করছে, তাদের অনেকের দাবি যে, ইসলামি দেশগুলোতে তাদেরকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। অন্যায়ভাবে তাদেরকে জেলে বন্দি করা হয়েছে, হুমকি দেওয়া হয়েছে। কিংবা তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যে কারণে তারা নিজ দেশ ছেড়ে অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব নিতে বাধ্য হয়েছে।

আবার কিছু মুসলিমের দাবি হলো, আমাদের ইসলামি দেশসমূহে যখন ইসলামি আইন ও হদ কার্যকর হচ্ছে না, তখন ইসলামি দেশ আর অমুসলিম দেশের মধ্যে কী পার্থক্য রয়েছে?

ইসলামি বিধিবিধান কার্যকর না করার ক্ষেত্রে উভয় দেশ সমান। অথচ

আমরা যেসব অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব নিয়েছি, সেখানে ইসলামি দেশ অপেক্ষা আমাদের ব্যক্তিগত অধিকার অর্থাৎ জান, মাল, ইজ্জত আবরু বেশি নিরাপদ। আর এসব অমুসলিম দেশে আমাদের প্রতি অন্যায় জেল, সাজা ইত্যাদির কোনো ভয় নেই। অথচ একটি ইসলামি দেশে আইন অমান্য করা ছাড়াও সব সময় জেল ও শাস্তির আশঙ্কা থাকে।

উত্তর : কোনো অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণের হুকুম স্থান, কাল, পাত্রভেদে এবং যে ব্যক্তি নাগরিকত্ব গ্রহণ করছে তার উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর করে নিচের হুকুমে বিভক্ত হতে পারে। যথা—

১. কোনো মুসলিমকে যদি তার ইসলামি দেশে অন্যায়ভাবে নির্যাতন, জেলে বন্দি বা তার সম্পদ ক্রোক করে নেওয়া হয় আর সে এ ধরনের অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব নেওয়া ছাড়া এ সকল জুলুম থেকে বাঁচার কোনো রাস্তা না পায়। এমন পরিস্থিতিতে তার জন্য কোনো অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব নিয়ে সেখানে বসবাস করা সন্দেহাতীতভাবে জায়েজ হবে। তবে এর জন্য শর্ত হলো, নিজের আমলের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধিবিধান রক্ষা করা এবং ওই দেশের খারাপ ও অশ্লীল কাজকর্ম থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করা।

   এ কথার দলিল হলো, সাহাবায়ে কেরাম রা. মক্কাবাসীর কাছ থেকে নির্যাতিত হওয়ার পর হাবশায় হিজরত করেছিলেন। আর কাফেররা তখন হাবশার নেতৃত্ব দিতো। সাহাবিগণ সেখানে অবস্থান করতে থাকেন। এমনকি মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাতে হিজরত করার পরও অনেক সাহাবি সেখানে রয়ে যান। আবু মুসা আশআরি রা. খায়বার যুদ্ধের সময় মদিনায় ফিরে আসেন। অর্থাৎ হিজরি সপ্তম বছরে তিনি ফিরে আসেন।

   এ ছাড়া মানুষের ব্যক্তিগত অধিকারের মধ্যে একটি অধিকার হলো সব ধরনের জুলুম থেকে সে নিজেকে সংরক্ষিত রাখবে। সুতরাং কেউ যখন অমুসলিম দেশ ছাড়া নিজের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল না পাবে, তখন সেই দেশে হিজরত করতে কোনো বাধা নেই। তবে তাকে ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং নিষিদ্ধ জিনিস থেকে দূরে থাকতে হবে।

২. কোনো মুসলিম যদি তার জীবন পরিচালনায় এমন পরিস্থিতির শিকার হয় যে, তার নিজের দেশে জীবন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ পাচ্ছে না। এমতাবস্থায় কোনো অমুসলিম দেশে তার জীবন পরিচালনার উপকরণের ব্যবস্থা হয়ে যায়, তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য উল্লিখিত শর্তের সঙ্গে অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করা জায়েজ আছে। কেননা, অন্যান্য ফরজ বিধানের সঙ্গে সঙ্গে হালাল রিজিক উপার্জন করাও একটি ফরজ বিধান। আর হালাল রিজিক উপার্জনের জন্য শরিয়ত নির্দিষ্ট কোনো জায়গার শর্তারোপ করেনি। মহান আল্লাহ বলছেন—

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾

'আল্লাহ এমন সত্তা! যিনি জমিনকে তোমাদের অধীনস্ত করে দিয়েছেন। তোমরা তার রাস্তায় চলো এবং আল্লাহর রিজিক অনুসন্ধান করো। তার কাছেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।'[১৪৭]

৩. কোনো মুসলিম যদি অমুসলিম দেশের অমুসলিমদেরকে ইসলামের দাওয়াত বা সে দেশে বসবাসরত মুসলিমদের কাছে ইসলামি বিধিবিধান পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে সে দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে, তাহলে এ ক্ষেত্রে তার নাগরিকত্ব গ্রহণ জায়েজ হওয়া ছাড়াও এ উদ্দেশ্যের কারণে সে সওয়াব পাবে। এ মহৎ উদ্দেশ্যে অনেক সাহাবি অমুসলিম দেশে স্থায়ীভাবে বসাবাস করেছেন। আর এটিকে তাদের জীবনের মর্যাদা ও মহত্বের মধ্যে গণ্য করা হয়।

৪. কোনো মুসলিম যদি ইসলামি দেশে অন্যান্য মুসলিমদের মতো স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে। কিন্তু আরও স্বাচ্ছন্দ জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে অমুসলিম দেশে যায়। শুধু আরাম আয়েশের জন্য এমনটি করে, তাহলে এ ধরনের নাগরিকত্ব গ্রহণ করা মাকরুহ হবে। কেননা, সে কোনো ধরনের প্রয়োজন ছাড়া শুধু ব্যক্তিগত আরাম আয়েশের উদ্দেশ্যে নিজেকে সেই দেশের অশালিন ও অশ্লীল পরিবেশে ফেলেছে যাতে ধর্মীয় ও চারিত্রিক অবক্ষয়ের ঝুকি রয়েছে। বাস্তব অভিজ্ঞতা সাক্ষী যে,

---

[১৪৭] সুরা : মুলক, আয়াত : ১৫।

যারা এ ধরনের আরাম আয়েশের উদ্দেশ্যে অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে, তাদের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ কমে যায়। অমুসলিমদের কৃষ্টি-কালচারের সামনে তারা দ্রুত পরিবর্তন হয়ে যায়। এ কারণে বাধ্য না হলে অমুসলিম দেশে বসবাসের ব্যাপারে হাদিসে নিষেধ এসেছে। ইমাম আবু দাউদ রহ. সামুরা ইবনু জুনদুব রা. থেকে বর্ণনা করেন—

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (من جامع المشرك، وسكن معه فإنه مثله)

'মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিমের সঙ্গে উঠাবসা করবে এবং তার সঙ্গে বসবাস করবে, সে ওই অমুসলিমের মতো।'[১৪৮]

ইমাম আবু দাউদ ও তিরমিজি রহ. জারির ইবনু আবদুল্লাহ রহ. থেকে বর্ণনা করেন—

أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا: يا رسول الله، لم؟ قال: لا تراءي ناراهما.

'মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি এমন মুসলিম থেকে দায়মুক্ত, যে অমুসলিমদের মাঝে বসবাস করে। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, কেন? উত্তরে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা পার্থক্য করতে পারবে না যে, এটা মুসলিমদের আগুন না কি ওই কাফেরদের।'[১৪৯]

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা খাত্তাবি রহ. বলেন, এখানে কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে। একটি হলো তাদের দু-জনের হুকুম সমান নয়। কিছু আলেম এমন ব্যাখ্যা করেছেন। আর কিছু আলেম বলেন, হাদিসের উদ্দেশ্য হলো, মহান আল্লাহ মুসলিম ও কাফেরদের দেশের মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছেন। সুতরাং কোনো মুসলিমের জন্য কোনো কাফেরের দেশে বসবাস করা জায়েজ নেই। কেননা, কাফেররা

[১৪৮] সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ২৭৮৭।

[১৪৯] আবু দাউদ, হাদিস : ২৬৪৫, তিরমিজি, হাদিস : ১৬৯৭/১৬০৪।

যখন তাদের পূজার জন্য আগুন জ্বালাবে, তখন বাহ্যিক দৃষ্টিতে এই মুসলিমকে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে হবে। এখানে দলিল রয়েছে যে, কোনো মুসলিমের জন্য অমুসলিম দেশে ব্যবসার জন্য যাওয়া এবং চার দিনের বেশি সময় সেখানে অবস্থান করা মাকরুহ।'[১৫০]

ইমাম আবু দাউদ রহ. তার 'মারাসেল' কিতাবে মাকহুল থেকে বর্ণনা করেন—

عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لا تتركوا الذرية إزاء العدو)

'মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের সন্তানদেরকে শত্রুর মাঝে রেখো না।'[১৫১]

এ কারণে ফকিহগণ বলেছেন যে, শুধু অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে অমুসলিম দেশে বসবাস করা এবং তাদের সংখ্যার আধিক্যতা বোঝানোর মাধ্যম হওয়া এমন কাজ, যার কারণে সততা নষ্ট হয়ে যায়।[১৫২]

৫. যদি অমুসলিম দেশের নাগরিকত্বকে মর্যাদা ও গর্বের বিষয় মনে করা হয় অথবা মুসলিম দেশের নাগরিকত্বের ওপর এটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয় অথবা নিজের জীবন পদ্ধতিতে তাদের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখার লক্ষ্যে সেখানে নাগরিকত্ব নেওয়া হয়, তাহলে কোনো ধরনের শর্ত ছাড়া এটি হারাম হবে। এটি প্রমাণে কোনো দলিলের প্রয়োজন নেই।

মাসআলা—২.

অমুসলিম দেশে সন্তান প্রতিপালন করা

প্রশ্ন : যেসব মুসলিম আমেরিকা ইউরোপের মতো অমুসলিম দেশে তাদের সন্তান প্রতিপালন করে, তাদের পরিবেশে সন্তান প্রতিপালনের মধ্যে কিছু উপকারিতা রয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে সেখানে প্রতিপালনের কারণে অনেক সমস্যা ও ঝুঁকি রয়েছে। বিশেষ করে ইহুদি খ্রিস্টানদের সন্তানদের

[১৫০] মাআলিমুস সুনান, অধ্যায়: জিহাদ, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪৩৭।

[১৫১] তাহজিবুস সুনান, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪৩৭।

[১৫২] তাকমিলাতু রদ্দিল মুহতার, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১০১।

সঙ্গে মেলামেশা করার কারণে তাদের অভ্যাস, চরিত্রের প্রতি ঝুকে পড়ার ব্যাপারে খুব বেশি আশঙ্কা রয়েছে। আর সন্তানের পিতা-মাতা যখন তার প্রতিপালনের প্রতি দৃষ্টি না রাখে বা তাদের পিতা-মাতা উভয় বা কোনো একজন মারা যায়. তখন এই সমস্যার আশঙ্কা আরও বেড়ে যায়।

এখন প্রশ্ন হয় যে, এই সমস্যার কারণে অমুসলিম দেশে যাওয়া এবং সে দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণের হুকুমে কোনো পরিবর্তন হবে কি না? অন্যদিকে সেসব দেশে বসবাসরত মুসলিমদের দাবি হলো, আমাদের সন্তানেরা ইসলামি দেশে প্রতিপালিত হলেও সেখানের বিধর্মী ও কমিউনিস্টদের সঙ্গে মেলামেশার কারণে তারা অমুসলিম হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষ করে সেই বিধর্মী ও কমিউনিস্ট দর্শন এবং আদর্শগুলোকে যখন কোনো ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিপালন করে, তখন এই আশঙ্কা আরও বেড়ে যায়। আর সেসব মুসলিম দেশসমূহ ওই বিধর্মী ও কমিউনিস্ট দর্শনকে শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করে সাধারণ মানুষের মস্তিষ্ক ধোলাই করছে। সেইসঙ্গে যারা সেসব দর্শন গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে একটি ইসলামি দেশে আমাদের সন্তান প্রতিপালিত হওয়ার কারণে তাদের আকিদা বিশ্বাস বিনষ্ট হওয়া এবং ইসলাম ধর্ম থেকে গোমরাহ হওয়ার আশু সম্ভাবনা রয়েছে। এসব কারণে উল্লিখিত মাসআলায় কোনো পরিবর্তন হবে কি না?

উত্তর : যেসব ক্ষেত্রে অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব নেওয়া মাকরুহ বা হারাম[১৫৩], সে ক্ষেত্রে অমুসলিম দেশে সন্তান প্রতিপালন করার মাসআলাটি একটি মারাত্মক ও ঝুকিপূর্ণ মাসআলা। এ সকল ক্ষেত্রে তো সেখানে বসবাস করা থেকে একেবারে বেঁচে থাকা উচিত। আর যেসকল ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব গ্রহণ করা মাকরুহ নয়, এমন পরিস্থিতিতে সেখানে বসবাস করার বাস্তব প্রয়োজনও থাকে এ ক্ষেত্রে যারা সেখানে সন্তান প্রতিপালনে বাধ্য হয়, তাদের জন্য আবশ্যক হলো, নিজ সন্তানের প্রতিপালনের ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। আর সে দেশে যেসব মুসলিম বসবাস করে, তাদের জন্য আবশ্যক হলো, সেখানে এমন একটি পবিত্র তরবিয়াতের পরিবেশ তৈরি

---

[১৫৩] যার বিস্তারিত বিবরণ প্রথম প্রশ্নের উত্তরে দেওয়া হয়েছে।

করবে, যার মাধ্যমে সেখানে আগত মুসলিমরা তাদের সন্তানদের ইসলামি আকিদা, আমল ও চরিত্রকে সুন্দর ও যথার্থভাবে রক্ষা করতে পারবে।

মাসআলা—৩-৪.

মুসলিম নারীর অমুসলিম পুরুষের সঙ্গে বিয়ে

১. প্রশ্ন : কোনো মুসলিম নারী অমুসলিম পুরুষের সঙ্গে বিয়ে করার হুকুম কী? এ ক্ষেত্রে যদি নারীর এমন আশা থাকে যে, বিয়ে করার মাধ্যমে পুরুষ মুসলিম হয়ে যাবে, তাহলে এমন আশায় অমুসলিম পুরুষের সঙ্গে মুসলিম নারীর বিয়ে করা সহিহ হবে কি না? অন্যদিকে ওই মুসলিম নারী বিয়ে করার মতো তার সমপর্যায়ের কোনো মুসলিম পুরুষ পাচ্ছে না আবার জীবন পরিচালনায় অর্থনৈতিক সংকীর্ণতার কারণে সে নিজেও দীন থেকে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে এমন পরিস্থিতিতে এ ধরনের বিয়ে জায়েজ বলার কোনো সুযোগ আছে কি না?

২. প্রশ্ন : যদি কোনো স্ত্রী মুসলিম হয়ে যায়, আর তার স্বামী অমুসলিম রয়ে যায়, তাহলে এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর তার স্বামীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক ঠিক রাখার সুযোগ আছে কি না? আর স্ত্রীর আশা আছে যে, তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ঠিক রাখলে সে তার স্বামীকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে মুসলিম বানাতে পারবে। অন্যদিকে ওই স্বামী থেকে তার সন্তানও রয়েছে। এমতাবস্থায় বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার কারণে সন্তান খারাপ হয়ে দীন থেকে বিচ্যুত হওয়ারও সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে স্ত্রীর জন্য ওই স্বামীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক ঠিক রাখার সুযোগ আছে কি না?

৩. প্রশ্ন : আর স্ত্রীর যদি তার স্বামীকে মুসলিম বানানোর আশা না থাকে। তবে তার স্বামী তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে এবং যথার্থভাবে দাম্পত্য জীবনের অধিকার আদায় করেছে, অন্যদিকে সে মহিলার এই আশঙ্কাও রয়েছে যে, সে যদি ওই স্বামীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে নেয়, তাহলে কোনো মুসলিম পুরুষ তাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত হবে না। এমন অবস্থায় মাসআলার জায়েজ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে কোনো পার্থক্য হবে কি না?

উত্তর : কোনো অবস্থাতেই কোনো মুসলিম নারীর জন্য অমুসলিম পুরুষের সঙ্গে বিয়ে করা জায়েজ নেই। পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট হুকুম রয়েছে—

﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾

'ইমান আনা ছাড়া মুশরিক পুরুষদের সঙ্গে নিজেদের নারীদের বিয়ে দিয়ো না। অবশ্যই মুশরিক অপেক্ষা মুসলিম দাস উত্তম। যদিও তোমাদের কাছে মুশরিক ভালো লাগে।'[১৫৪]

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে—

﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾

'মুসলিম নারীরা মুশরিক পুরুষদের জন্য বৈধ নয়। আর মুশরিক পুরুষরাও মুসলিম নারীদের জন্য বৈধ নয়।'[১৫৫]

কেবল কোনো অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণের আশা বা সম্ভাবনা কোনো মুসলিম নারীর জন্য তার সঙ্গে বিয়ে করা জায়েজের কারণ হতে পারে না। আর না এ ধরনের আশা ও সম্ভাবনা কোনো হারামকে হালাল করতে পারে।

অনুরূপভাবে কোনো নারী যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের অভিমত অনুযায়ী শুধু তার ইসলাম গ্রহণের দ্বারাই তাদের বৈবাহিক সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটে। অবশ্য ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী শুধু ইসলাম গ্রহণের কারণেই বৈবাহিক সম্পর্কে বিচ্ছেদ ঘটে না। বরং স্ত্রী ইসলাম গ্রহণের পর স্বামীকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হবে। দাওয়াত দেওয়ার পর সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তাহলে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ঠিক থাকবে। আর সে যদি ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে বৈবাহিক সম্পর্কের ইতি ঘটবে।

আর যদি কিছু দিন পর স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে দেখতে হবে যে, স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হয়েছে কি না? স্বামী যদি স্ত্রীর ইদ্দতকালীন ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তাদের প্রথম বৈবাহিক সম্পর্কটি ফিরে আসবে। আর যদি ইদ্দত শেষ হওয়ার পর স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে নতুন করে

---

[১৫৪] সুরা বাকারা, আয়াত: ২২১।

[১৫৫] সুরা মুমতাহিনা, আয়াত: ১০।

তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। নতুন করে বিয়ে করার পর তারা আগের মতো স্বামী-স্ত্রী থাকবে। এ মাসআলার ব্যাপারে সব ফকিহ একমত। সুতরাং স্বামীর ইসলাম গ্রহণের আশা বা সম্ভাবনার ভিত্তিতে ইসলামের একটি অকাট্য হুকুম পরিবর্তিত হতে পারে না।

মাসআলা—৫.

মুসলিমদের লাশ অমুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা

প্রশ্ন : আমেরিকা ও ইউরোপের দেশসমূহে মুসলিমদের জন্য এমন কোনো স্বতন্ত্র কবরস্থান থাকে না, যেখানে তারা নিজেদের লাশ দাফন করতে পারে। আর যেসব গণকবরস্থান রয়েছে সেখানে ইহুদি খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মের লোকেরা তাদের লাশ দাফন করে। আর মুসলিমদের লাশ দাফন করার জন্য ভিন্ন কোনো জায়গারও অনুমতি পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় মুসলিমরা তাদের লাশকে কি অমুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করতে পারবে?

উত্তর : সাধারণ অবস্থায় কোনো মুসলিমের লাশকে অমুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা জায়েজ নেই। অবশ্য প্রশ্নে উল্লিখিত পরিস্থিতিতে যেখানে না মুসলিমদের জন্য ভিন্ন কোনো কবরস্থান আছে আর না অন্য কোথাও তাদের লাশ দাফনের অনুমতি পাওয়া যায়। এমন পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের খাতিরে মুসলিমদের লাশকে অমুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা জায়েজ আছে।

মাসআলা—৬.

মসজিদ বিক্রি করা

প্রশ্ন : যদি আমেরিকা ও ইউরোপের কোনো এলাকার মুসলিম ওই এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় চলে যায়। আর আগের এলাকায় যে মসজিদ রয়েছে সেটি বিরান হওয়া বা অমুসলিমরা সেটি দখল করে নেওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে এমন অবস্থায় কি ওই মসজিদ বিক্রি করা জায়েজ আছে? কেননা, সাধারণত মুসলিমরা মসজিদের জন্য কোনো বাড়ি ক্রয় করে সেটিকে মসজিদ করে নেয়। আর পরবর্তী সময়ে অবস্থার পরিপেক্ষিতে অধিকাংশ মুসলিম যখন ওই এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যায়, তখন অমুসলিমরা

সেটি দখল করে তাদের নিজেদের কাজে ব্যবহার করে। অথচ এমন করা সম্ভব যে, ওই মসজিদ বিক্রি করে সে অর্থ দিয়ে অন্য এলাকায় কোনো বাড়ি ক্রয় করে মসজিদ বানানো যাবে। এমন পরিস্থিতিতে শরয়ি দৃষ্টিতে কি একটি মসজিদকে অন্য মসজিদে পরিবর্তন করা জায়েজ আছে?

উত্তর : পশ্চিমা দেশসমূহে মুসলিমরা যেসব জায়গায় নামাজ আদায় করে, সেগুলো দু-ধরনের হয়ে থাকে। যথা—

১. এমন কিছু জায়গা, যেগুলোকে নামাজ আদায় ও ধর্মীয় মজলিসের জন্য নির্ধারণ করে। তবে শরয়ি মসজিদের মতো সেগুলো ওয়াকফ করে শরয়ি মসজিদ বানায় না। এ কারণে সেগুলোকে মসজিদের নাম না দিয়ে অন্যান্য নাম দেওয়া হয়। যেমন : ইসলামি মারকাজ, দারুস সলাত ও দারুল জামাত। এ ধরনের জায়গার মাসআলা খুবই সহজ। কারণ, সেগুলোকে যদিও নামাজের জন্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সেগুলো শরয়ি মসজিদ নয়। কারণ, তার মালিকগণ সেটিকে শরয়ি মসজিদ করেনি। সুতরাং তার মালিকগণ মুসলিমদের কল্যাণে যখন সেগুলো বিক্রি করতে চাইবে, তখন সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী সেগুলো বিক্রি করা জায়েজ হবে।

২. এমন কিছু জায়গা থাকে, শরয়ি মসজিদের মতো যেগুলোকে ওয়াকফ করে মসজিদ করা হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহদের অভিমত অনুযায়ী এ ধরনের মসজিদের হুকুম হলো, কেয়ামত পর্যন্ত সেগুলো মসজিদ থাকবে। কোনো অবস্থাতেই সেগুলো বিক্রি করা জায়েজ নেই এবং কখনোই সেটি তার ওয়াকফকারীর মালিকানায় ফিরে যাবে না। এটি হলো, ইমাম মালিক, শাফিয়ি, আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ রহ.-এর অভিমত।

শাফিয়ি মাজহাবের ইমাম আল্লামা খতিব শিরবিনি রহ. বলেন—

ولو انهدم مسجد، وتعذرت إعادته أو تعطل بخراب البلد مثلا، لم يعد ملكا، ولم يبع بحال، كالعبد إذا عتق، ثم زمن، ولم ينقض إن لم يخف عليه لإمكان الصلاة فيه، ولإمكان عوده كما كان.. فإن خيف عليه

نقض، وبني الحاكم بنقضه مسجدا آخر إن رأي ذلك وإلا حفظه، وبناؤه بقربه أولي، ولا يبني به بئر» .

'যদি কোনো মসজিদ ধ্বংস হয়ে যায়। আর সেটিকে দ্বিতীয়বার মেরামত করা সম্ভব না হয়। অথবা সে এলাকার মানুষ না থাকার কারনে সেটি বিরান হয়ে যায় তারপরও সে মসজিদ তার ওয়াকফকারীর মালিকানায় ফিরে আসবে না। এবং সেটিকে বিক্রিও করা যাবে না। যেমন : দাস আজাদ করে দেওয়ার পর যদি সে অক্ষম হয়ে পড়ে তাকেও দ্বিতীয়বার বিক্রি করা জায়েজ নেই। এরপর সেটির ওপর যদি অমুসলিমদের কবজা করার আশঙ্কা না থাকে, তাহলে সেটি ধ্বংস করা যাবে না। কেননা, এমন সম্ভাবনা রয়েছে যে, সেখানে আগের মতো মুসলিমরা আসবে এবং সেটিকে আবাদ করবে। ...অবশ্য যদি অমুসলিমরা কবজা করে নেওয়ার আশঙ্কা থাকে, সে ক্ষেত্রে সমকালীন হাকিম যদি ভালো মনে করেন, তাহলে সেটি ভেঙে দিয়ে তার অর্থ দিয়ে অন্য কোনো মসজিদ নির্মাণ করতে পারেন বা তার অর্থ সংরক্ষণ করতে পারেন। তবে দ্বিতীয় মসজিদটি প্রথম মসজিদের কাছে নির্মাণ করা উত্তম। আর সমকালীন হাকেম যদি সেটি ভেঙে দেওয়া বা ধ্বংস করাকে ভালো মনে না করেন, তাহলে সেটিকে তার অবস্থায় সংরক্ষণ করবেন।'[১৫৬]

মালিকি মাজহাবের ফকিহদের মধ্য থেকে আল্লামা মাওয়াক ইবনু কুদামা রহ. বলেন—

«ابن عرفة من المدونة وغيرها: يمنع بيع ما خرب من ربع الحبس مطلقا.. وعبارة الرسالة: ولا يباع الحبس وإن خرب.. وفي الطرر عن ابن عبد الغفور: لا يجوز بيع مواضع المسجد الخربة، لأنها وقف، ولا بأس ببيع نقضها» .

'ইবনু আরাফা রহ. মুদাওয়ানাহ ও অন্যান্য কিতাব থেকে বর্ণনা করেন, কোনো অবস্থায়ই ওয়াকফের জায়গা বিক্রি করা জায়েজ নেই। যদিও সেটি বিরান হয়ে যায়। আর রিসালা কিতাবের মধ্যে এ বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, বিরান হয়ে গেলেও ওয়াকফের জায়গা বিক্রি করা জায়েজ নেই। ...তুরার নামক কিতাবে ইবনু আবদুল গফুর থেকে বর্ণিত

[১৫৬] মুগনিল মোহতাজ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৯২।

আছে, বিরান মসজিদের জায়গা বিক্রি করা জায়েজ নেই। কেননা, সেটি ওয়াকফকৃত। তবে তার ভগ্নাংশ বিক্রি করা জায়েজ আছে।'[১৫৭]

ফিকহে হানাফির হিদায়া কিতাবে উদ্ধৃত হয়েছে—

«ومن اتخذ أرضه مسجدا لم يكن له أن يرجع فيه، ولا يبيعه ولا يورث عنه، لأنه تجرد عن حق العباد، وصار خالصا لله، وهذا لأن الأشياء كلها لله تعالى، وإذا أسقط العبد ما ثبت له من الحق رجع إلى أصله، فانقطع تصرفه عنه، كما في الإعتاق، ولو خرب ما حول المسجد واستغني عنه يبقي مسجدا عند أبي يوسف لأنه إسقاط منه، فلا يعود إلى ملكه».

'কেউ যদি তার জমিকে মসজিদের জন্য ওয়াকফ করে দেয়, তাহলে সেটি ফিরিয়ে নেওয়া, বিক্রি করা বা তার মধ্যে মিরাস জারি করা জায়েজ নেই। কারণ, সেটি মানুষের হক থেকে ভিন্ন হয়ে একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়ে গেছে। এমনটি হওয়ার কারণ হলো, মৌলিকভাবে সব জিনিস মহান আল্লাহর জন্য। বান্দা সেটি ব্যবহারের যে অধিকার পেয়েছিলো, যখন সে সেই অধিকার রহিত করলো, তখন তা তার আসল মালিকের কাছে চলে গেলো। ফলে এখন সেখানে বান্দার হস্তক্ষেপের অধিকার শেষ হয়ে গেছে। যেমন : দাস আজাদ করার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর যদি মসজিদের আশপাশের এলাকা বিরান হয়ে যায় এবং মসজিদের প্রয়োজন না থাকে, তাহলে এ ক্ষেত্রেও ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী সেটি মসজিদ হিসেবেই বাকি থাকবে। কেননা, বান্দা তার অধিকার রহিত করে দিয়েছে, ফলে সেটি আর দ্বিতীয়বার ফিরে আসবে না।'[১৫৮]

অবশ্য এ ক্ষেত্রে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ.-এর অভিমত হলো, যদি মসজিদের আশপাশের এলাকা বিরান হয়ে যায় এবং একেবারেই মসজিদের প্রয়োজন না থাকে, তাহলে সেটি বিক্রি করা জায়েজ আছে। আল্লামা ইবনু কুদামা রহ.-এর 'আল-মুগনি' কিতাবে এই বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে—

«أن الوقف إذا خرب، وتعطلت منافعه، كدار انهدمت أو أرض

[১৫৭] আত-তাজ ওয়াল ইকলিল, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৪২।

[১৫৮] হিদায়া, ফাতহুল কাদিরের সঙ্গে প্রকাশিত, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪৪৬।

خربت، وعادت مواتا، ولم تمكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه، وصار في موضع لا يصلى فيه، أو ضاق بأهله، ولم يمكن توسيعه في موضعه، أو تشعب جميعه، فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه، جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته، وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه.

'যদি ওয়াকফের জমি বিরান হয়ে যায় এবং তার উপকারিতা শেষ হয়ে যায়, যেমন : কোনো বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেলো বা কোনো জমি বিরান হয়ে পরিত্যক্ত জমিতে পরিণত হলো এবং সেটিকে মেরামত করাও সম্ভব হলো না অথবা কোনো মসজিদের এলাকার লোক অন্য কোথাও চলে গেলো এবং মসজিদে নামাজ আদায় করার মতো কেউ থাকলো না। অথবা এলাকার লোকদের জন্য মসজিদটি সংকীর্ণ হয়ে গেলো এবং তাদের পক্ষে সেটি বড়ো করার সামর্থ নেই। অথবা সে এলাকার লোক বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে যাওয়ার কারণে তার প্রতিবেশী এতো কমে গেলো যে, তারা পূর্ণ মসজিদ বা মসজিদের অংশবিশেষ মেরামত করতে পারবে না, তাহলে এমন পরিস্থিতিতে মসজিদের কিছু অংশ বিক্রি করে অন্য অংশ মেরামত করা জায়েজ আছে। আর যদি সেটির মাধ্যমে কোনোভাবে উপকৃত না হওয়া যায়, তাহলে পূর্ণ মসজিদ বিক্রি করা জায়েজ আছে।'[১৫৯]

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ. ছাড়াও ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু হাসান শাইবানি রহ. ও বিক্রয় জায়েজের পক্ষে। তার অভিমত হলো, ওয়াকফের জিনিস থেকে যদি একেবারে উপকৃত না হওয়া যায়, তাহলে সেটি তার মালিকের বা তার ওয়ারিসের মালিকানায় ফিরে যাবে। হিদায়া গ্রন্থ প্রণেতা বলেন—

«وعند محمد يعود إلى ملك الباني، أو إلى وراثه بعد موته، لأنه عينه لنوع قربة، وقد انقطعت، فصار كحصير المسجد وحشيشه إذا استغني عنه.»

'ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী ওয়াকফকৃত জমি তার মালিক বা মালিকের মৃত্যুর পর তার ওয়ারিসের মালিকানায় ফিরে যাবে। কারণ, তার মালিক সেটিকে একটি নির্দিষ্ট ইবাদতের জন্য

[১৫৯] আল-মুগনি, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২২৫।

ওয়াকফ করেছিলো। আর সে নির্দিষ্ট ইবাদতটি এখন বন্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং এটি মসজিদের পাটি ও ঘাসের মতো হয়ে গেছে। প্রয়োজন শেষ হলে সেগুলো তার মালিকের মালিকানায় ফিরে যায়।'[১৬০]

সুতরাং ওয়াকফকৃত জিনিসটি যখন তার মালিকের মালিকানায় ফিরে আসলো, তখন সেটি বিক্রি করা জায়েজ হবে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহগণ ওয়াকফকৃত জিনিস বিক্রি করা নাজায়েজ ও সেটি ওয়াকফকারীর মালিকানায় ফিরে না যাওয়ার পক্ষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সংঘটিত উমর রা.-এর খায়বারের ঘটনা দিয়ে দলিল দেন। উমর রা. খায়বারের জমি ওয়াকফ করার সময় এই শর্ত দিয়েছিলেন—

أنه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا تورث ولا توهب.

'ভবিষ্যতে এই জমি বিক্রি করা হবে না, ক্রয় করা যাবে না, তার ওয়ারিস হবে না এবং সেটি দান করা যাবে না।'[১৬১]

ঘটনাটি বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে উদ্ধৃত বক্তব্যটি মুসলিম থেকে গৃহীত।

ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর পক্ষ থেকে কাবার মাধ্যমে দলিল দেওয়া হয়। কারণ, ইসা আ. ও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের মধ্যবর্তী সময়ে সেটি ছিলো মূর্তিপূজার জায়গা। কাফেররা তার পাশে শুধু চিৎকার ইত্যাদি করতো। এরপরও পবিত্র কাবা মহান আল্লাহর জন্য ইবাদত ও নৈকট্য অর্জনের জায়গা হিসেবেই রয়ে যায়। সুতরাং অন্যান্য সব মসজিদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। (অর্থাৎ মসজিদে ইবাদত করার মতো কোনো একজন মুসলিমও যদি না থাকে, তবুও সে মসজিদ ইবাদতগাহ হিসেবে থেকে যাবে।) তবে ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর এই দলিলের ওপর আল্লামা ইবনু হুমাম রহ. তার রচিত কিতাব ফাতহুল কাদিরে প্রশ্ন তুলেছেন যে, উল্লিখিত সময়ে বাইতুল্লার পাশে তাওয়াফ তো কাফের মুশরিকরাও করেছে। আর এটি একটি ইবাদত। তাই কাবার আসল উদ্দেশ্য ইবাদত কখনোই বন্ধ হয়নি। তবে আল্লামা জফর আহমাদ উসমানি রহ. আল্লামা ইবনু হুমাম রহ.-

[১৬০] হিদায়া, ফাতহুল কাদিরের সঙ্গে প্রকাশিত, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪৪৬।

[১৬১] বুখারি ২৭৩৭, মুসলিম ১৬৩২।

এর এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যে, কাবার জন্য নির্ধারিত ইবাদত হলো নামাজ। শুধু তাওয়াফ করা তার নির্ধারিত ইবাদত নয়। কারণ, ইবরাহিম আ. কাবার পাশে তার পরিবার রাখার কারণ হিসেবে সাব্যস্ত করেছিলেন যে, তারা যেন সেখানে নামাজ পড়ে। মহান আল্লাহ তা বর্ণনা করেছেন—

رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ.

'হে প্রভু, তারা যেন এখানে নামাজ পড়ে।'

ইবরাহিম আ. এখানে নামাজের কথা বলেছেন। তাওয়াফের কথা বলেননি। এ ছাড়াও মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ইবরাহিম আ.-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো—

وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ.

'আমার ঘরকে মুসাফির ও মুকিমদের জন্য পবিত্র করো।'

এ দলিলটি তখনই ঠিক হবে, যখন 'الطائفين' ও 'الْقَائِمِينَ' এর ব্যাখ্যা করা হবে মুসাফির ও মুকিমের মাধ্যমে। যেমনিভাবে পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে ' الْعَاكِفُ وَالْبَادِ'-এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে মুকিমের মাধ্যমে। বর্ণিত হচ্ছে—

سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ

'মুকিম ও মুসাফির উভয়ে সমান।'[১৬২]

এ ছাড়াও সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মজবুত দলিল হলো কুরআনের এই আয়াত—

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾

'সব মসজিদ মহান আল্লাহর জন্য। সুতরাং আল্লাহর সঙ্গে আর কারও ইবাদত করো না।'[১৬৩]

আল্লামা ইবনু আরাবি রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন—

إذا تعينت لله أصلا، وعينت له عقدا، صارت عتيقة عن التملك، مشتركة بين الخليفة في العبادة.

---

[১৬২] ইলাউস সুনান, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ২১২।

[১৬৩] সুরা জিন, আয়াত: ১৮।

'মসজিদগুলো যখন মহান আল্লাহর জন্য নির্ধারিত হয়ে গেলো এবং ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেলো। তখন সব ধরনের মালিকানা থেকে সেটি মুক্ত হয়ে গেলো। ইবাদতের জন্য সব মাখলুকের ক্ষেত্রে সেটি সমান হয়ে গেলো।'[১৬৪]

আল্লামা ইবনু জারির তবারি রহ. তার তাফসির গ্রন্থে ইকরামা রা.-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন—

{ وأن المساجد لله } قال: المساجد كلها.

'নিশ্চয় সব মসজিদ আল্লাহর জন্য। ইকরামা রা. বলেন, সব মসজিদ এই হুকুমের আওতাভুক্ত। কোনো পার্থক্য নেই।'[১৬৫]

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ.-এর অভিমতকে সমর্থন করতে আল্লামা ইবনু কুদামা রহ. উমর রা.- র সেই পত্রের মাধ্যমে দলিল দেন। যেটিকে তিনি সাদ রা.-এর কাছে লিখেছিলেন। ঘটনাটি এমন ছিলো যে, উমর রা. যখন কুফার বাইতুল মালে চুরি হওয়ার বিষয়টি জানতে পারলেন, তখন সাদ রা.-এর কাছে পত্র লিখলেন যে, তামারিন নামক জায়গায় যে মসজিদটি রয়েছে সেটিকে স্থানান্তরিত করে বাইতুল মালের কাছে এমনভাবে নির্মাণ করবে যে, বাইতুল মালের দিকে মসজিদের কেবলা থাকবে। কারণ, মসজিদে সবসময় কোনো একজন নামাজি অবস্থান করে। (আর এভাবে বাইতুল মাল সংরক্ষিত হবে।)

আল্লামা ইবনু হুমাম রহ. এই দলিলের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন—

بأن يمكن أنه أمره باتخاذ بيت المال في المسجد.

'এখানে এমন উদ্দেশ্য নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যে, মসজিদকে স্থানান্তরিত করা উমর রা.-এর উদ্দেশ্য ছিলো না। বরং তার উদ্দেশ্য ছিলো বাইতুল মালকে স্থানান্তরিত করে মসজিদের সামনে নির্মাণ করা।'[১৬৬]

সারকথা, এ মাসআলার ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের অভিমতই প্রাধান্যপ্রাপ্ত। সুতরাং কোনো মসজিদ শরয়ি মসজিদ হওয়ার পর সেটি বিক্রি

[১৬৪] আহকামুল কুরআন, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৮৬৯।
[১৬৫] তাফসিরে ইবনু জারির, পারা. ২৯, পৃষ্ঠা : ১১৭।
[১৬৬] ফাতহুল কাদির, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪৪৬।

করা জায়েজ নেই। যদি মসজিদ বিক্রয়কে জায়েজ বলা হয়, তাহলে মানুষ তাদের ইচ্ছে মতো খ্রিস্টানদের উপাসনালয়ের ন্যায় বিক্রয় করতে শুরু করবে। আর মসজিদ একটি ব্যবসার পণ্যে পরিণত হবে।

তবে মাসআলাটির ব্যাপারে যেহেতু ফকিহদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে এবং উভয় পক্ষে কুরআন-হাদিসের দলিল রয়েছে। সুতরাং কোনো অমুসলিম দেশে মসজিদের এলাকার লোকজন হিজরত করে অন্যত্র চলে গেলে এবং তারা ফিরে আসার সম্ভাবনা না থাকলে এবং সঙ্গে সঙ্গে মসজিদের ওপর যদি কাফেরদের কবজা হওয়ারও আশঙ্কা থাকে, তাহলে এমন কঠিন পরিস্থিতিতে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ও মুহাম্মাদ ইবনু হাসান শাইবানি রহ.-এর মতও গ্রহন করার সুযোগ আছে বলে মনে হয়। এ ক্ষেত্রে মসজিদ বিক্রি করা হলে অন্য মসজিদে তার অর্থ ব্যয় করতে হবে। মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো খাতে তার অর্থ ব্যয় করবে না। এ সম্পর্কে হাম্বালি মাজহাবের ফকিহগণও স্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন। তারা বলেছেন—

«ولو جاز جعل أسفل المسجد سقاية وحوانيت لهذه الحاجة، لجاز تخريب المسجد، جعله سقاية وحوانيت، ويجعل بدله مسجدا في موضع آخر.»

‘প্রয়োজনের কারণে যদি মসজিদের নিচের অংশ পানি ও দোকানের জন্য নির্ধারণ করা জায়েজ হয়, তাহলে এমন পানি ও দোকানবিশিষ্ট মসজিদ ভেঙে ফেলা জায়েজ আছে। আর তার অর্থ দিয়ে অন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করবে।’[১৬৭]

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ.-এর অভিমতের ওপর নির্ভর করে শুধু সেসব ক্ষেত্রে মসজিদ বিক্রি করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যেখানে মসজিদের এলাকা থেকে সব মুসলিম অন্যত্র চলে যাবে। অথবা তাদের ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। তবে যদি সব মুসলিম সেখান থেকে না যায়, বরং মুসলিমদের অধিকাংশ সেখান থেকে চলে যায়। কিন্তু কিছু মুসলিম সেখানে রয়ে যায়, তাহলে এমন ক্ষেত্রে মসজিদ বিক্রি করার কোনো সুযোগ নেই। এ ব্যাপারে হাম্বালি মাজহাবের ফকিহগণও স্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন। তারা বলেছেন—

[১৬৭] আল-মুগনি, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২৬৮।

«وإن لم تتعطل مصلحة الوقف بالكلية لكن قلت: وكان غيره أنفع منه، وأكثر ردا على أهل الوقف لم يجز بيعه، لأن الأصل تحريم البيع، وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف عن الضياع مع إمكان تحصيله، ومع الانتفاع وإن قل ما يضيع المقصود.

'ওয়াকফের উপকারিতা যদি একেবারে বাতিল না হয়। বরং তার উপকারিতা কমে যায়। আর সেটির তুলনায় অন্যস্থান বেশি উপকারি হয় এবং ওয়াকফকারীদের জন্যও বেশি ভালো হয়, তাহলেও সেটি বিক্রি করা জায়েজ নেই। কেননা, আসল হুকুম হলো, এগুলো বিক্রি করা হারাম। কিন্তু ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষার স্বার্থে এবং তার উদ্দেশ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনে সেটি বিক্রি করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিলো। তবে যদি ওয়াকফ থেকে উপকৃত হওয়া যায়, যদিও তার পরিমাণ কম হোক এমন ক্ষেত্রে ওয়াকফের উদ্দেশ্য বিনষ্ট হওয়ার কারণে তার বিক্রয় জায়েজ হবে না।'[১৬৮]

মাসআলা—৭.

শরয়ি মাহরাম ছাড়া মহিলাদের সফর করা

প্রশ্ন : অনেক মুসলিম মহিলা জীবিকা অর্জন বা শিক্ষার জন্য মাহরাম ছাড়া একাকি দূরের দেশে সফর করে। এ ধরনের সফরে তাদের সঙ্গে কোনো শরয়ি মাহরাম বা পরিচিত কোনো মহিলা থাকে না। এমন ক্ষেত্রে তাদের ব্যাপারে কী হুকুম? তাদের জন্য এভাবে একাকী সফর করা জায়েজ আছে কি না?

উত্তর : মুসলিমে আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন—

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (لا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا ومعها زوج أو ذو رحم محرم منها.)

'মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোনো মহিলা স্বামী বা মাহরাম ছাড়া তিন দিনের অধিক দূরত্বের পথ সফর করবে না।' বর্তমানে ৪৮ মাইল বা ৭৭.২৫ কি. মি.।[১৬৯]

[১৬৮] আল-মুগনি, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২২৭।

[১৬৯] মুসলিম ৩২৫৮/১৩৩৮।

বর্ণিত হাদিসে মহিলাকে একাকী সফর করার ব্যাপারে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহগণ এই হাদিসটির মাধ্যমে দলিল দিয়ে বলেন, হজের ফরজ বিধান আদায় করার জন্যও কোনো মহিলা শরয়ি মাহরাম ছাড়া সফর করবে না। আর শিক্ষা বা কাজের জন্য অন্য দেশে যাওয়া, এটি মুসলিম নারীদের জন্য তেমন কোনো প্রয়োজনই নয়। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া নারীদেরকে বাড়ির বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে শরিয়ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। শরিয়তের পক্ষ থেকে নারীর পিতা বা স্বামীকে তার সব ধরনের আর্থিক প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এ ধরনের প্রয়োজনে মাহরাম ছাড়া তার জন্য সফর করা বৈধ হবে না।

হ্যাঁ, তবে যদি এমন কোনো নারী থাকে, যার পিতা, স্বামী বা এমন কোনো নিকটাত্মীয় নেই, যে তার জীবনযাত্রার দায়ভার গ্রহণ করবে। আর তার কাছে এমন কোনো অর্থও নেই, যার মাধ্যমে তার নিজের প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম হয়। এ ক্ষেত্রে তার জন্য প্রয়োজন পরিমাণ উপার্জনের উদ্দেশ্যে বাইরে যাওয়া জায়েজ হবে। তবে যথার্থভাবে পর্দার বিধান রক্ষা করতে হবে। সুতরাং এ ধরনের পরিস্থিতিতে নিজ এলাকা বা দেশে উপার্জন করাই যথেষ্ট। অন্য দেশে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আর যদি সে অনিবার্য কারণে তার দেশের এক শহর থেকে অন্য শহরে সফর করতে বাধ্য হয় এবং তার কোনো মাহরাম না থাকে, তাহলে এমন ক্ষেত্রে শুধু তার জন্য মালিকি ও শাফিয়ি মাজহাবের অভিমত গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। অর্থাৎ এমন মহিলার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য মুসলিম মহিলাদের সঙ্গে সফর করাকে তারা জায়েজ বলেছেন।[১৭০]

মাসআলা—৮.

অমুসলিম দেশে নারীদের একাকি বসবাস করা

প্রশ্ন : অনেক মুসলিম নারী এবং যুবতি মেয়ে আধুনিক শিক্ষা বা অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে অমুসলিম দেশে একাকি থাকে বা অমুসলিম নারীদের সঙ্গে থাকে। এসব নারীদের এভাবে একাকি থাকা বা অমুসলিম নারীদের সঙ্গে থাকা শরয়ি দৃষ্টিতে জায়েজ কি না?

---

[১৭০] আল-মুগনি, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৭০।

উত্তর : সপ্তম প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলেছি যে, শিক্ষা বা উপার্জনের উদ্দেশ্যে মুসলিম নারীদের জন্য অমুসলিম দেশে সফর করা জায়েজ নেই। তবে কোনো মহিলা যদি তার মাহরামের সঙ্গে এ ধরনের দেশের নাগরিকত্ব নিয়ে থাকে। এরপর তার মাহরাম মারা যাবার কারণে। অথবা কোনো কারণে তার মাহরাম অন্য কোথাও চলে যাওয়ায় সে একাকি হয়ে গেছে। এমন অবস্থায় সে মহিলার জন্য এমন দেশে একাকি বসবাস করতে কোনো সমস্যা নেই। তবে তার জন্য শর্ত হলো, পর্দার ব্যাপারে শরয়ি বিধান মেনে চলতে হবে।

মাসআলা—৯.

অমুসলিম দেশে কাজের প্রয়োজনে মহিলাদের হাত ও মুখ খোলা রাখার বিধান

প্রশ্ন : সেসব দেশের অনেক মহিলাই বলেন যে, তারা যথাসম্ভব মুখ ও হাত ছাড়া শরিরের বাকি অংশ ঢেকে রাখতে পারেন। তাদের কেউ কেউ কাজের প্রয়োজনে বা শিক্ষার প্রয়োজনে মাথা ও গলা ঢেকে রাখতে পারেন না। এমতাবস্থায় শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে অপরিচিত মানুষের সামনে শরিয়ত মহিলাদের কতটুকু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খোলা রাখার অনুমতি প্রদান করে?

উত্তর : এই প্রশ্নের উত্তর একটি স্বতন্ত্র মাসআলার ওপর নির্ভরশীল। আর তা হলো : মুখমণ্ডল পর্দার অন্তর্ভুক্ত কি না? এই মাসআলাটি সেমিনারের স্বতন্ত্র আলোচ্যবিষয় হিসেবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। কেননা এটি দীর্ঘ আলোচনার দাবি রাখে। অতএব এই মাসআলাটিকে আগামী কোনো সেমিনারের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা উপযুক্ত হবে।

মাসআলা—১০.

যেসব হোটেলে মদ ও শূকরের গোশত বিক্রি করা হয় সেখানে কাজ করা

প্রশ্ন : ১. যেসব মুসলিম ছাত্র শিক্ষার জন্য অমুসলিম দেশে যায়। তাদের লেখাপড়া ও জীবিকার জন্য তাদের পরিবার বা অন্য কারও পক্ষ থেকে

যে অর্থ পাঠানো হয়, সেটি তাদের জন্য যথেষ্ট হয় না। ফলে সেসব ছাত্র বাধ্য হয়ে তাদের লেখা-পড়া ও জীবিকার ব্যয় জোগানোর জন্য বিভিন্ন কাজ করে। অনেক সময় তারা এমন হোটেলে চাকরি পায়, যেখানে মদ ও শূকরের গোশত বিক্রি করা হয়। অথবা এমন কাজ আঞ্জাম দিতে হয় যাতে শূকরের গোশত ও অন্যান্য হারাম জিনিস থাকে। ছাত্রদের জন্য কি এ ধরনের হোটেলে চাকরি নেওয়া জায়েজ আছে?

প্রশ্ন : ২. অনেক মুসলিম অমুসলিম দেশে মদ তৈরি করে অর্থ উপার্জন করে। আবার কেউ মদ-শূকর অমুসলিমদের নিকট বিক্রি করে এবং এটাকে তারা পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। এভাবে অমুসলিমদের জন্য মদ তৈরি করে বা শূকর বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করা কি জায়েজ আছে?

উত্তর : একজন মুসলিমের জন্য অমুসলিমদের হোটেলে চাকরি করা জায়েজ আছে। তবে তার জন্য শর্ত হলো যে, সে মদ, শূকরের গোশত বা অন্য কোনো হারাম জিনিস অমুসলিমদের সামনে পরিবেশনের দায়িত্ব পালন করবে না। কেননা, মদ পান করানো বা পরিবেশন করা হাদিসের স্পষ্ট বর্ণনার মাধ্যমে হারাম। ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণিত—

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه)

'মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মহান আল্লাহ মদ, তার পানকারী, যে ব্যক্তি পান করায়, বিক্রেতা, ক্রেতা, উৎপাদনকারী, যার জন্য উৎপাদন করা হয়, বহনকারী ও যার জন্য বহন করা হয় তাদের সবার ওপর অভিশাপ দিয়েছেন।'[১৭১]

ইমাম তিরমিজি রহ. আনাস ইবনু মালিক রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন—

لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له.

[১৭১] সুনানে আবু দাউদ, অধ্যায় : পানীয়, পরিচ্ছেদ : মদের জন্য আঙুর নিংড়ানো, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩২৬, হাদিস নং ৩৬৭৪।

‘মদের ব্যাপারে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ ব্যক্তির ওপর অভিশাপ দিয়েছেন। উৎপাদনকারী, যার জন্য উৎপাদন করা হয়, পানকারী, বহনকারী, যার জন্য বহন করা হয়, যে পান করায়, বিক্রেতা, তার মূল্য গ্রহণকারী, ক্রেতা ও যার জন্য ক্রয় করা হয়।’[১৭২]

ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, আনাস রা. থেকে হাদিসটি গরিব। ইবনু আব্বাস, ইবনু মাসউদ, ও ইবনু উমর রা. থেকে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম ইবনু মাজাহ রহ. আনাস রা. থেকে এভাবে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন—

عاصرها، ومعتصرها، والمعصورة له، وحاملها، والمحمولة له، وبائعها، والمبيوعة له، وساقيها، والمستقاة له.

‘মদ উৎপাদনকারী, যে উৎপাদন করাচ্ছে, যার জন্য উৎপাদন করা হচ্ছে, বহনকারী, যার জন্য বহন করা হচ্ছে, বিক্রেতা, যার জন্য বিক্রি করা হচ্ছে, যে পান করায়, যাকে পান করানো হয়।’[১৭৩]

ইমাম বুখারি ও মুসলিম রহ. আয়শা রা. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন—

لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس، ثم نهي عن التجارة في الخمر.

‘যখন সুরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ নাজিল হলো, তখন মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে সেগুলোকে মানুষের সামনে তেলাওয়াত করলেন। এরপর মদের ব্যবসা করতে নিষেধ করলেন।’[১৭৪]

ইমাম মুসলিম ইবনু আব্বাস রা.-এর এই উক্তি বর্ণনা করেন,

أن الذي حرم شربها حرم بيعها.

---

[১৭২] সুনানে তিরমিজি, অধ্যায় : বুয়ু, পরিচ্ছেদ : মদ বিক্রয়, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৮০, হাদিস নং ১৩৪১/১২৯৫।

[১৭৩] সুনানে ইবনু মাজাহ, অধ্যায় : পানীয়, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১১২২, হাদিস নং ৩৩৮১।

[১৭৪] বুখারি, অধ্যায় : মাসাজিদ, বুয়ু, তাফসির, মুসলিম, অধ্যায় : বুয়ু, পরিচ্ছেদ: মদ হারাম হওয়া, হাদিস নং ২০৮৪।

'যে সত্তা মদপানকে হারাম করেছেন, তিনি মদ বিক্রি করাকেও হারাম করেছেন।'[১৭৫]

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ. নিজ কিতাব 'মুসনাদে আহমাদে' আবদুর রহমান ইবনু ইয়ালা থেকে নিচের হাদিসটি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন—

سألتُ ابن عباس، قال: إنا بأرض لنا بها الكروم، وإن أكثر غلاتها الخمر فذكر ابن عباس أن رجلا أهدي إلى النبي صلي الله عليه وسلم راوية خمر، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم (إن الذي حرم شربها حرم بيعها.

'আমি একবার ইবনু আব্বাস রা.-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা এমন এলাকায় বসবাস করি, যেখানে অধিকাংশ বাগান হলো আঙুরের বাগান। আর আমাদের বেশিরভাগ উপার্জন হলো মদের মাধ্যমে। এ কথা শুনে ইবনু আব্বাস রা. বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে একটি মদের পাত্র তাকে হাদিয়া দিলো। তখন মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে সত্তা মদপান হারাম করেছেন, তিনি তার বিক্রিকেও হারাম করেছেন।'[১৭৬]

বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমে এ মাসআলাটি স্পষ্ট হলো যে, মদের ব্যবসা এবং অর্থের বিনিময়ে সেটিকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া বা পান করানো হারাম। ইবনু আব্বাস রা.-এর ফতোয়া অনুযায়ী যদি কোনো এলাকাতে মদ তৈরি করা এবং তার ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপক প্রচলনও থাকে, তবুও সে এলাকাতে কোনো মুসলিমের জীবিকা নির্বাহের জন্য মদের পেশা গ্রহণ করা জায়েজ নেই। আমার জানা মতে কোনো ফকিহ এ ধরনের কাজকে বৈধ বলেননি।

---

[১৭৫] মুসলিম ১৫৮০, ১৫৭৯।

[১৭৬] মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৪৪, হাদিস ২১৯০।

মাসআলা—১১.

অ্যালকোহল মেশানো ওষুধের হুকুম

প্রশ্ন : পশ্চিমা দেশের অধিকাংশ ওষুধে এক থেকে পঁচিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত অ্যালকোহল থাকে। এ ধরনের ওষুধ ঠান্ডা, কাশি, সর্দি ইত্যাদির মতো সাধারণ রোগে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আর সাধারণত ৯৫ পার্সেন্ট ওষুধে অ্যালকোহল মেশানো থাকে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে অ্যালকোহল নেই এমন ওষুধ খুজে বের করাও কঠিন ও দুষ্কর। এমন পরিস্থিতিতে এ ধরনের ওষুধ ব্যবহারের শরয়ি হুকুম কী?

উত্তর : অ্যালকোহল মেশানো ওষুধের মাসআলাটি এখন শুধু পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং ইসলামি দেশসহ বিশ্বের সব দেশে এ মাসআলা ছড়িয়ে পড়েছে। হানাফি মাজহাব অনুযায়ী এ ক্ষেত্রে হুকুমটি অনেক সহজ। কারণ, ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী শক্তি অর্জন ও চিকিৎসার জন্য খেজুর ও আঙুর ছাড়া অন্য জিনিসের তৈরি পানীয় বৈধ। তবে সেটি নেশা সৃষ্টি করতে পারবে না। (নেশা সৃষ্টি করলে হারাম হবে।)[১৭৭] আর বর্তমানের অধিকাংশ অ্যালকোহল খেজুর ও আঙুর থেকে প্রস্তুত করা হয় না। বরং সেগুলো প্রস্তুত করা হয় চামড়া, গন্ধক, মধু, দানা, যব, বার্লি, রাইয়ের ইত্যাদির মাধ্যমে।[১৭৮]

সুতরাং ওষুধে ব্যবহৃত অ্যালকোহল যদি খেজুর ও আঙুর ছাড়া অন্য কিছুর মাধ্যমে তৈরি করা হয়, তাহলে ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী এ ধরনের ওষুধ ব্যবহার করা জায়েজ আছে। তবে তার জন্য শর্ত হলো, সেটির মাধ্যমে নেশা সৃষ্টি হবে না। আর চিকিৎসার প্রয়োজনে ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ রহ.-এর অভিমত গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। আর ওষুধে মেশানো অ্যালকোহলগুলো যদি খেজুর ও আঙুরের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়, তাহলে এটি ব্যবহার করা যাবে না তবে কোনো ন্যায়পরায়ণ ডাক্তার যদি বলে, এই ওষুধের বিকল্প নেই, তাহলে শুধু সে ক্ষেত্রে সেটি ব্যবহার করা জায়েজ হবে। অন্যথায় জায়েজ হবে

---

[১৭৭] ফাতহুল কাদির, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১৬০।

[১৭৮] ইনসাইক্লোপিডিয়া অফ ব্রিটানিকা, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৪৪। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত।

না। কারণ, হানাফি মাজহাব অনুযায়ী এমন কঠিন অবস্থায় হারাম জিনিসের মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করা জায়েজ আছে।[১৭৯]

ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী কোনো অবস্থাতেই নিরেট হারাম জিনিসের মাধ্যমে চিকিৎসা করা জায়েজ নেই। তবে কোনো ওষুধের মধ্যে যদি মদকে এমনভাবে মেশানো হয় যে, মদের সত্তাগত অস্তিত্ব তখন নিঃশেষ হয়ে গেছে। আর সেটির মাধ্যমে এমন উপকার অর্জন করা হচ্ছে, যা অন্য কোনো পবিত্র জিনিসের মাধ্যমে সম্ভব নয়, তাহলে এমন ক্ষেত্রে চিকিৎসার জন্য এমন ওষুধ ব্যবহার করা জায়েজ আছে। আল্লামা রামলি রহ. নেহায়াতুল মুহতাজ কিতাবে বলেন—

«أما مستهلكة مع دواء آخر، فيجوز التداوي بها، كصرف بقية النجاسات إن عرف، أو أخبره طبيب عدل بنفعها بأن لا يغني عنها طاهر.»

‘এমন মদ যা অন্য ওষুধের মধ্যে মিশ্রিত হয়ে তার অস্তিত্ব নিঃশেষ হয়ে গেছে। তার মাধ্যমে চিকিৎসা করা জায়েজ আছে। যেমন : অন্যান্য নাপাক জিনিসের ক্ষেত্রে অনুরূপ হুকুম হয়ে থাকে। তবে তার জন্য শর্ত হলো, তার উপকারিতার ব্যাপারে জানতে হবে। অথবা কোনো বিজ্ঞ ডাক্তার সেটির উপকারিতা সম্পর্কে জানাতে হবে অথবা সেটি ছাড়া আর কোনো পবিত্র ওষুধ পাওয়া যাবে না।’[১৮০]

ওষুধ হিসেবে নিরেট অ্যালকোহল ব্যবহার করা হয় না। বরং সবসময় অন্য ওষুধের সঙ্গে মিশিয়ে সেটি ব্যবহার করা হয়। সুতরাং শেষ পর্যন্ত ফলাফল বের হলো যে, ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী প্রয়োজনের সময় অ্যালকোহল মেশানো ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা করা জায়েজ আছে।

মালিকি ও হাম্বালি মাজহাবের অভিমত অনুযায়ী একেবারে অনন্যোপায় হওয়া ছাড়া কোনো অবস্থাতেই হারাম জিনিসের মাধ্যমে চিকিৎসা করা জায়েজ নেই।

সারকথা, এ ধরনের ওষুধ ব্যবহার যেহেতু ব্যাপক আকার লাভ করেছে।

---

[১৭৯] আল-বাহরুর রায়েক, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১১৬।

[১৮০] নিহায়াতুল মোহতাজ, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১২।

এজন্য এ ক্ষেত্রে হানাফি অথবা শাফিয়ি মাজহাবের অভিমত গ্রহণ করা উচিত। মহান আল্লাহ্ সর্বাধিক অবগত।

এ ছাড়া এ মাসআলার অন্য একটি দিক রয়েছে। যেখানে মেডিসিন বিশেষজ্ঞদের কাছে জিজ্ঞেস করে তার সমাধান করা যেতে পারে। আর সেটি হলো, এই অ্যালকোহলগুলোকে ওষুধের সঙ্গে মেশানোর পর তার বাস্তবতা ও সত্তা অবশিষ্ট থাকে? না কি ক্যামিক্যাল পদ্ধতির কারণে তার বাস্তবতা ও সত্তা পরিবর্তন হয়ে যায়। ওষুধের সঙ্গে মেশানোর পর যদি তার আসল অবস্থা ও সত্তা অবশিষ্ট না থাকে, বরং অন্য জিনিসে পরিণত হয়ে যায়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে সেটির মাধ্যমে চিকিৎসা করা জায়েজ হবে। কারণ, মদ যদি সিরকায় পরিণত হয়ে যায়, তাহলে সব ইমামের অভিমত অনুযায়ী সেটি ব্যবহার করা জায়েজ আছে। মহান আল্লাহ্ সর্বাধিক অবগত।

মাসআলা—১২.

শূকর থেকে তৈরি প্রসাধনী ও জেলাটিন ব্যবহারের হুকুম

প্রশ্ন : পশ্চিমা দেশসমূহে এমন কিছু প্রসাধনী ও জেলাটিন পাওয়া যায়, যার মধ্যে খুবই স্বল্প মাত্রায় শূকরের উপকরণ থাকে। শরয়ি দৃষ্টিতে এ ধরনের প্রসাধনী ব্যবহার করা জায়েজ আছে কি না?

উত্তর : এ ধরনের প্রসাধনীতে ক্যামিক্যাল পদ্ধতির কারণে যদি শূকরের উপকরণ একেবারে পরিবর্তন হয়ে যায়, তার বাস্তবতা যদি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাহলে সেটি হারাম ও নাপাক হওয়ার হুকুমও রহিত হয়ে যাবে। আর যদি তার বাস্তবতা ও আসল সত্তা বিলুপ্ত না হয়, তাহলে সেটি হারাম ও নাপাক হিসেবে বাকি থাকবে। কেননা, হানাফি মাজহাব অনুযায়ী কোনো বস্তুর বাস্তবতা ও সত্তা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া সেটির পবিত্র হওয়া বা তার হারাম হওয়ার হুকুম রহিত হওয়ার কারণ। মহান আল্লাহ্ সর্বাধিক অবগত।

মাসআলা—১৩.

মসজিদে বিয়ের আয়োজন করা

প্রশ্ন : পশ্চিমা দেশসমূহে মুসলিমদের আনন্দ উৎসব করার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থাপনা না থাকার কারণে তাদের ছেলে মেয়েদের বিয়ে শাদি ও আনন্দ উৎসব মসজিদে হয়ে থাকে। অথচ তাদের সেসব আনন্দ উৎসবে প্রায়ই নৃত্য ও গান ও বাদ্যের বিশেষ আয়োজন করা হয়। মসজিদে এ ধরনের আনন্দ উৎসব করা জায়েজ আছে কি না?

উত্তর : মসজিদে বিয়ে করা মুস্তাহাব। এটি মুস্তাহাব হওয়ার বিষয়ে স্পষ্টভাষায় একাধিক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তবে তার সঙ্গে নৃত্য এবং গান-বাদ্যের যে বিষয়গুলো সংযুক্ত হয়েছে, কোনো অবস্থাতেই এগুলো বৈধ নয়। বিয়ের অনুষ্ঠানগুলো যদি এসব খারাপ কাজ থেকে মুক্ত না হয়, তাহলে মসজিদে এ ধরনের আয়োজন করা থেকে বিরত থাকতে হবে। মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

মাসআলা—১৪.

খ্রিস্টানদের নামে সন্তানের নাম রাখা

প্রশ্ন : কিছু খ্রিস্টান দেশ যেমন : দক্ষিণ আমেরিকা; এসব দেশে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জনসাধারণের ওপর আবশ্যকিয় করা হয়েছে যে, তারা যেন তাদের সন্তানদেরকে খ্রিস্টান নাম ছাড়া অন্য কোনো নাম না দেয়। এ উদ্দেশ্যে তারা বাচ্চাদের নামের তালিকা তৈরি করেছে এবং নির্দেশ জারি করেছে যে, সবাই তাদের ছেলে মেয়েদের জন্য সেখান থেকে নাম নির্বাচন করবে। সেখানের নির্ধারিত নাম ছাড়া অন্য কোনো নামে কেউ তার বাচ্চাকে রেজিস্টারভুক্ত করতে পারবে না। মুসলিমদের জন্য কি এ ধরনের নাম রাখা জায়েজ আছে? যদি জায়েজ না হয়, তাহলে এ সমস্যার সমাধান কি?

উত্তর : রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যদি খ্রিস্টানদের নাম রাখা আবশ্যক ও জরুরি করে দেওয়া হয়, তাহলে এমন পরিস্থিতিতে বাচ্চাদের জন্য এমন নাম রাখবে,

যেগুলো মুসলিম ও খ্রিস্টান উভয়ের মধ্যে রয়েছে। যেমন : ইসহাক, দাউদ, সুলাইমান, মারইয়াম, লুবনা, রাহেল, সফুরা ইত্যাদি। আবার এমনটি করা যেতে পারে যে, রাষ্ট্রের পক্ষ নির্ধারিত নামের তালিকা থেকে একটি নামে বাচ্চাকে রেজিস্টারভুক্ত করা হবে। আর বাড়িতে তাকে কোনো ইসলামি নামে ডাকা হবে। মহান আল্লাহ্ সর্বাধিক অবগত।

মাসআলা—১৫.

স্ত্রীকে সাময়িক সময় রাখার গোপন নিয়তে বিয়ে করা

প্রশ্ন : যেসব ছাত্র-ছাত্রী পশ্চিমা দেশগুলোতে শিক্ষার জন্য আসে। এখানে এসে তারা বিয়ে করে নেয় এবং বিয়ের সময় নিয়ত করে যে, কিছুদিন বৈবাহিক সম্পর্ক ঠিক রাখার পর যখন শিক্ষা শেষ হবে, তখন নিজ দেশে চলে যাবে। আর এই বৈবাহিক সম্পর্ক শেষ করে দেবে। এসব দেশে ভবিষ্যতে থাকার নিয়ত থাকে না। অবশ্য অন্যান্য সাধারণ বিয়ের মতো বিয়ে হয় এবং সেসব শব্দের মাধ্যমে এ ধরনের বিয়ে করা হয় যেসব শব্দ স্থায়ী বিবাহের মধ্যে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ ধরনের বিয়ের শরয়ি হুকুম কী?

উত্তর : যদি বিয়ে সংঘটিত হওয়ার সব শর্তাবলি পাওয়া যায়। আর বিয়ে করার সময় এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করা না হয়, যেটি সাময়িক বিয়ে বোঝায়। এমন ক্ষেত্রে বিয়ে সংঘটিত হয়ে যাবে এবং বিয়ে পরবর্তী সময়ে দাম্পত্য জীবন পরিচালনা করা জায়েজ আছে। বিয়ের ক্ষেত্রে ছেলে বা মেয়ের অন্তরে এমন নিয়ত রাখা যে, শিক্ষা শেষ হলে বৈবাহিক সম্পর্ক শেষ করে দেবো, এ ধরনের নিয়ত বিয়ে সহিহ্ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলবে না। অবশ্য শরিয়তের দৃষ্টিতে বিয়ে যেহেতু একটি স্থায়ী সম্পর্ক। তাই স্বামী-স্ত্রীর কাছে আবেদন হলো তারা যেন এই সম্পর্ককে স্থায়ী রাখে এবং একান্ত অনন্যোপায় হওয়া ছাড়া সেটিকে যেন শেষ না করে দেয়। বিয়ে করার সময় স্বামী-স্ত্রীর অন্তরে বিচ্ছেদের নিয়ত রাখা বিয়ের উদ্দেশ্যের পরিপন্থি। এ জন্য ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের নিয়ত রাখা মাকরুহ হবে। মহান আল্লাহ্ সর্বাধিক অবগত।

এই প্রশ্নের উত্তরের ব্যাপারে অনেকের থেকে আবেদন আসে যে, এটির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ভুল বোঝার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং সেটি স্পষ্ট করা আবশ্যক।

মূল বিষয় হলো, ফকিহদের বিস্তারিত আলোচনা অনুযায়ী এখানে ভিন্নভাবে তিনটি বিষয় হতে পারে। যেগুলোকে স্পষ্টভাবে আলাদা আলাদা বোঝা জরুরি—

১. মুতআহ—এ ধরনের বিয়ে পদ্ধতি হলো, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত একজন পুরুষ ও একজন মহিলা একত্রে থাকার চুক্তি করে। সাধারণত এ ক্ষেত্রে বিয়ের জন্য নির্ধারিত শব্দ ব্যবহার করা হয় না এবং চুক্তির সময় দুজন সাক্ষী থাকাও শর্ত নয়। এ পদ্ধতির বিয়ে সম্পূর্ণ হারাম এবং হারামের দিক থেকে সেটি জিনার হুকুমে। মহান আল্লাহ সব মুসলিমদেরকে এ হারাম পদ্ধতি থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

২. মুআক্কাত—এ পদ্ধতিতে নিয়ম অনুযায়ী পুরুষ মহিলা দুজনই দুইজন সাক্ষীর সামনে ইজাব-কবুলের মাধ্যমে বিয়ে করে। তবে সেইসঙ্গে তারা এ বিষয়টিও স্পষ্টভাবে বলে দেয় যে, আমাদের এ বিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। ওই সময়ের পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে এ বিয়ে শেষ হয়ে যাবে। শরয়ি হুকুম অনুযায়ী এ পদ্ধতিও একেবারে হারাম। এভাবে বিয়ে করলে বিয়ে সংঘটিত হয় না এবং বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে বৈধ বিষয়গুলোও সেখানে বৈধ হয় না।

৩. ('মুআক্কাত বা সময়নির্দিষ্ট' নয় তবে...)—পুরুষ মহিলা নিয়ম অনুযায়ী দুইজন সাক্ষীর সামনে ইজাব কবুলের মাধ্যমে বিয়ে করে। আর সেখানে এমন কোনো কথা উল্লেখ করে না যে, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এই বিয়ে করা হচ্ছে। তবে উভয় পক্ষ অথবা স্বামী স্ত্রীর কোনো একজনের অন্তরে এই নিয়ত থাকে যে, নির্দিষ্ট সময় পর তালাকের মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবো। ফকিহদের বক্তব্য অনুযায়ী এ ধরনের বিয়ে সহিহ হয়ে যাবে। এবং পুরুষ মহিলা নিয়ম অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রী হয়ে যাবে। তাদের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্কও স্থায়ী হয়ে যাবে। তাদের জন্য এমনটি আবশ্যক নয় যে, তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পর বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদ করতে হবে। বরং তাদের

জন্য আবশ্যক হলো, কোনো শরয়ি কারণ ছাড়া তালাকের দিকে যাবে না। শরিয়তের পক্ষ থেকে বিয়েকে যেহেতু স্থায়ী সম্পর্কের জন্য রাখা হয়েছে এ কারণে তাদের অন্তরে সাময়িক সময়ের নিয়ত রাখা এবং তারপর তালাক দেওয়ার ইচ্ছে রাখা মাকরুহ। সুতরাং এমন ইচ্ছে রেখে বিয়ে করাও মাকরুহ। উল্লিখিত পদ্ধতিতে বিয়ে সহিহ্ হওয়ার বিষয়ে হানাফি মাজহাবের ফকিহদের কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত করা হলো—

ফাতাওয়া আলমগিরিতে আছে—[১৮১]

ولوتزوجها مطلقا، وفي نيته أن يعقد معها مدة نواها، فالنكاح صحيح.

আদ্দুররুল মুখতার—[১৮২]

وليس منه (أي من المتعة والنكاح الموقت) مالو نكحها على أن يطلقها بعد شهر أو نوي مكثا معها مدة معينة.

ফাতহুল কাদির-এ আছে—[১৮৩]

أما لو تزوج وفي نيته أن يطلقها بعد مدة نواها صح.

মহান আল্লাহ ভালো জানেন।

মাসআলা—১৬.

সাজসজ্জা করে মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে যাওয়া

প্রশ্ন : মুসলিম নারীর জন্য কাজল দিয়ে ও ভ্রু-প্লাগ করে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার হুকুম কি?

উত্তর : উপরের একটি প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলেছি যে, সাধারণভাবে একজন মুসলিম নারীর জন্য জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাইরে যাওয়া জায়েজ নেই। অবশ্য যেসব প্রয়োজনে ইসলামি শরিয়ত মুসলিম নারীদেরকে

[১৮১] খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৮৩।
[১৮২] খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩১৯।
[১৮৩] খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৫২।

বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে, তবে সেসব ক্ষেত্রেও মুসলিম নারীদেরকে সাজসজ্জা ছাড়া পূর্ণাঙ্গ পর্দার সঙ্গে যাওয়া আবশ্যক করেছে।

মাসআলা—১৭.

পরপুরুষের সঙ্গে মুসলিম নারীদের মুসাফাহা করা

প্রশ্ন : অনেক সময় পশ্চিমা দেশের মুসলিম নারীদেরকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কর্মক্ষেত্রে আগন্তুক পরপুরুষের সঙ্গে হ্যান্ডসেক করতে হয়। অনুরূপভাবে অনেক সময় মুসলিম পুরুষদেরকে অন্য নারীদের সঙ্গে হ্যান্ডসেক করতে হয়। হ্যান্ডসেক না করতে চাইলে তাদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শরয়ি দৃষ্টিতে এমন মুহূর্তে তাদের জন্য হ্যান্ডসেক করা জায়েজ আছে কি না?

উত্তর : নারীদের জন্য পরপুরুষ আর পুরুষদের জন্য পরনারীর সঙ্গে হ্যান্ডসেক করা কোনো অবস্থাতেই জায়েজ নেই। এ ব্যাপারে একাধিক হাদিসে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এবং সব আলেম এ সিদ্ধান্তের ওপর একমত।

মাসআলা—১৮.

নামাজের জন্য গীর্জা ভাড়া নেওয়া

প্রশ্ন : পশ্চিমা দেশের মুসলিমগণ অনেক সময় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, জুমা ও ইদের নামাজ আদায়ের জন্য খ্রিস্টানদের গীর্জা ভাড়া নিয়ে থাকে। অথচ সেখানে মূর্তি এবং অন্যান্য উপাসনার জিনিস বিদ্যমান থাকে। ভাড়া নেওয়ার কারণ হলো, অন্যান্য বাড়ি অপেক্ষা এ গীর্জাগুলোকে কম ভাড়ায় পাওয়া যায়। আবার অনেক সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা অনুদানদাতা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাদের গীর্জাকে মুসলিমদের জন্য ফ্রি করে দেওয়া হয়। এ ধরনের গীর্জা ভাড়া নিয়ে সেখানে নামাজ আদায় করা জায়েজ আছে কি না?

উত্তর : নামাজ আদায়ের জন্য গীর্জা ভাড়া নেওয়া জায়েজ আছে। কেননা, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

جعلت لي الأرض كلها مسجدا.

'সমস্ত পৃথিবীকে আমার জন্য মসজিদে পরিণত করা হয়েছে।'

তবে নামাজ আদায়ের সময় সেখান থেকে মূর্তি ও ছবি সরিয়ে ফেলতে হবে। কেননা, যে ঘরে ছবি বা মূর্তি থাকে, সে ঘরে নামাজ আদায় করা মাকরুহ। মূর্তির কারণে উমর রা. গীর্জায় প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। ইমাম বুখারি রহ. নামাজ অধ্যায়ে গীর্জায় নামাজ পড়া পরিচ্ছেদে উমর রা.-এর এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি বলেন—

أن ابن عباس كان يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل.

'ইবনু আব্বাস রা. গীর্জায় নামাজ পড়তেন। অবশ্য যে গীর্জায় মূর্তি থাকতো সেখানে নামাজ পড়তেন না।'

ইমাম বাগাবি রহ. এ বর্ণনাটিকে সূত্রের সঙ্গে বর্ণনা করার পর বলেছেন—

فإن كان فيها تماثيل خرج، فصلي في المطر.

'গীর্জার মধ্যে যদি মূর্তি থাকতো, তাহলে বেরিয়ে এসে বৃষ্টির মধ্যে নামাজ আদায় করতেন।'[১৮৪]

মাসআলা—১৯.

আহলে কিতাব (ইহুদি খ্রিস্টানদের) জবাইকৃত পশু খাওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : আহলে কিতাবদের জবাইকৃত পশু এবং তাদের হোটেলে যেসব খাবার পরিবেশন করা হয় সেগুলোর শরয়ি হুকুম কী? কেননা, নিশ্চিতভাবে এটি জানার কোনো সুযোগ নেই যে, জবাইয়ের সময় তারা বিসমিল্লাহ পড়েছে কি না?

উত্তর : আমি যে বিষয়ে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখি তা হলো, জবাইকারী শুধু আহলে কিতাব হওয়া তার জবাইকৃত পশু হালাল হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত জবাইয়ের সময় সে আল্লাহর নাম না নেবে এবং শরয়ি

[১৮৪] ফাতহুল বারি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৩২। হাদিস নং ৪৩৫।

পদ্ধতিতে পশুর রগগুলো না কাটবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেটি হালাল হবে না। যেমনিভাবে জবাইয়ের সব শরয়ি শর্ত পূর্ণ করা ছাড়া জবাইকারী শুধু মুসলিম হওয়া জবাইকৃত পশু হালাল হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। ইসলামে আহলে কিতাবের জবাইকৃত পশু হালাল আর অন্যান্য মুশরিকদের জবাইকৃত পশু হারাম হওয়ার কারণ হলো, আহলে কিতাবের লোকেরা জবাই করার সময় সেসব শর্তের প্রতি লক্ষ রাখতো, ইসলাম যেগুলোকে শরয়ি জবাইয়ের জন্য নির্ধারণ করেছে।

সুতরাং এই মূলনীতি অনুযায়ী জবাইয়ের শর্তগুলো পূর্ণকরা ছাড়া আহলে কিতাবের জবাইকৃত পশু হালাল হবে না। আর বর্তমানে অধিকাংশ খ্রিস্টান তাদের ধর্মে জবাইয়ের আবশ্যকীয় শর্তাবলির প্রতি লক্ষ রাখে না। ফলে এ কথা নিশ্চিত হওয়ার আগে তাদের জবাইকৃত পশু হালাল হবে না যে, তারা জবাইয়ের সব শর্ত পূর্ণ করেছে কি না। এ অভিমতটি সেসব লোকদের অভিমতের বিপরীত, যারা মনে করে যে, ইহুদি-খ্রিস্টানরা আল্লাহর নাম না নিলেও তাদের জবাইকৃত পশু হালাল। এ ব্যাপারে আমার কাছে কুরআন-হাদিস ও ফকিহদের বক্তব্য ও আহলে কিতাবের বিভিন্ন কিতাবের উদ্ধৃতির আলোকে স্পষ্ট মজবুত দলিল রয়েছে। তবে এ মাসআলাটি বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে, সেটি এখানে সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ ভালো জানেন।

মাসআলা—২০.

নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড হয় এমন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা

প্রশ্ন : পশ্চিমা দেশগুলোতে এমন অনেক সাধারণ অনুষ্ঠান ও জমায়েতের আয়োজন করা হয়, যেখানে মুসলিমদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এসব অনুষ্ঠানে পুরুষ-মহিলা একত্রে সমবেত হয় এবং সেখানে মদও পরিবেশন করা হয়। মুসলিমরা যদি এ ধরনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করে, তাহলে তাদেরকে সমাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে একাকি থাকতে হয়। অন্যদিকে অনেক সুবিধা থেকেও তাদের বঞ্চিত হতে হয়। এমন পরিস্থিতিতে মুসলিমদের জন্য মদ, শূকর ভক্ষণ না করে ও নাচ-গানে শরিক না হয়ে এ ধরনের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করা জায়েজ আছে কি না?

উত্তর : যেসব অনুষ্ঠানে মদ, শূকর খাওয়া হয় এবং নারী পুরুষের নৃত্য ও গানবাদ্যের আয়োজনা করা হয়, মুসলিমদের জন্য কোনো অবস্থায়ই সেসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা জায়েজ নেই। সুনাম, সুখ্যাতি অর্জন ছাড়া এ ধরনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের আর কোনোই প্রয়োজন নেই। মুসলিমদের জন্য সেসব কাজের দিকে ঝোঁকা বৈধ নয়, যেখানে গুনাহ ও ধর্মীয় দৃষ্টিতে হারাম কাজের আয়োজন করা হয়। এ ক্ষেত্রে তাদের ওপর ওয়াজিব হলো ইসলাম ধর্মের ওপর অটল থাকা। সব মুসলিম যদি এ ধরনের অনুষ্ঠান বর্জন করার ব্যাপারে একমত হয়ে যায় আর পশ্চিমা দেশে বসবাসরত মুসলিমের সংখ্যাও কম নয়, তাহলে পশ্চিমাপন্থিরা মুসলিমদের আমন্ত্রণ জানানোর ক্ষেত্রে এ ধরনের হারা ম কাজ পরিহার করতে বাধ্য হবে। মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

মাসআলা—২১.

অমুসলিম রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে মুসলিমদের চাকরি করা

প্রশ্ন : কোনো মুসলিমের জন্য কি আমেরিকা ও অন্যান্য অমুসলিম রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা জায়েজ আছে? যেখানে পারমাণবিক ও সশস্ত্র বাহিনীর গবেষণা বিভাগও রয়েছে।

উত্তর : আমেরিকা বা অন্যান্য অমুসলিম রাষ্ট্রের যে-কোনো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা জায়েজ আছে। অনুরূপভাবে পারমাণবিক ও সশস্ত্র বিভাগেও চাকরি করা জায়েজ আছে। তবে যদি তার ওপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, যার মাধ্যমে কোনো এলাকা বা দেশের মুসলিম ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাহলে সেটি পরিহার করতে হবে। এ ধরনের ক্ষেত্রে সে অমুসলিমদেরকে কোনো ধরনের সাহায্য করবে না। যদিও এ ধরনের কাজ পরিহার করলে তাকে চাকরিচ্যুত হতে হয়। মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

মাসআলা—২২.

মুসলিম ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক খ্রিস্টানদের উপাসনালয়ের ডিজাইন করা

প্রশ্ন : কোনো মুসলিম যদি এমন কোনো কোম্পানিতে চাকরি করে, যেখানে তাকে বিভিন্ন ধরনের বিল্ডিংয়ের ডিজাইন তৈরি করতে হয়। যার মধ্যে খ্রিস্টানদের চার্চ ও উপাসনালয়ের ডিজাইন করার দায়িত্বও রয়েছে। চার্চ অর্থাৎ খ্রিস্টানদের উপাসনালয়ের ডিজাইন করতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে তার চাকরি চলে যাওয়ারও আশঙ্কা রয়েছে। এমন ক্ষেত্রে মুসলিম ইঞ্জিনিয়ারের জন্য চার্চ অর্থাৎ খ্রিস্টানদের উপাসানালয়ের ডিজাইন করা জায়েজ আছে কি না?

উত্তর : মুসলিম ইঞ্জিনিয়ারের জন্য অমুসলিমদের উপাসনালয়ের ডিজাইন করা জায়েজ নেই। মহান আল্লাহ্ বলেন—

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

'ভালো কাজ ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো। গুনাহ্ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না।'[১৮৫]

মাসআলা—২৩.

চার্চের জন্য চাঁদা দেওয়া

প্রশ্ন : কোনো মুসলিম ব্যক্তি বা মুসলিম বোর্ডের পক্ষ থেকে খ্রিস্টানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা মিশনারী চার্চের জন্য চাঁদা দেওয়া জায়েজ আছে কি না?

উত্তর : কোনো মুসলিম ব্যক্তি বা মুসলিম প্রতিষ্ঠান যাই হোক তাদের জন্য কোনো খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠান বা চার্চে চাঁদা দেওয়া বা সহযোগিতা করা কখনোই জায়েজ নেই।

---

[১৮৫] সূরা মায়িদা, আয়াত: ২।

মাসআলা—২৪.

স্বামী অথবা পিতার মদ বিক্রির মাধ্যমে উপার্জনের ক্ষেত্রে স্ত্রী ও বাচ্চাদের হুকুম

প্রশ্ন : এমন অনেক মুসলিম পরিবার রয়েছে, যাদের পুরুষরা মদ বা শূকর ইত্যাদির মতো হারাম জিনিসের ব্যবসা করে। তাদের স্ত্রী ও বাচ্চারা যদিও এ ধরনের উপার্জনকে পছন্দ করে না কিন্তু তাদের প্রতিপালনের ব্যয় সেখান থেকেই বহন করা হয়। এমন ক্ষেত্রে তাদের স্ত্রী ও বাচ্চারা কি গুনাহগার হবে?

উত্তর : এমন ক্ষেত্রে স্ত্রী ও বাচ্চাদের ওপর ওয়াজিব হলো, তারা তাদের স্বামী বা বাবাকে এ ধরনের হারাম ব্যবসা থেকে বিরত রাখতে সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করবে। কিন্তু তাদের সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করার পরও যদি সে তার হারাম ব্যবসা থেকে বিরত না হয়, আর স্ত্রীর জন্য অন্য কোনো বৈধ উপার্জন থেকে জীবিকা নির্বাহ সম্ভব হয়, তাহলে এমন ক্ষেত্রে স্ত্রীর জন্য তার স্বামীর ওই হারাম উপার্জন থেকে নেওয়া জায়েজ নেই। তবে স্ত্রীর জীবিকা নির্বাহের জন্য যদি অন্য কোনো ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে তার স্বামীর সম্পদ নেওয়া জায়েজ আছে। তবে হারাম সম্পদ ভক্ষণের গুনাহ তার স্বামীর ওপর বর্তাবে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং ছোটো বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও এই হুকুম হবে। হারাম ভক্ষণের গুনাহ তাদের পিতার ওপর বর্তাবে। অবশ্য বড়ো ও প্রাপ্ত বয়স্কদেরকে এ ক্ষেত্রে নিজে বৈধ উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। পিতার সম্পদ নেওয়া জায়েজ হবে না।

এমন পরিস্থিতিতে স্ত্রীর জন্য স্বামীর হারাম সম্পদ থেকে নেওয়া জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে ফকিহগণ স্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন। আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ. বলেন—

اشتري الزوج طعاما أو كسوة من مال خبيث جاز للمرأة اكله و لبسها، والاثم على الزوج.

'স্বামী যদি হারাম সম্পদ দিয়ে খাবার বা পোশাক ক্রয় করে, তাহলে স্ত্রীর জন্য সেটি খাওয়া ও পরিধান করা জায়েজ আছে। তবে এ ক্ষেত্রে গুনাহ হবে স্বামীর।'[১৮৬]

মাসআলা—২৫.

ব্যাংকের মাধ্যমে জমি ইত্যাদি ক্রয় করা

প্রশ্ন : ব্যাংক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বসবাসের বাড়ি, গাড়ি এবং বাড়ির অন্যান্য আসবাবপত্র ক্রয় করার শরয়ি হুকুম কী? অথচ ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এগুলোকে বন্ধক রাখার পর ঋণ দেয়। আর এ ধরনের ঋণের ওপর নির্দিষ্ট হারে সুদ নিয়ে থাকে। প্রকাশ থাকে যে, উল্লিখিত পদ্ধতির পরিবর্তে তার বিকল্প হিসেবে এটা করা যায় যে, মাসিক ভাড়ার মাধ্যমে সেগুলো পাওয়া যাবে। তবে সাধারণত প্রথম পদ্ধতিতে সেগুলো ক্রয়ে যে পরিমাণ কিস্তি পরিশোধ করতে হয় তার চেয়ে মাসিক ভাড়ার পরিমাণ বেশি হয়ে থাকে।

উত্তর : বর্ণিত লেনদেনটি সুদনির্ভর হওয়ার কারণে সেটি নাজায়েজ ও হারাম। অবশ্য মুসলিমদের জন্য জরুরি হলো, এই সুদি পদ্ধতির পরিবর্তে ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী কোনো জায়েজ পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা করা। যেমন : ব্যাংক নিজে কিস্তিতে সেগুলো বিক্রি করবে আর এজন্য কিস্তির কারণে বাড়ি ইত্যাদির ন্যায্যমূল্য থেকে বৃদ্ধি করবে। সুতরাং প্রথমে বিক্রেতা থেকে স্বয়ং ব্যাংক সেটি ক্রয় করবে। তারপর ন্যায্য লভ্যাংশ যোগ করে সেটিকে গ্রাহকের কাছে কিস্তিতে বিক্রি করবে। এভাবে কিস্তির মাধ্যমে তার মূল্য উসুল করবে। মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

ইসলামি ব্যাংকিং বিষয়ে কিছু মাসআলা ও তার সমাধান

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

'ইসলামি ব্যাংকিং বিষয়ে কিছু মাসআলা ও তার সমাধান' এটি জেদ্দার ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকের পক্ষ থেকে 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি'-এর কাছে পেশকৃত কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর। ১৪০৬ হিজরির রবিউস সানি মাসের ১০-১৬ তারিখ মোতাবেক ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২২-২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি'-এর দ্বিতীয় অধিবেশনে এটি উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তী সময়ে 'বুহুস ফি কজায়া ফিকহিয়্যা মুআসারা'-এর প্রথম খণ্ডে এটি প্রকাশ করা হয়।

—আবদুল্লাহ মায়মান

মাকতাবাতুল ইসলাম মাকতাবাতুল ইসলাম

ইসলামি ব্যাংকিং বিষয়ে কিছু মাসআলা ও তার সমাধান

মাসআলা—১.

ব্যাংকের পক্ষ থেকে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে যে খরচ হয় সে খরচ বাবদ সার্ভিসচার্জ নামে ঋণগ্রহিতা থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ উসুল করা

প্রশ্ন : ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকগুলো তাদের সদস্য দেশগুলোর মৌলিক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সুদহীন ঋণ দিয়ে থাকে। আর এ ধরনের ঋণ দিতে তাদের যে দাপ্তরিক ব্যয় হয়, তার জন্য সার্ভিস চার্জের নামে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ উসুল করে থাকে।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা হলো, ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকগুলো তাদের সদস্য দেশগুলোর মৌলিক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সুদহীন ঋণ দিয়ে থাকে। এগুলো দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ হয়ে থাকে। যেগুলোর সময়সীমা পনেরো থেকে ত্রিশ বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে। এ ধরনের ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা ইসলামি শরিয়তের বিধিবিধানের প্রতি লক্ষ রাখে। ফলে এমন ঋণের ওপর ব্যাংক কোনো সুদ নেয় না। অবশ্য এ ধরনের ঋণ দিতে ব্যাংকের যে দাপ্তরিক ব্যয় হয়, ব্যাংক তাদের কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী সার্ভিস চার্জের নামে সে ব্যয় উসুল করে থাকে।

ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকগুলো এখন চাইছে যে, তাদের সদস্য দেশগুলোর মৌলিক প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে তারা যে অর্থায়ন করে, সেগুলোর বাস্তবায়ন ও দেখাশোনা করার জন্য ব্যাংকের যে দাপ্তরিক ব্যয় হয়, সেগুলোকে সামনে রেখে তার সার্ভিস চার্জের পরিমাণ নির্ধারণ করবে। কারণ, ব্যাংক যেসব প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন করে, সেগুলোর প্রকৃত ব্যয়কে ভিন্ন ভিন্নভাবে হিসাব করা এবং তার প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণ করা কঠিন। এ সমস্যা দূর করার জন্য ব্যাংকের পক্ষ থেকে এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যে, এ ধরনের সব ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে তার যে দাপ্তরিক ব্যয় হয়, সেটি হিসেব করে সব ঋণের ওপর সেটিকে বণ্টন করা হবে। এভাবে প্রত্যেক প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের ওপর সেটি বণ্টন করে দেখা গেছে যে, তার পরিমাণ হয় শতকরা আড়াই থেকে তিন পার্সেন্ট। সুতরাং প্রত্যেক ঋণের ওপর ভিন্নভাবে যে ব্যয় আসে, সেটি হিসেব করার পরিবর্তে মোট ঋণের অর্থের আনুমানিক ব্যয় অনুযায়ী সার্ভিস চার্জের নামে একটি নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ উসুল করতে চাচ্ছে। ব্যাংকের জন্য সার্ভিস চার্জের নামে এভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ উসুল করা কি জায়েজ আছে?

উত্তর : ঋণ দিতে এবং তার হিসেব রাখার জন্য যে বাস্তবিক ব্যয় হয় ব্যাংকের জন্য ঋণগ্রহীতাদের থেকে সার্ভিস চার্জের নামে সে অর্থ উসুল করা জায়েজ আছে। তবে তার জন্য শর্ত হলো, এই উসুলকৃত অর্থের পরিমাণ ওই প্রকল্পের ঋণ বাস্তবায়নের খরচের জন্য বাস্তবিক ব্যয়ের সীমা অতিক্রম করতে পারবে না। অবশ্য পূর্ণ সতর্কতার সঙ্গে যদি এই পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়, তাহলে সেটি শরয়ি বিধানের বেশি অনুকূলে হবে এবং সেটি জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন থাকবে না।

আর প্রত্যেক প্রকল্পের ব্যয়কে যদি ভিন্নভাবে নির্ধারণ না করা যায়, তাহলে এমন ক্ষেত্রে ব্যাংকের পক্ষ থেকে বাস্তবিক ব্যয় উসুলের পরিবর্তে ঋণ ইস্যু করার আগে ও পরের আনুমানিক দাপ্তরিক ব্যয় উসুল করা জায়েজ আছে। তবে তার জন্য শর্ত হলো, এ ব্যয়ের পরিমাণটি এ ধরনের কাজের ওপর ন্যায্য ব্যয়ের সীমা অতিক্রম করবে না। কারণ, ঋণ দেওয়া এমন একটি কাজ, যার ওপর কোনো ধরনের উপকার বা লাভ করা জায়েজ নেই। সুতরাং ঋণ ইস্যু করার ব্যয়কে অনুমান করে যে-কোনো একটি অর্থ উসুল করা

জায়েজ নেই। তবে শরয়ি দৃষ্টিতে ঋণ ইস্যু করতে বাস্তবিত দাপ্তরিক ব্যয়টি বিনিময়হীন হওয়া জরুরি নয়।

অবশ্য ব্যাংকের জন্য এমনটি করার সুযোগ আছে যে, ঋণগ্রহীতাদের থেকে ঋণের পরিমাণের ওপর শতকরা হারে বাস্তবিক ব্যয় উসুল করবে। তবে সেখানে দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে—

১. এই ব্যয়ের পরিমাণটি অনুরূপ অন্যান্য কাজের ন্যায্য ব্যয়ের সীমা অতিক্রম করবে না।

২. এই ব্যয় উসুলটি ঋণের ওপর লাভ করার জন্য কোনো ধরনের হিলা-বাহানা হতে পারবে না।

এ মাসআলার দৃষ্টান্ত হলো ফকিহদের বর্ণিত সে মাসআলা যেখানে কাজি বা মুফতির জন্য ফতোয়া বা সিদ্ধান্ত দিয়ে বাদি থেকে কোনো ধরনের পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েজ নেই। তবে মুফতির জন্য ফতোয়া লেখা এবং কাজির জন্য দলিল তৈরি ও রেজিস্টার করার কারণে পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েজ আছে। তবে তার জন্য শর্ত হলো যে, এই পারিশ্রমিকের পরিমাণটি অনুরূপ কাজের পারিশ্রমিকের পরিমাণ অতিক্রম করবে না। আর সেটিকে শুধু ফতোয়া বা সিদ্ধান্ত দেওয়ার বিনিময় নেওয়ার হিলা-বাহানা করা যাবে না।

অবশ্য ঋণের ওপর সার্ভিস চার্জ হিসেবে শতকরা হারে অর্থ উসুল করার ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন আসে যে, ঋণের পরিমাণ কমবেশি হওয়ার কারণ দাপ্তরিক কাজে বা সে সম্পর্কিত কাজে কোনো ধরনের বাড়তি কোনো খরচ হয় না। এ কারণে উত্তম হলো, সব ঋণগ্রহীতা থেকে সার্ভিস চার্জের পরিমাণ সমান হারে নেওয়া। ঋণের পরিমাণে কমবেশি হওয়ার কারণে সার্ভিস চার্জে কোনো পার্থক্য না হওয়া উচিত।

এ প্রশ্নের উত্তর হলো, সব সময় শ্রমিকের কষ্ট অনুযায়ী পারিশ্রমিক নির্ধারিত হওয়া জরুরি নয়। বরং অনেক সময় কাজের প্রকৃতি এবং তার অন্তরগত অবস্থাকে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। আবার অনেক সময় যার জন্য কাজ করা হচ্ছে, তার উপকারিতার প্রতি লক্ষ করা হয়। এ কারণে কখনো কখনো সাধারণ কাজের ওপর বেশি পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। আবার কখনো কখনো বেশি কষ্টের কাজে কম পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। 'আদ্দুররুল মুখতার' কিতাবে আল্লামা হাসকাফি রহ. বলেন—

(يستحق القاضي الأجر على كتب الوثائق) والمحاضر والسجلات (قدر ما يجوز لغيره كالمفتي) فإنه يستحق أجر المثل على كتابة الفتوي ؛ لأن الواجب عليه الجواب باللسان دون الكتابة بالبنان ، ومع هذا الكف أولي احترازا عن القيل والقال وصيانة لماء الوجه عن الابتذال.

'কাজির জন্য দলিল লেখা ও রেজিস্টার করার পারিশ্রমিক হিসেবে সে পরিমাণ বিনিময় নেওয়া জায়েজ আছে। যে পরিমাণ অনুরূপ অন্যান্য কাজের পারিশ্রমিক হয়ে থাকে। যেমন : মুফতির জন্য ফতোয়া লেখার বিনিময় ন্যায্য পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েজ আছে। কারণ, তার দায়িত্ব হলো মুখে উত্তর দেওয়া। লিখে দেওয়া তার দায়িত্ব নয়। কিন্তু তারপরও সাধারণ মানুষের সমালোচনা এবং নিজের মর্যাদাহানি থেকে বেঁচে থাকার জন্য পারিশ্রমিক না নেওয়া উত্তম।'

এ বক্তব্যের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ. বলেন—

قال في جامع الفصولين: للقاضي أن يأخذ ما يجوز لغيره، وما قيل في كل ألف خمسة دراهم لا نقول به ولا يليق ذلك بالفقه، وأي مشقة للكاتب في كثرة الثمن؟ وإنما أجر مثله بقدر مشقته أو بقدر عمله في صنعته أيضا كحكاك وثقاب يستأجر بأجر كثير في مشقة قليلة اه.

قال بعض الفضلاء: أفهم ذلك جواز أخذ الاجرة الزائدة وإن كان العمل مشقته قليلة ونظرهم لمنفعة المكتوب له اه.

قلت: ولا يخرج ذلك عن أجرة مثله، فإن من تفرغ لهذا العمل كثقاب اللآلئ مثلا لا يأخذ الاجر على قدر مشقته فإنه لا يقوم بمؤنته، ولو ألزمناه ذلك لزم ضياع هذه الصنعة فكان ذلك أجر مثله.

'জামেউল ফুসুলাইন কিতাবে আছে, কাজির জন্য (দলিল ও রেজিস্টারের বিনিময়ে) সে পরিমাণ পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েজ আছে, যা অন্যান্য লেখকরা এ ধরনের দলিল লিখতে নিয়ে থাকে। আর হাজার প্রতি পাঁচ টাকা নেওয়ার ব্যাপারে যে কথা বলা হয়েছে, আমরা সেটিকে জায়েজ মনে করি না। আর ফিকহি দৃষ্টিতে এমন পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা উচিত নয়। কারণ, বড়ো ধরনের অর্থ হলে লেখকের লেখায় সেটি

কীভাবে বেশি কষ্টের কারণ হয়? আর কোনো কাজের পারিশ্রমিক হয়তো কাজের কষ্টের দিক থেকে নির্ধারিত হয়। অথবা কাজের ধরনের দিক থেকে নির্ধারিত হয়। যেমন : স্বর্ণকার ও মুক্তার কারিগরকে সামান্য কষ্টের বিনিময়ে বেশি পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

কিছু ফকিহদের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, কাজের কষ্ট কম হলেও কাজের ধরনের প্রতি লক্ষ করে বেশি পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েজ আছে। ফকিহগণ এ মাসআলার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন সেই মাসআলার সঙ্গে যেখানে যার জন্য লেখা হচ্ছে, তার উপকারিতার প্রতি লক্ষ করে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয়।

আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ. বলেন, তবে সেটি অনুরূপ কাজের ন্যায্য পারিশ্রমিকের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারবে না। কারণ, যে ব্যক্তি স্বর্ণের কাজ বা মুক্তার কাজের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছে, সে তার কষ্ট অনুযায়ী পারিশ্রমিক নেয় না। কেননা, তার তেমন কোনো কষ্ট হয় না। আমরা যদি এমনটি আবশ্যক করে দিই যে, সে তার কষ্ট অনুযায়ী পারিশ্রমিক নেবে, তাহলে সে এ ধরনের কাজ ছেড়ে দেবে। ফলে এ কাজটি বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং তারা যেটি নেয়, সেটি তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক।'[১৮৭]

এ মাসআলাটি তো খুব প্রসিদ্ধ যে, অনেক ফকিহ বিক্রিত পণ্যের মূল্যের শতকরা হারে দালালের কমিশন নির্ধারণকে জায়েজ বলেছেন। আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রহ. বুখারির ব্যাখ্যায় বলেন—

وهذا الباب فيه اختلاف للعلماء فقال مالك يجوز أن يستأجره على بيع سلعته إذا بين لذلك أجلا قال وكذلك إذا قال له بع هذا الثوب ولك درهم أنه جائز وإن لم يوقت له ثمنا وكذلك إن جعل له في كل مائة دينار شيئا وهو جعل وقال أحمد لا بأس أن يعطيه من الألف شيئا معلوما وذكر ابن المنذر عن حماد والثوري أنهما كرها أجره وقال أبو حنيفة إن دفع له ألف درهم يشتري بها بزا بأجر عشر دراهم فهو فاسد وكذلك لو قال اشتر مائة ثوب فهو فاسد فإن اشتري فله أجر مثله ولا يجاوز ما سمي من الأجر.

---

[১৮৭] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৯২।

'এ মাসআলার ব্যাপারে আলেমদের মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম মালিক রহ. বলেন, পণ্য বিক্রি করার জন্য বিনিময় দিয়ে দালাল রাখা জায়েজ আছে। তবে শর্ত হলো, তার শ্রমের সময় স্পষ্ট করতে হবে। তিনি আরও বলেন, অনুরূপভাবে কেউ যদি দালালকে এমন বলে যে, তুমি এই কাপড়টি বিক্রি করে দাও। বিনিময়ে তুমি এক দিরহাম পাবে, তাহলে এমন চুক্তি জায়েজ আছে। যদিও কাপড়ের মূল্য নির্ধারণ না করে দেয়। যদি দালালের পারিশ্রমিক হিসেবে শতকরা হারে কমিশন দেয়, তাহলেও জায়েজ আছে। ইমাম আহমাদ রহ. বলেন, শতকরা নির্দিষ্ট হারে কমিশন দেওয়া জায়েজ আছে। ইবনু মুনজির রহ. হাম্মাদ ও সাওরি রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তারা দুইজন দালালের পারিশ্রমিককে মাকরুহ বলতেন। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, কেউ যদি কাপড় ক্রয়ের জন্য দালালকে এক হাজার দিরহাম আর তার পারিশ্রমিক হিসেবে দশ দিরহাম দেয়, তাহলে এমন চুক্তি ফাসেদ হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি দালালকে বলে যে, আমার জন্য একশো পিস কাপড় ক্রয় করো, (পারিশ্রমিক হিসেবে তোমাকে দশ দিরহাম দেবো,) তাহলেও এ চুক্তি ফাসেদ হবে। আর এমন চুক্তিতে দালাল যদি কাপড় ক্রয় করে, তাহলে সে ন্যায্য পারিশ্রমিক পাবে। তবে তার ন্যায্য পারিশ্রমিকটি তার জন্য উল্লিখিত পারিশ্রমিকের বেশি হতে পারবে না।'[১৮৮]

আল্লামা ইবনু কুদামা রহ. বলেন—

ويجوز أن يستأجر سمسارا يشتري له ثيابا ورخص فيه ابن سيرين و عطاء و النخعي وكرهه الثوري و حماد.

ولنا أنها منفعة مباحة تجوز النيابة فيها فجاز الاستئجار عليها كالبناء فإن عين العمل دون الزمان فجعل له من كل ألف درهم شيئا معلوما صح أيضا.

'কাপড় ক্রয়ের জন্য কোনো দালাল নিয়োগ দেওয়া জায়েজ আছে। ইমাম ইবনু সিরিন, আতা ও ইবরাহিম নাখয়ি রহ. এটিকে জায়েজ বলেছেন।

[১৮৮] উমদাতুল কারি, অধ্যায় : ইজারা, পরিচ্ছেদ : দালালের পারিশ্রমিক, খণ্ড : ১৮, পৃষ্ঠা : ২৮৫।

ইমাম সাওরি ও হাম্মাদ রহ. এটিকে মাকরুহ বলেছেন। আমাদের দলিল হলো, এটি একটি বৈধ উপকারিতা। যেখানে প্রতিনিধিত্ব জায়েজ আছে। সুতরাং সেখানে ইজারা নেওয়াও জায়েজ হবে। যেমন : নির্মাণ কাজের জন্য ভাড়া নেওয়া জায়েজ আছে। যদি দালালের জন্য কাজ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। কিন্তু তার সময় নির্ধারণ করা না হয়। আর তার পারিশ্রমিক হিসেবে হাজার প্রতি নির্দিষ্ট পরিমাণ কমিশন নির্ধারণ করা হয়, তাহলে এমন চুক্তি করা জায়েজ আছে।'[১৮৯]

সারকথা, উপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেলো যে, ইমাম মালিক ও আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী শতকরা হারে দালালের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা জায়েজ আছে। আর আল্লামা আইনি রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর যে অভিমত নকল করেছেন, হানাফি মাজহাবের পরবর্তীকালের ফকিহগণ তার বিপরীত ফতোয়া দিয়েছেন। আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ. বলেন—

قال في التاترخانية: وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم.

وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به، وإن كان في الاصل فاسدا لكثرة التعامل، وكثير من هذا غير جائز فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام.

'তাতারখানিয়া কিতাবে বলা হয়েছে, দালালির ক্ষেত্রে ন্যায্য পারিশ্রমিক হওয়া আবশ্যক। উভয় পক্ষ যদি এমন চুক্তি করে যে, প্রতি দশ দিনারে এই পরিমাণ কমিশন পাবে, তাহলে এ পদ্ধতিটি হারাম হবে। আর হাবি নামক কিতাবে রয়েছে, মুহাম্মাদ ইবনু সালামাকে দালালির পারিশ্রমিক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। উত্তরে তিনি বললেন, আমার অভিমত হলো, এমন চুক্তি করলে তাতে কোনো সমস্যা নেই। যদিও আসল মাজহাব অনুযায়ী এমন চুক্তি ফাসেদ ছিলো। কিন্তু এ ধরনের চুক্তির ব্যাপকতার কারণে সেটি জায়েজ হবে। এ প্রকৃতির অনেক লেনদেন জায়েজ ছিলো না। তবে পরবর্তীকালে ব্যাপক লেনদেন হওয়ার কারণে

[১৮৯] আল-মুগনি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪৬৬।

সেগুলোকে জায়েজ করা হয়েছে। যেমন : গোসল খানায় প্রবেশের চুক্তিকে ব্যাপকতার কারণে জায়েজ করা হয়েছে।'[১৯০]

আর হানাফি মাজহাবের অনেক মুতাআখখিরিন ফকিহও শতকরা হারে কমিশনের ভিত্তিতে দালালের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা জায়েজ হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন। যেমন উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ বুজুর্গ ও হানাফি মাজহাবের ফকিহ এবং হিন্দুস্তানের হানাফি ফকিহদের মুকুট মাওলানা আশরাফ আলি থানবি রহ. এমন চুক্তিকে জায়েজ বলেছেন।[১৯১]

এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল্য কমবেশি হওয়াতে দালালের শ্রমে কোনো প্রভাব পড়ে না। কিন্তু তারপরও মুতাআখখিরিন ফকিহদের অভিমত অনুযায়ী শতকরা হারে দালালের কমিশন নির্ধারণ করা জায়েজ আছে। সুতরাং দালালের কমিশনের ওপর কিয়াস করে আলোচিত মাসআলায় ঋণ ইস্যু করার জন্য দাপ্তরিক ব্যয়কে ঋণের পরিমাণ অনুপাতে শতকরা হারে নির্ধারণ করা জায়েজ বলা হবে। কারণ, এ দুটির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

তবে শতকরা হারে নির্ধারণের মাধ্যমে উসুলকৃত অর্থের পরিমাণটি একেবারে স্বাভাবিক হতে হবে। যেন সেটি প্রকৃত সার্ভিস চার্জ হওয়ার ব্যাপারে কোনো ধরনের সন্দেহ সংশয়ের সুযোগ না থাকে। আর এই সার্ভিস চার্জ অনুরূপ কাজের জন্য ন্যায্য পারিশ্রমিকের বেশি হওয়া জায়েজ নেই। অন্যথায় সেটি যদি বেশি হয়, তাহলে 'ঋণের বিনিময়ে লাভ নেওয়া হারাম' এই নীতির অধীনে সেটি নিশ্চিত হারামে পরিণত হবে।

সার্ভিস চার্জ হিসেবে এই পরিমাণ অর্থ উসুল করা জায়েজ আছে, যেটি অনুরূপ কাজের ন্যায্য পারিশ্রমিকের সীমা অতিক্রম করবে না। কিন্তু তারপরও সেটি অনুরূপ কাজের ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। আর এমনটি হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে যে, সার্ভিস চার্জ উসুল করার নামে কোথাও সুদ উসুলের বাহানা করা হবে। এ কারণে ইসলামি ব্যাংকের উচিত হলো, তারা যেন এ পদ্ধতি অবলম্বন করে যে, আগের এক বছরের ঋণের জন্য প্রকৃত পক্ষে যে পরিমাণ দাপ্তরিক ব্যয় হয়েছে। সেটির সমষ্টি হিসেব করে আগামী এক বছরের ঋণের ওপর সে

---

[১৯০] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৬৩।

[১৯১] ইমদাদুল ফাতাওয়া, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৬৩-৩৬৬, প্রশ্ন নং ৩৩৩।

হারে সার্ভিস চার্জ আরোপ করবে। এভাবে এ ধরনের ঋণ ইস্যু করতে প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক ব্যয়ের হিসাবটি শতকরা হারে নির্ধারিত হয়ে যাবে। এরপর এই হিসাবে সব ঋণগ্রহীতার ওপর ঋণের পরিমাণ অনুপাতে দাপ্তরিক ব্যয় আরোপ করে সার্ভিস চার্জ হিসেবে সেটি উসুল করে নেবে। এ পদ্ধতি গ্রহণ করলে প্রত্যেক ঋণগ্রহীতার ব্যয় নির্ধারণের জন্য ভিন্নভাবে হিসেব করার প্রয়োজন পড়বে না। মহান আল্লাহ্ সর্বাধিক অবগত।

মাসআলা—২.

ব্যাংকের পক্ষ থেকে গ্রাহককে প্রথমে পণ্য ক্রয়ের উকিল নির্ধারণ করার পর সেটি তার কাছে ভাড়া দেওয়া এবং শেষ পর্যায়ে তার কাছেই সেটি বিক্রি করা

প্রশ্ন : ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকগুলো যেসব ভাড়ার লেনদেন করে তার প্রক্রিয়া হলো। উদাহরণস্বরূপ, পণ্য স্থানান্তর বা বহনের জন্য অয়েল ট্যাংকার, জাহাজ বা অনুরূপ বড়ো ধরনের জিনিস ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো অর্থায়ন করার পর সেগুলো ভাড়া দেয়। অথবা অনেক সময় তাদের সদস্য দেশগুলোর শিল্প প্রকল্পে মেশিনারী ক্রয় করে দেওয়ার পর সেগুলো তাদের কাছে ভাড়া দেয় অর্থাৎ ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকগুলো নিচে উল্লিখিত মৌলিক ক্ষেত্রগুলোতে ভাড়া দিয়ে থাকে। যথা—

ক. ভাড়ার মাধ্যমে ব্যাংক সেসব প্রজেক্টে অর্থায়ন করতে চায় যেখানে ব্যাংকের আর্থিক বা কারিগরি উপকারিতার নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। নিশ্চয়তা পাওয়ার পর ব্যাংক প্রজেক্ট পরিচালনাকারী কোম্পানির সঙ্গে ভাড়াদাতা হিসেবে চুক্তি করে। আর ব্যাংক ওই কোম্পানিকে তার নামে কাঙ্ক্ষিত পণ্য ক্রয়ের অনুমতি দিয়ে দেয়। (যার নির্ধারণ ও ধারণা অনুযায়ী ব্যয়ের পরিমাণটি এগ্রিমেন্টে উল্লেখ করা হয়।) চুক্তি অনুযায়ী ব্যাংক সাপ্লাইকারী-কোম্পানিকে এগ্রিমেন্টে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্যের মূল্য পরিশোধ করে দেওয়ার দায়িত্ব নেয়।

খ. এরপর ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে ওই কোম্পানি সেই পণ্যটি কবজা করে এবং এগ্রিমেন্টে বর্ণিত গুণগত মানে পাওয়া না পাওয়ার ব্যাপারে

নিশ্চিত হয়। এরপর যদি সে মেশিনারীগুলো স্থাপনের প্রয়োজন হয়, তাহলে ওই কোম্পানি সেটিরও দেখাশোনা করে। যেন চুক্তি অনুযায়ী সবকিছু যথার্থভাবে সম্পন্ন হয়।

গ. প্রজেক্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোম্পানির রিপোর্ট এবং কোম্পানি ও ব্যাংকের বিশেষজ্ঞদের ধারণা অনুযায়ী যতদিন পর মেশিন ক্রয়, স্থাপন এবং স্থাপনের পর তার কাঙ্ক্ষিত উপকারিতা পাওয়া যেতে পারে; এ কাজগুলো সম্পন্ন করতে যে পরিমাণ সময়ের প্রয়োজন হতে পারে, এগ্রিমেন্টে সেটি নির্ধারণ করা হয়। যেন এ সকল কাজের জন্য যে সময়ের প্রয়োজন সে সময়ের পর থেকে ভাড়ার কার্যক্রম শুরু করা যেতে পারে এবং সে সময়ের পর থেকেই মেশিনটি ব্যবহারযোগ্য হয় এবং তার থেকে উপকারিতা পাওয়া যায়।

ঘ. ভাড়ার জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভাড়াগ্রহীতা ভাড়া চুক্তির নির্ধারিত কিস্তি পরিশোধ করে। এগুলোর পাশাপাশি কোম্পানি ব্যাংকের উপকারার্থে মেশিনারীজগুলো সংরক্ষণ এবং তার ইন্সুরেন্স করার দায়িত্ব নিয়ে থাকে।

ঙ. এগ্রিমেন্টে এ কথা উল্লেখ থাকে যে, ভাড়ার মেয়াদ শেষ হলে ব্যাংকের পক্ষ থেকে ভাড়াগ্রহীতা কোম্পানির কাছে ওই মেশিনটি নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করা হবে। আর ভাড়াগ্রহীতা এগ্রিমেন্টে বর্ণিত শর্ত অনুযায়ী ভাড়ার সবগুলো কিস্তি এবং অন্যান্য দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করবে।

ব্যাংকের জন্য কি উল্লিখিত পদ্ধতিতে ভাড়া দেওয়া জায়েজ আছে?

উত্তর : কোনো জিনিস ভাড়া দেওয়ার দুটি পদ্ধতি রয়েছে।

১. ব্যাংক নিজে ভাড়ার পণ্য বা মেশিন ক্রয় করবে। এরপর ক্রেতা হিসেবে ব্যাংক সেটি কবজা করার পর তার গ্রাহকের কাছে নির্দিষ্ট মেয়াদ ও মূল্যের বিনিময়ে সেটি ভাড়া দেবে। এ পদ্ধতিতে ভাড়ার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ওই ভাড়ার জিনিসটি ব্যাংকের মালিকানায় ফিরে আসবে। এরপর উভয় পক্ষের স্বাধীনতা থাকবে তারা ইচ্ছে করলে নতুন করে ভাড়ার চুক্তি করতে পারে। অথবা নির্দিষ্ট কোনো মূল্য নির্ধারণ করে সেটি বিক্রি করে দিতে পারে। আবার ব্যাংকের এ অধিকারও রয়েছে

যে, সে ইচ্ছে করলে অন্য কোনো গ্রাহকের কাছেও সেটি ভাড়া বা বিক্রি করতে পারে।

শরয়ি দৃষ্টিতে এ পদ্ধতিটি জায়েজ এবং তার জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে কারও কোনো দ্বিমত নেই।

২. এই দ্বিতীয় পদ্ধতির যার ব্যাপারেই প্রশ্ন করা হয়েছে। এর কর্মপদ্ধতি হলো এরূপ : ব্যাংক এমন জিনিস ভাড়া দেওয়ার চুক্তি করে, যা তার মালিকানায় নেই। বরং ভাড়ার চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর প্রোডাক্ট কোম্পানির কাছ থেকে গ্রাহক ব্যাংকের নামে সে জিনিসটি ক্রয় করে। এরপর ব্যাংক তার গ্রাহককে সেটি কবজা করা এবং স্থাপনের উকিল বানায়। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের পক্ষ থেকে একটি তারিখ নির্ধারণ করে দেওয়া হয় যে, অমুক তারিখে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হয়ে ভাড়ার চুক্তির কার্যকারিতা শুরু হবে। সুতরাং সেই নির্ধারিত তারিখ থেকে ব্যাংক তার গ্রাহক থেকে ভাড়া উসুল করা শুরু করে। এভাবে ভাড়া চুক্তির মেয়াদ শেষ হয় এবং ব্যাংক তার গ্রাহক থেকে সব দায়দায়িত্ব যথার্থভাবে বুঝে নেওয়ার পর নামমাত্র মূল্যে ভাড়ার জিনিসটি গ্রাহকের কাছে বিক্রি করে দেয়। ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে এই দ্বিতীয় পদ্ধতির ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। যথা—

ক. ব্যাংক যখন ভাড়ার চুক্তি করে, তখন সে ওই জিনিসের মালিকই থাকে না। সেটি কবজা করার ব্যাপারটি তো অনেক দূরের কথা। আর মানুষ যে জিনিসের মালিক থাকে না, সেটি ভাড়া দিলে ভাড়া চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। অনুরূপভাবে যে জিনিস মানুষের কবজায় নেই, সেটিও ভাড়া দেওয়া বাতিল বলে গণ্য। কারণ, সেটি 'ঝুঁকিহীন লাভ অর্জন' এই মূলনীতির আওতাভুক্ত হয়ে যায়। যে ব্যাপারে হাদিসে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। আল্লামা ইবনু কুদামা রহ. 'শরহুল কাবির' কিতাবে বলেন—

وكذلك لا يصح هبته ولا رهنه ولا دفعه أجرة وما أشبه ذلك ولا التصرفات المنعقدة إلى القبض لانه غير مقبوض فلاسبيل إلى اقباضه

'অনুরূপভাবে দান, বন্ধক, ভাড়া ও অনুরূপ লেনদেন যা কবজার সঙ্গে সম্পৃক্ত এমন কোনো লেনদেনই করা সহিহ নয়। কারণ,

সেটি কবজায় নেই। সুতরাং ভবিষ্যতে সেটি অন্যের কবজায় দেওয়ারও সুযোগ নেই।'[১৯২]

ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াতে বর্ণিত আছে—

ومنها (أي من شرائط صحة الاجارة) أن يكون مقبوض المؤجر اذا كان منقولا، فان لم يكن في قبضه فلا يصح اجارته.

'ভাড়াচুক্তি সহিহ্ হওয়ার শর্তাবলির একটি শর্ত হলো, ভাড়ার জিনিসটি যদি স্থানান্তরযোগ্য হয়, তাহলে সেটি ভাড়াদাতার কবজায় থাকতে হবে। যদি তার কবজায় না থাকে, তাহলে সেটি ভাড়া দেওয়া জায়েজ নেই।'[১৯৩]

এ সমস্যার সমাধান হলো, ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে যখন চুক্তি হবে, তখন ভাড়ার চুক্তি সম্পন্ন করা যাবে না। বরং ভাড়ার চুক্তির জন্য সেটি শুধু একটি ওয়াদা হিসেবে গণ্য করা হবে। এরপর গ্রাহক প্রোডাক্ট-কোম্পানির কাছ থেকে সেটি কবজা করে স্থাপন করার পর সরাসরি বা পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে ভাড়াচুক্তি সম্পন্ন করতে হবে। ভাড়াচুক্তি সম্পন্ন করার তারিখের আগ পর্যন্ত সে জিনিসটি ব্যাংকের দায়িত্বে থাকবে। সুতরাং এ সময়কালের মধ্যে কোনো দুর্ঘটনার কারণে যদি সে জিনিসটি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে সেটি ব্যাংকের মালিকানা সম্পদ থেকে নষ্ট হয়েছে বলে মনে করা হবে। আর এ সময়কালে গ্রাহকের পক্ষ থেকে ওই জিনিসটি কবজায় রাখাটি আমানত হিসেবে কবজায় রাখার হুকুমে হবে। সুতরাং গ্রাহকের পক্ষ থেকে যদি কোনো ধরনের সীমালঙ্ঘন ছাড়া সেটি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে সে ব্যাপারে গ্রাহক দায়বদ্ধ থাকবে না।

খ. শরয়ি মূলনীতি হলো, কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে যদি ভাড়ার জিনিসটি ধ্বংস হয়ে যায়, আর ভাড়াগ্রহীতা সেটি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সীমালঙ্ঘন না করে, তাহলে তার ওপর এর দায়ভার বর্তাবে না। এ মূলনীতির আলোকে ভাড়াকালীন দুর্ঘটনা ও প্রাকৃতিক ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে ইন্সুরেন্স করার দায়িত্ব ভাড়াগ্রহীতার ওপর

---

[১৯২] শরহুল কাবির, ইবনু কুদামা রহ-এর রচিত, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১১৯।

[১৯৩] ফাতাওয়া হিন্দিয়া, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪১১।

বর্তাবে না। বরং উচিত হলো, যদি ইন্স্যুরেন্স করতেই হয়, তাহলে মালিক হিসেবে ব্যাংক নিজেই ইন্সুরেন্স করাবে, গ্রাহক নয়।

তবে ইন্সুরেন্স করা তখনই জায়েজ হবে, যখন সেটি সহযোগিতামূলক ও জায়েজ ইন্সুরেন্স হবে। ইন্সুরেন্সটি যদি ধোঁকা, সুদ, জুয়া ও অন্যান্য শরয়ি নিষিদ্ধ বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, তাহলে শরয়ি দৃষ্টিতে এমন ইন্সুরেন্স করা জায়েজ নেই।

গ. উল্লিখিত প্রশ্নে এ কথাটি স্পষ্ট রয়েছে যে, ভাড়ার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ভাড়াদাতার পক্ষ থেকে নামমাত্র মূল্যে সেটিকে ভাড়াগ্রহীতার কাছে বিক্রি করে দেবে। ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে এমন বিক্রয়ের দুটি পদ্ধতি হতে পারে। যথা—

১. ভাড়ার জিনিস বিক্রয়ের বিষয়টি ভাড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হবে। এ ক্ষেত্রে দুটি শর্তের সঙ্গে বিক্রয়কে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। একটি হলো, ভাড়ার মেয়াদ শেষ হতে হবে। দ্বিতীয় শর্তটি হলো, ভাড়াগ্রহীতা তার ওপর অর্পিত সব ধরনের দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। শরয়ি দৃষ্টিতে এমন চুক্তি জায়েজ নেই। কারণ, বিক্রয় চুক্তি এমন একটি চুক্তি, যাকে কোনো জিনিসের সঙ্গে শর্তযুক্ত করা যায় না। আর ভবিষ্যতের কোনো সময়ের সঙ্গেও বিক্রয়চুক্তিকে সংযুক্ত করা জায়েজ নেই। আল্লামা খালেদ আতাসি রহ. 'মাজাল্লাহ'-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন—

وأما الذي لا يصح تعليقه بالشرط شرعا فضابطه كل ما كان من التمليكات .... كالبيع والاجارة

'শরয়ি দৃষ্টিতে যেসব চুক্তিকে শর্তযুক্ত করা জায়েজ নেই তার মূলনীতি হলো, প্রত্যেক এমন চুক্তি যার মাধ্যমে মালিকানা হস্তান্তর করা হয়। যেমন : বিক্রয় ও ভাড়া।'[১৯৪]

২. দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, ভাড়ার চুক্তির সময় বিক্রি করার শর্ত করা হবে না বরং বিক্রির ওয়াদা করা হবে যেটি ভাড়ার চুক্তির মধ্যে শর্তযুক্ত হয়ে থাকবে।

এ ক্ষেত্রে ওয়াদাটি এমন একটি শর্ত হবে, যা বিক্রয়চুক্তির নিয়মের বিপরীত। হানাফি ও শাফিয়ি মাজহাব অনুযায়ী এমন শর্ত ভাড়াচুক্তিকে ফাসেদ করে

[১৯৪] শরহু মাজাল্লাহ, আল্লামা খালেদ আতাসি রহ.-এর রচিত, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৩৪।

দেয়। আর হাম্বালি ও মালিকি মাজহাবে এমন অনেক শর্ত রয়েছে যেগুলো চুক্তির নিয়মের বিপরীত হলেও সেগুলো চুক্তিকে বাতিল করে না। এখান থেকে বোঝা যায় যে, তাদের অভিমত অনুযায়ী এক চুক্তির মধ্যে ভাড়া ও বিক্রয় চুক্তি উভয়টি একত্রে করা জায়েজ আছে। শরহে খিরাশি আলা মুখতাসারিল খলিল কিতাবে বলা হয়েছে—

إن الإجارة إذا وقعت مع الجعل في صفقة واحدة، فإنها تكون فاسدة لتنافر الأحكام بينهما، لأن الإجارة لا يجوز فيها الغرر وتلزم بالعقد، ويجوز فيه الأجل ولا يجوز شيء من ذلك في الجعل... بخلاف اجتماع الإجارة مع البيع في صفقة واحدة فيجوز سواء كانت الإجارة في نفس المبيع، كما لو باع له جلودا على أن يخرزها البائع للمشتري نعالا، أو كانت الإجارة في غير المبيع كما لو باع له ثوبا بدراهم معلومة على أن ينسج له ثوبا آخر

'যদি 'জুল'-এর চুক্তির সঙ্গে ভাড়ার চুক্তি করা হয়, তাহলে সেটি ফাসেদ হবে। কারণ, ভাড়া ও 'জুল'-এর হুকুমের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে। কেননা, ভাড়ার মধ্যে কোনো ধরনের ধোঁকা জায়েজ নেই এবং চুক্তি সম্পন্ন হলে সেটি আবশ্যক হয়ে যায়। আর ভাড়ার মধ্যে মেয়াদ নির্দিষ্ট করা জায়েজ আছে। অথচ এগুলোর কোনোটিই 'জুল'-এর মধ্যে জায়েজ নেই। তবে ভাড়াকে বিক্রয়ের সঙ্গে একত্রে চুক্তি করার বিষয়টি এই হুকুমের বিপরীত। কেননা, সেটি জায়েজ আছে। চাই যে জিনিসটি বিক্রি করা হচ্ছে সেটিরই ভাড়ার চুক্তি হোক না কেন। যেমন : কেউ এ শর্তে চামড়া ক্রয় করলো যে, সেটি দিয়ে বিক্রেতা ক্রেতার জুতো তৈরি করে দেবে। অথবা বিক্রিত পণ্য ছাড়া অন্য জিনিসে ভাড়ার চুক্তি করা হোক না কেন। যেমন : কেউ নির্দিষ্ট দিরহামের বিনিময়ে এ শর্তে কাপড় ক্রয় করলো যে, বিক্রেতা তার জন্য অন্য কাপড় তৈরি করে দেবে। শরয়ি দৃষ্টিতে এ পদ্ধতি জায়েজ আছে।'[১৯৫]

মালিকি ও হাম্বালি মাজহাবে অনুরূপ শর্ত করা তখন জায়েজ, যখন নগদ বিক্রি হবে বাকিতে নয়। আর সে বিক্রয়ের মধ্যে যে ভাড়ার চুক্তি করা হচ্ছে সেটিও নগদ হবে। তবে আমাদের আলোচিত মাসআলা এ মাসআলার সম্পূর্ণ

[১৯৫] আল-খিরাশি আলা মুখতাসারিল খলিল, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৪।

বিপরীত। অর্থাৎ সেখানে ভাড়ার চুক্তিটি যদিও নগদ হয়। কিন্তু তার মধ্যে শর্তকৃত বিক্রয়টি ভাড়ার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর হবে। মালিকি মাজহাবের কিতাবসমূহে যদিও এ মাসাআলা সম্পর্কে আমি স্পষ্ট কোনো বক্তব্য পাইনি। তবে তাদের কিতাবের বর্ণনা থেকে এটি বোঝা যায় যে, একটি চুক্তির মধ্যে অন্য শর্তারোপ করা তাদের কাছে মৌলিকভাবে জায়েজ আছে। শুধু দুটি ক্ষেত্র ছাড়া কোনো শর্ত চুক্তিকে ফাসেদ করে না। তার একটি হলো, এমন শর্তারোপ করা, যা আসল চুক্তির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। যেমন : বিক্রেতা তার পণ্য বিক্রি করার সময়ই শর্তারোপ করলো যে, ক্রেতা সেটির মধ্যে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। অথবা এই শর্তের সঙ্গে ভাড়া দেবে যে, ভাড়াগ্রহীতা সেটি দিয়ে কোনা ধরনের উপকৃত হতে পারবে না। এ শর্ত দুটি যেহেতু আসল চুক্তির উদ্দেশ্যের পরিপন্থি, এ কারণে চুক্তিটি ফাসেদ হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি হলো, এমন শর্তারোপ করা, যার কারণে মূল্য অস্পষ্ট থাকবে অথবা মূল্যে কমবেশি হয়ে যাবে। এ ধরনের শর্তারোপ করার কারণেও চুক্তিটি ফাসেদ হয়ে যাবে।[১৯৬]

বোঝা গেলো যে, ভাড়ার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বিক্রয় করার শর্তটি উল্লিখিত দু-পদ্ধতির আওতাভুক্ত নয়। তাই মালিকি মাজহাব অনুযায়ী এ পদ্ধতিটি জায়েজ আছে বলে মনে হয়। মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

সারকথা, এই বিস্তারিত আলোচনার পর মালিকি মাজহাব গ্রহণ করে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, এটি হলো ভাড়ার চুক্তির মধ্যে বিক্রয়ের ওয়াদার শর্ত। আর বিক্রয়চুক্তি সংঘটিত হবে ভাড়ার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর। সুতরাং ভাড়ার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর উভয় পক্ষ স্বতন্ত্র প্রস্তাব ও গ্রহণের মাধ্যমে বিক্রয়ের চুক্তি করবে। তখন সেটি সরাসরিও হতে পারে বা পত্রের মাধ্যমেও হতে পারে।

আলোচিত মাসআলা জায়েজ হওয়ার তৃতীয় একটি পদ্ধতি হতে পারে। আমার ধারণা অনুযায়ী তা চার মাজহাবের ইমামদের কাছেই জায়েজ হবে। সে পদ্ধতি হলো, বিক্রয়ের ওয়াদাকে ভাড়ার চুক্তির মধ্যে শর্ত করা যাবে না। বরং ওয়াদাটিকে একেবারে ভিন্ন রাখা হবে। সেটি এভাবে হতে পারে যে,

---

[১৯৬] মাওয়াহিবুল জালিল, আল্লামা হাত্তাব রহ.-এর রচিত, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৭৩-৩৭৫। আল-খিরশি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৮০-৮১। বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৩ ও ১৩৪।

এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি ওয়াদা হয়ে যাবে। যার মধ্যে এমন ওয়াদা থাকবে যে, উভয় পক্ষ প্রথমে ভাড়ার চুক্তি করবে। তারপর বিক্রয়চুক্তি করবে। এরপর ওয়াদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে ভাড়ার চুক্তি করা হবে। যেখানে বিক্রয়ের কোনো কথা থাকবে না। এরপর ভাড়ার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর স্বতন্ত্রভাবে বিক্রয়চুক্তি করবে। আর সে বিক্রয়ের মধ্যে কোনো শর্ত বা অন্য কিছু থাকবে না। এ পদ্ধতি অবলম্বন করলে উভয় চুক্তি স্বতন্ত্র ও শর্তহীন থাকবে। আর এ পদ্ধতিতে উভয় পক্ষের মধ্যে যে চুক্তি হবে সেটি তিনটি বিষয়ের চুক্তি হবে। যথা—

১. ব্যাংকের পক্ষ থেকে গ্রাহককে পণ্য ক্রয়ের ব্যাপারে উকিল বানানো হবে।

২. গ্রাহক এই ওয়াদা করবে যে, পণ্য হস্তগত ও স্থাপন করার পর সে ভাড়া নেবে।

৩. ব্যাংক এই ওয়াদা করবে যে, ভাড়ার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সেটি গ্রাহকের কাছে বিক্রি করবে। এই চুক্তি সম্পন্ন করার মাধ্যমে গ্রাহক শুধু পণ্য ক্রয় করার ব্যাপারে ব্যাংকের উকিল হবে। এরপর ওকালতের কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর ওয়াদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে স্বতন্ত্রভাবে ভাড়ার চুক্তি করা হবে। তারপর ভাড়ার মেয়াদ শেষ হলে ওয়াদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে উভয় পক্ষের সম্মতির মাধ্যমে স্বতন্ত্রভাবে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন করা হবে।

এখন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রাহকের জন্য ভাড়া নেওয়া এরপর পরবর্তীতে ব্যাংকের জন্য বিক্রি করার ওয়াদা পালন করা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। আর বিচারিক দিক থেকে ওয়াদা পালন ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি লক্ষ করলে দেখা যায়, মালিকি মাজহাবে ওয়াদা করার কারণে যার জন্য ওয়াদা করা হয়েছে তাকে যদি এমন কোনো কাজে বাধ্য করা হয়, যা ওই ওয়াদার কারণে আবশ্যক হয়েছে, তাহলে এমন ক্ষেত্রে বিচারিক দিক থেকেও ওয়াদা পালন করা ওয়াজিব। আর ওয়াদাকারী যদি তার ওয়াদার বিপরীত কাজ করে এবং সে কারণে যার জন্য ওয়াদা করা হয়েছে তার কোনো আর্থিক ক্ষতি হয়ে থাকে, তাহলে ওয়াদাকারী সেই আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

আল্লামা করাফি মালিকি রহ. নিজ কিতাব 'আল-ফুরুক'-এ বলেন—

قال سحنون : الذي يلزم من الوعد قوله : اهدم دارك وأنا أسلفك ما تبني به، أو : اخرج إلى الحج وأنا أسلفك ، أو : اشتر سلعة أو تزوج امرأة وأنا أسلفك ؛ لأنك أدخلته بوعدك في ذلك، أما مجرد الوعد فلا يلزم الوفاء به بل الوفاء به من مكارم الأخلاق.

'ইমাম সুহনুন রহ. বলেন, যেসব ওয়াদা আবশ্যক সেগুলো হলো, কোনো একজন অন্যের সঙ্গে এমন ওয়াদা করলো যে, তোমার ঘর ভেঙে ফেলো দ্বিতীয়বার নির্মাণের জন্য আমি অর্থায়ন করবো। অথবা বললো, তুমি হজে যাও আমি তোমার ব্যয় বহন করবো। বা অমুক জিনিস ক্রয় করো বা অমুক মহিলাকে বিয়ে করো আমি তোমার ব্যয় বহন করবো। (বিচারিক দিক থেকে এ ধরনের ওয়াদা পূর্ণ করা ওয়াজিব।) কারণ, ওয়াদার কারণে তুমি তাকে সে কাজ করিয়েছো। অবশ্য সাধারণ ওয়াদা পালন করা বিচারিক দৃষ্টিকোণ থেকে ওয়াজিব নয়। তবে সেগুলো পালন করা উত্তম চরিত্রের পরিচয়।'[১৯৭]

শায়খ উলাইশ মালিকি রহ. ওয়াদা পালন ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে তিনটি অভিমত বর্ণনা করার পর বলেন—

والرابع يقضي بها إن كانت على سبب ودخل الموعود بسبب العدة في شيء وهذا هو المشهور في الأقوال ... قال أصبغ : سمعت أشهب وسئل عن رجل اشترى من رجل كرما فخاف الوضيعة فأتى ليستوضعه فقال له بع وأنا أرضيك، قال: فإن باع برأس ماله أو بربح فلا شيء عليه.

وإن باع بالوضيعة كان عليه أن يرضيه،وهذا القول الذي شهره ابن رشد في القضاء بالعدة اذا دخل بسببها في شئ قال الشيخ أبو الحسن في أول كتاب الأول أنه مذهب المدونة، لقولها في أخر كتاب الغرر، وان قال: اشتر عبد فلان وأنا اعينك بالف درهم فاشتراه لزمه ذلك الوعد اه وهو قول ابن القاسم في سماعه من كتاب العارية وقول سحنون في كتاب العدة.

[১৯৭] কিতাবুল ফুরুক, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৪-২৫।

'চতুর্থ এই যে, আইনগতভাবে সে ওয়াদা ওয়াজিব হওয়ার হুকুম দেওয়া হবে। যদি তা কোনো লেনদেনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় আর প্রতিশ্রুত ব্যক্তি ওয়াদার কারণে সেই লেনদেন করে থাকে। ফকিহদের অভিমতের মধ্যে এটিই প্রসিদ্ধ অভিমত। ...ইমাম আসবাগ রহ. বলেন, আমি আশহাব রহ.-কে বলতে শুনেছি, তাকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যে কারও থেকে আঙুর ক্রয় করার পর সেখানে লোকসানের আশঙ্কা করলো। ফলে সেটির মূল্য কম করার জন্য বিক্রেতার কাছে আসলো। তখন বিক্রেতা তাকে বললো, তুমি এই আঙুর বিক্রি করে দাও। বিক্রি করার কারণে যদি তোমার ক্ষতি হয়, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ দিয়ে আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করে দেবো। ইমাম আশহাব রহ. বলেন, এ ক্ষেত্রে ক্রেতা যদি আসল মূল্য বা তার চেয়ে বেশি মূল্যে বিক্রি করে, তাহলে আসল বিক্রেতার ওপর কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়া আবশ্যক হবে না। আর যদি কম মূল্যে বিক্রি করে, তাহলে বিক্রেতার পক্ষ থেকে তাকে সন্তুষ্ট করা ওয়াজিব।

আল্লামা ইবনু রুশদ থেকে যে অভিমতটি প্রসিদ্ধ আছে যে, বিচারিক দৃষ্টিতে ওয়াদা পালন করা ওয়াজিব। সেটি এমন ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, যেখানে ওয়াদার কারণে সে কোনো কাজ করবে। শায়খ আবুল হাসান রহ. তার 'কিতাবুল আওয়াল' নামক কিতাবের শুরুতে বলেছেন, মুদাওয়ানারও এই মাজহাব। কারণ, 'ধোঁকা' অধ্যায়ের শেষে রয়েছে, কেউ যদি অন্যকে বলে, তুমি অমুকের দাস ক্রয় করো, আমি এক হাজার দিরহাম দিয়ে তোমাকে সহযোগিতা করবো। এরপর তার ওয়াদা অনুযায়ী সে যদি ওই দাস ক্রয় করে, তাহলে এক হাজার দিরহাম দেওয়া আবশ্যক হবে। কিতাবুল আরিয়াতে ইবনু কাসেম রহ.-এর এই অভিমত রয়েছে। আর 'কিতাবুল ইদ্দা'তে ইমাম সুহনুন রহ.-এরও এই অভিমত রয়েছে।'[১৯৮]

হানাফি মাজহাবের আসল অভিমত অনুযায়ী যদিও ওয়াদা পালন করা আইনগতভাবে ওয়াজিব নয়। তবুও হানাফি মাজহাবের মুতাআখখিরিন ফকিহগণ বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে ওয়াদা পালনকে আবশ্যক করেছেন। রদ্দুল মুহতার কিতাবের 'ফাসেদ শর্তের' আলোচনায় আল্লামা ইবনু

[১৯৮] ফাতহুল আলি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৫৫।

আবিদিন রহ. বলেন—

وفي جامع الفصولين أيضا لو ذكرا البيع بلا شرط ثم ذكرا الشرط على وجه العدة جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد، إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازما لحاجة الناس.

'জামেউল ফুসুলাইন কিতাবে আছে, যদি শর্তহীন বিক্রয়ের কথা বলার পর ওয়াদাস্বরূপ শর্ত উল্লেখ করে, তাহলে বিক্রয় সহিহ হয়ে যাবে। আর ওয়াদা পালন করা ওয়াজিব হবে। কেননা, কখনো কখনো ওয়াদা পালন ওয়াজিব হয়ে যায়। সুতরাং মানুষের প্রয়োজনে সেটিকেও ওয়াজিব করে দেওয়া হবে।'

এরপর তিনি আল্লামা রামলি রহ.-এর ফাতাওয়া খয়রিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন—

فقد صرح علمائنا بأنهما لو ذكرا البيع بلا شرط ثم ذكر الشرط على وجه العدة جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد.

'আমাদের আলেমগণ এ বিষয়টি স্পষ্ট বলেছেন যে, যদি শর্তহীন বিক্রয়চুক্তি করার পর ওয়াদাস্বরূপ শর্ত উল্লেখ করে, তাহলে বিক্রয় সহিহ হয়ে যাবে এবং ওয়াদা পালন করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।'

এ আলোচনার শেষ পর্যায়ে বলেন—

وقد سئل الخير الرملي عن رجلين تواضعا على بيع الوفاء قبل عقده و عقد البيع خاليا عن الشرط، فأجاب بأنه صرح في الخلاصة والفيض والتاتارخانية وغيرها بأنه يكون على ما تواضعا.

কোনো একজন আল্লামা খয়রুদ্দিন রামলি রহ.-কে জিজ্ঞেস করলো যে, বিক্রয়চুক্তি করার আগে যদি দুজনে বায়ে ওফা করার ওয়াদা করে। আর বিক্রয়চুক্তিকে সব ধরনের শর্তমুক্ত রাখে। তাহলে এ ক্ষেত্রে কী হুকুম হবে। উত্তরে তিনি বললেন, খুলাসাতুল ফাতাওয়া, ফয়েজ, তাতারখানিয়া ও অন্যান্য কিতাবে বলা হয়েছে, তারা যদি অনুরূপভাবে চুক্তি করে নেয়, তাহলে সেটি সংঘটিত হয়ে যাবে।'[১৯৯]

---

[১৯৯] রদ্দুল মুহতার, অধ্যায় : বিক্রয়, পরিচ্ছেদ : ফাসেদ বিক্রয়, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৮৪ ও ১৩৫।

এ সকল বক্তব্যে হানাফি মাজহাবের আলেমগণ এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন যে, মানুষের প্রয়োজনের কারণে অনেক সময় ওয়াদা পালন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। অনুরূপভাবে আল্লামা খালেদ আতাসি রহ. 'বাইয়ে ওফার' আলোচনায় 'ফাতাওয়ায়ে তাতার খানিয়া' থেকে বর্ণনা করেন—

وان ذكر البيع من غير شرط ثم ذكر الشرط على وجه المواعدة فالبيع جائز، ويلزم الوفاء بالوعد، لأن المواعيد قدتكون لازمة فتجعل لازمة لحاجة الناس.

'যদি শর্তহীনভাবে বিক্রয়চুক্তি করার পর ওয়াদাস্বরূপ শর্ত উল্লেখ করে থাকে, তাহলে বিক্রয়চুক্তি সহিহ হবে, সঙ্গে সঙ্গে ওয়াদা পালন করাও ওয়াজিব হবে। কারণ, কখনো কখনো ওয়াদা পালন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। সুতরাং মানুষের প্রয়োজনে সেটি ওয়াজিব করে দেওয়া হবে।'[২০০]

সুতরাং ফকিহদের এ সকল বক্তব্যে দৃষ্টি দিলে এ কথা বলা যায় যে, এগ্রিমেন্টে ভবিষ্যতে ভাড়া ও বিক্রি করার ব্যাপারে উভয় পক্ষ যে ওয়াদা করে, বিচারিক দৃষ্টিতেও সেটি পালন করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

উত্তরের সারাংশ

উপরে যে বিস্তারিত উত্তর দিয়েছি তার সারকথা হলো, ব্যাংকের জন্য উত্তম হলো এই বিস্তারিত উত্তরের শুরুতে আমরা প্রথম যে পদ্ধতির কথা বলেছি, সেটি অনুযায়ী তারা গ্রাহকের কাছে ভাড়া দেবে। কারণ, সে পদ্ধতিটি জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে কোনো ধরনের সন্দেহ বা মতানৈক্য নেই, আর সবসময় মতানৈক্য ও সন্দেহ থেকে দূরে থাকা ভালো।

অবশ্য যদি কোনো কারণে সেটির ওপর আমল না করা যায়, তাহলে ব্যাংকের পক্ষ থেকে যে পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, সেটিকে শরয়ি পদ্ধতি অনুযায়ী জায়েজ করতে হলে নিচের শর্তগুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখা একান্ত জরুরি। যথা—

১. ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে যে এগ্রিমেন্ট লেখা হয়। সেখানে গ্রাহককে পণ্য ক্রয়ের উকিল নির্ধারণের বিষয়টি তো একেবারে নিশ্চিত হয়ে থাকে। তবে

[২০০] শরহে মাজাল্লাহ, আল্লামা খালেদ আতাসি রহ.-এর রচিত, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪১৫।

ওই এগ্রিমেন্টে ভাড়া ও বিক্রয়ের বিষয়টিকে শুধু ওয়াদা হিসেবে উল্লেখ করতে হবে। চূড়ান্তভাবে সেগুলোর চুক্তি করা যাবে না।

২. গ্রাহক পণ্য ক্রয়ের পর সেটি কবজা এবং স্বস্থানে স্থাপন করার পর সরাসরি বা পত্রের মাধ্যমে ভাড়ার চুক্তি সম্পন্ন করবে, আর ভাড়ার চুক্তি করার সময় বিক্রয়ের বিষয়টি উল্লেখ করবে না।

৩. পণ্য ক্রয়ের পরে ও ভাড়ার চুক্তি হওয়ার আগের সময়ে পণ্যটি ব্যাংকের জিম্মায় থাকবে।

৪. ভাড়ার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বিক্রয়ের চূড়ান্ত চুক্তি করবে। তার আগে নয়।

৫. এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে উভয় পক্ষ ভাড়া ও বিক্রয়ের ব্যাপারে যে ওয়াদা করবে, ধর্মীয় ও বিচারিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় পক্ষের জন্য সেটি রক্ষা করা ওয়াজিব।

৬. উভয় পক্ষের কোনো পক্ষ যদি ভাড়া বা বিক্রয়ের ওয়াদার বিপরীত কাজ করে, তাহলে তার ওয়াদা রক্ষা না করার কারণে অন্য পক্ষ বাস্তবে যে পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে, সেটি ওয়াদা ভঙ্গকারী পক্ষকে বহন করতে হবে। মহান আল্লাহ্ সর্বাধিক অবগত।

মাসআলা—৩.

ইসলামি উন্নয়নমূলক ব্যাংকগুলো তাদের সদস্য দেশের সঙ্গে বাকি লেনদেন করা

প্রশ্ন : ইসলামি উন্নয়নমূলক ব্যাংকগুলো তাদের সদস্য দেশের উন্নয়ন এবং উপকারের স্বার্থে প্রজেক্ট ও অন্যান্য মেশিন ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ভাড়ার লেনদেনের বাইরে বাকি বিক্রয়ের লেনদেন করে থাকে। ব্যাংকগুলো তাদের সদস্য দেশের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় মেশিন ইত্যাদি বাজার থেকে ক্রয় করে তাদের কাছে বাকিতে বিক্রয় পদ্ধতিকে ব্যবহার করে। তাদের কর্মপদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ হলো, ব্যাংক তাদের সদস্য দেশের প্রতিনিধিকে ব্যাংকের পক্ষ থেকে ব্যাংকের নামে পণ্য ক্রয়ের ব্যাপারে উকিল নিযুক্ত করে। আর সাপ্লাইকারী কোম্পানিকে সরাসরি ব্যাংকের পক্ষ থেকে মূল্য পরিশোধ করে দেওয়া হয়, আর ব্যাংকও পণ্য সরবরাহকারী কোম্পানির সঙ্গে এভাবে চুক্তি করা হয় যে, সরবরাহকারী

কোম্পানি পণ্যটিকে সরাসরি ব্যাংকের সদস্য দেশের কাছে হস্তান্তর করবে, আর ব্যাংকের পক্ষ থেকে উকিল হিসেবে সে দেশের প্রতিনিধি পণ্যের নির্ধারিত গুণগত মান যাচাই করে সেটি কবজা করবে। এরপর ব্যাংক তার ক্রয় মূল্য অপেক্ষা কিছু বেশি মূল্যে সেটিকে সদস্য দেশের কাছে এ শর্তে বিক্রি করে যে, নির্দিষ্ট কিস্তিতে সদস্য দেশ তার মূল্য পরিশোধ করবে। এ ধরনের কিস্তির সময়সীমা সাধারণত তিন থেকে দশ বছর মেয়াদি হয়ে থাকে।

ব্যাংকের জন্য এ পদ্ধতিতে বাকিতে পণ্য বিক্রি করে কিস্তিতে মূল্য উসুল করা জায়েজ আছে কি না?

উত্তর : এ পদ্ধতির লেনদেনের ক্ষেত্রে ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে শুধু একটি বিষয়ে চিন্তা করতে হবে, আর সেটি হলো, বিক্রয় সহিহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, পণ্যটি বিক্রেতা বা তার উকিলের কবজায় থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে হাম্বালি মাজহাবে শুধু খাদ্যের ক্ষেত্রে এ ধরনের শর্তারোপ করা হয়েছে। সুতরাং তাদের অভিমত অনুযায়ী খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অন্য সবকিছু কবজা করার আগে বিক্রি করা জায়েজ আছে, আর মালিকি মাজহাবে শুধু ওজন ও কায়েলযোগ্য জিনিসের ক্ষেত্রে কবজার শর্তারোপ করা হয়েছে। সুতরাং তাদের কাছে ওজন ও কায়েলযোগ্য জিনিস ছাড়া অন্য জিনিসের ক্ষেত্রে কবজা করা শর্ত নয়। ইমাম শাফিয়ি ও মুহাম্মাদ ইবনু হাসান রহ.-এর কাছে সব ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রে কবজা করা শর্ত। চাই সেটি খাদ্যদ্রব্য বা ওজন ও কায়েলযোগ্য বা জমি ইত্যাদি হোক না কেন। ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী জমি ছাড়া অন্য কোনো পণ্য বিক্রি করার আগে সেটি বিক্রেতার কবজায় থাকা আবশ্যক।[২০১]

কবজা করার আগে পণ্য বিক্রির নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে অনেক হাদিস রয়েছে। বুখারি ও মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে—

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه » قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ.

'মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কোনো খাদ্য

[২০১] ফাতহুল কাদির, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৩৭। আল-মুগনি, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১১৩।

বিক্রি করতে চায়, সেটি কবজা করার আগে যেন সেটি বিক্রি না করে। ইবনু আব্বাস রা. বলেন, আমি মনে করি, এ হুকুমটি শুধু খাদ্যের সঙ্গে বিশেষিত নয়। বরং সব জিনিসের ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য।'[২০২]

ইমাম আবু দাউদ রহ. ইবনু উমর রা.-এর ঘটনায় জায়েদ ইবনু সাবেত রা. থেকে বর্ণনা করেন—

فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَي أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّي يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إلى رِحَالِهِمْ.

'মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে নিষেধ করেছেন যে, ব্যবসায়ীরা নিজের আয়ত্তে নেওয়ার আগে যেখানে পণ্য ক্রয় করা হয়, সেখানে যেন সেটি বিক্রি না করে।'[২০৩]

ইমাম বাইহাকি রহ. হাকেম ইবনু হেজাম রা. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন—

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أَبْتَاعُ هَذِهِ الْبُيُوعَ فَمَا يَحِلُّ مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ على ؟ قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي لاَ تَبِيعَنَّ شيئًا حَتَّي تَقْبِضَهُ.

'আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমি ক্রয়-বিক্রয় করি। সুতরাং এগুলোর কোনটি হালাল আর কোনটি হারাম আপনি তা বলে দিন। উত্তরে তিনি বললেন, হে ভাতিজা, কোনো জিনিস কবজা করার আগে কখনোই সেটি বিক্রি করবে না।'[২০৪]

ইমাম বাইহাকি রহ. বলেন, এই হাদিসটির সূত্র হাসান পর্যায়ের এবং মুত্তাসিল। ইমাম ইবনু কইয়্যিম রহ. তাহজিবুস সুনান কিতাবে বলেন, হাদিসটির সূত্র ইমাম বুখারি ও মুসলিম রহ.-এর শর্ত অনুযায়ী। তবে তার মধ্যে শুধু একজন বর্ণনাকারী তাদের শর্ত অনুযায়ী নয়। তিনি হলেন, আবদুল্লাহ ইবনু ইসমাহ রহ.। তবে ইমাম ইবনু হিব্বান রহ. তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন, আর ইমাম নাসায়ি রহ. তাকে দলিলযোগ্য মনে করতেন।[২০৫]

---

[২০২] বুখারি : ২১৩৫, মুসলিম : ১৫২৫।

[২০৩] সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৩৪৯৯, মুস্তাদরাকে হাকেম, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪০।

[২০৪] সুনানে বাইহাকি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩১৩, হাদিস নং ১৯৮৯।

[২০৫] তাহজিবুস সুনান, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৩১।

সুনানে তিরমিজিতে বর্ণিত হয়েছে—

عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلي الله عليه و سلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمن.

'আবদুল্লাহ ইবনু আমর রা. থেকে বর্ণিত। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একসঙ্গে ঋণ ও বিক্রয় জায়েজ নেই। বিক্রয়ের মধ্যে দুটি শর্ত একত্রিত করা জায়েজ নেই। ঝুঁকি বহন ছাড়া লাভ অর্জন করা জায়েজ নেই।'[২০৬]

ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান ও সহিহ। এ হাদিসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন জিনিসের লাভ করতে নিষেধ করেছেন, যে জিনিসটি জিম্মায় আসেনি, আর 'কবজা করার আগে বিক্রি করা' হাদিসের এই নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত। কারণ, ক্রেতা যতক্ষণ পর্যন্ত তার ক্রয়কৃত পণ্য কবজা না করে। ততক্ষণ পর্যন্ত পণ্যটি তার জিম্মায় আসে না। সুতরাং ক্রেতা পণ্য কবজা করার আগে যদি বিক্রি করে দেয়, তাহলে সেটি জিম্মাদারি নেওয়া ছাড়া বিক্রি করা হবে, যেটি জায়েজ নেই।

অবশ্য সে পণ্যটি যদি ওজন ও কায়েলযোগ্য না হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে হাম্বালি ও[২০৭] মালিকি মাজহাবের আলেমদের কাছে যদিও বিক্রি জায়েজ হবে, কিন্তু উল্লিখিত হাদিসগুলো ব্যাপক এবং সব ধরনের পণ্য তার অন্তর্ভুক্ত। অতএব হাদিসগুলোর ব্যাপকতার প্রতি লক্ষ রেখে মতানৈক্য থেকে দূরে থাকতে ব্যাংকের জন্য উত্তম হলো যে, গ্রাহকের কাছে পণ্যটি বিক্রি করার আগে সরাসরি বা উকিলের মাধ্যমে সেটি কবজা করবে, অথবা এমনটিও করা যেতে পারে যে, ব্যাংকের পক্ষ থেকে গ্রাহকের এলাকায় কোনো প্রতিনিধি বা এজেন্ট নিয়োগ করবে। যে প্রতিনিধি বা উকিল ব্যাংকের পক্ষ থেকে পণ্য কবজা করার পর সেটিকে ক্রেতার কাছে বিক্রি করবে। আবার এমন পদ্ধতিও অবলম্বন করা যেতে পারে যে, ব্যাংকের পক্ষ থেকে পণ্য বহনকারী জাহাজ কোম্পানিকে পণ্য ক্রয়ের উকিল নির্ধারণ

---

[২০৬] সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ১২৩৪, আবু দাউদ ৩৫০৪।

[২০৭] উর্দু তরজমায় 'মালিকি' এর স্থানে 'শাফিয়ি' লেখা হয়েছে, যা ভুল। দেখুন বুহুস ১/২১২।

করবে। এ ক্ষেত্রে জাহাজে পণ্য লোড করার পর ক্রেতার বন্দরে পৌঁছানোর আগেই তার সঙ্গে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন করতে পারবে।

ব্যাংক যদি তার ক্রেতা গ্রাহককে এ ব্যাপারে উকিল নির্ধারণ করে যে, সে তার এলাকার বন্দরে গিয়ে ব্যাংকের উকিল হিসেবে জাহাজ থেকে পণ্য কবজা করবে, তাহলে এমন ক্ষেত্রে ব্যাংকের জন্য আবশ্যক হলো, সে তার গ্রাহকের সঙ্গে ফোন বা পত্রের মাধ্যমে তখন বিক্রয়চুক্তি করবে যখন গ্রাহক পণ্যটি কবজা করে নেবে, আর এই বিক্রয়চুক্তি করার আগ পর্যন্ত বিক্রয়ের ব্যাপারে শুধু ওয়াদা থাকবে। অবশ্য বিচারিক দৃষ্টিতে গ্রাহকের জন্যও সে ওয়াদা রক্ষা করা ওয়াজিব। ইতোপূর্বে যে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আর বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার আগে এবং গ্রাহক কবজা করার পরের সময়টিতে ওই পণ্য ব্যাংকের জিম্মায় থাকবে। চাই ব্যাংকের উকিল হিসেবে ক্রেতা সেটি কবজা করুক বা অন্য কোনো উকিল সেটি কবজা করুক। সুতরাং উকিলের কোনো ধরনের সীমালঙ্ঘন ছাড়া যদি পণ্য ধ্বংস হয়ে যায় বা তাতে কোনো ক্ষতি হয়ে যায়, তাহলে ব্যাংকের ওপর সেটির দায়ভার বর্তাবে। মহান আল্লাহ্ সর্বাধিক অবগত।

মাসআলা—৪.

ব্যাংক কর্তৃক তার সদস্য দেশগুলোর সঙ্গে বাকিতে ও কিস্তিতে মুরাবাহা লেনদেন করা

প্রশ্ন : ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকগুলো আন্তর্জাতিক ব্যবসা পরিমণ্ডলে অর্থায়নের জন্য তার সদস্য দেশগুলোর সঙ্গে বাকিতে ও কিস্তিতে মুরাবাহা পদ্ধতিতে লেনদেন করে। ব্যাংকগুলো তাদের সদস্য দেশের প্রয়োজন পূরণের জন্য এ ধরনের লেনদেন করে থাকে।

আন্তর্জাতিক লেনদেনের আসল অবস্থা হলো, ব্যাংকের সদস্য দেশ যখন উন্নয়নমূলক কোনো কিছু ক্রয় করতে চায়। তখন ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকগুলো সে দেশের চাহিদা দেখে তাদের থেকে অর্ডার নেওয়ার পর পণ্যটি বাজার থেকে ক্রয় করে। এরপর সে সদস্য দেশের কাছে সেটি বিক্রি করে। এর কর্মপদ্ধতি এমন হয় যে, এ ধরনের উদ্দেশ্যের জন্য ব্যাংক একটি চুক্তি করে। সে চুক্তিতে ব্যাংক ছাড়াও সদস্য দেশ ও সদস্য দেশে ব্যাংকের পক্ষ থেকে

একটি উকিল পক্ষ নির্ধারণ করা হয়। ব্যাংকের পক্ষ থেকে যাকে উকিল নির্ধারণ করা হয়, তার ওপর কাঙ্ক্ষিত পণ্য ক্রয় করা, ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে সেটি কবজা করা ও সদস্য দেশের কাছে সেটি বিক্রি করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সেই উকিল ব্যাংকের পক্ষ থেকে নির্ধারিত মূল্যে সদস্য দেশের কাছে পণ্যটি বিক্রি করে, আর সাধারণত ব্যাংক তার উকিলের মাধ্যমে সাপ্লাইকারী কোম্পানি থেকে যে মূল্যে পণ্যটি ক্রয় করেছে, তার সঙ্গে ব্যাংকের নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ সংযুক্ত করে সদস্য দেশের জন্য মূল্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে, আর সাধারণত আন্তর্জাতিক লেনদেনে চুক্তিতে ব্যাংকের উকিলপক্ষ ক্রেতার পক্ষ থেকে মূল্য উসুলের দায়িত্ব নিয়ে থাকে।

ব্যাংকের জন্য কি এ পদ্ধতিতে মুরাবাহার লেনদেন করা জায়েজ আছে?

উত্তর : প্রশ্নে মুরাবাহার পদ্ধতিতে বিক্রয়ের যে পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে শরয়ি দৃষ্টিতে এটি জায়েজ আছে। কারণ, সেখানে কবজা করার পর বিক্রয় করা হচ্ছে। অর্থাৎ ব্যাংকের পক্ষ থেকে ক্রেতার এলাকার নির্ধারিত উকিল পণ্য কবজা করছে, আর শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে এ ব্যাপারে কোনো আপত্তি নেই যে, ব্যাংকের উকিল ক্রেতার পক্ষ থেকে মূল্য পরিশোধের জিম্মাদারও হবে, তবে শর্ত হলো : এই জিম্মাদারির বিষয়টি ওকালতের চুক্তির সঙ্গে শর্তযুক্ত হতে পারবে না। আর এগ্রিমেন্টে এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে যে, চূড়ান্ত বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন করার আগে সেটি বিক্রয় হিসেবে গণ্য হবে না বরং সেটি শুধু ওয়াদা হিসেবে থাকবে, আর উভয় পক্ষকে আইনগতভাবেও সে ওয়াদা রক্ষা করতে হবে। যেমনটি দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

ব্যাংকের পক্ষ থেকে যে মূল্যে পণ্য ক্রয় করা হয়, তার ওপর নির্দিষ্ট হারে লাভ করে ক্রেতার কাছে সেটি বিক্রি করা এবং নির্দিষ্ট সময় পর মূল্য উসুল করার বিষয়গুলো শরয়ি দৃষ্টিতে জায়েজ ও বৈধ। অধিকাংশ ফকিহগণ এ ধরনের লেনদেনকে জায়েজ বলেছেন। ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন—

وقد فسر بعض أهل العلم قالوا : «بيعتين في بيعة» أن يقول : أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما.

'অনেক ফকিহ 'এক বিক্রয়ের মধ্যে দুই বিক্রয় করার' ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, কেউ বললো এই কাপড়টি নগদে দশ টাকা আর বাকিতে বিশ টাকায় বিক্রি করবো। এরপর কোনো একটি মূল্য নির্ধারণ না করে উভয় পক্ষ মজলিস ত্যাগ করলো। তবে কোনো একটি নির্দিষ্ট করার পর যদি মজলিস ত্যাগ করে, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। অর্থাৎ যখন নগদ বা বাকির কোনো একটি নির্দিষ্ট করার পর মজলিস ত্যাগ করবে তখন সেটি জায়েজ হতে আর কোনো সমস্যা নেই।'[২০৮]

ইমাম আবদুর রাজ্জাক রহ. 'মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক'-এ ইমাম জুহরি, তউস এবং সাইদ ইবনু মুসায়্যিব রহ. থেকে বর্ণনা করে—

لا بأس بأن يقول ابيعك هذا الثوب بعشرة إلى شهر أو بعشرين إلى شهرين فباعه على أحدهما قبل أن يفارقه فلا بأس به ، وهكذا عن قتادة.

'এ পদ্ধতিতে কোনো সমস্যা নেই যে, বিক্রেতা প্রস্তাব দিয়ে বললো, এই কাপড়টি একমাস মেয়াদে দশ টাকা আর দুইমাস মেয়াদে বিশ টাকায় বিক্রি করবো। এমতাবস্থায় প্রস্তাবের মজলিস ত্যাগ করার আগেই যে-কোনো একটি মেয়াদ নির্ধারণ করে কাপড় বিক্রি করলে তা জায়েজ আছে। ইমাম কতাদাহ রহ. থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।'[২০৯]

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু হাসান শাইবানি রহ. বলেন—

قال أبو حنيفة في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل، فاذا حلت قال له الذي عليه الدين، بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقداء بمائة وخمسين إلى أجل، إنَّ هذا جائز، لأنهما لم يشترطا شيئا ولم يذكرا أمرا يفسد به الشراء.

'ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, কোনো ব্যক্তির ওপর অন্য একজনের নির্দিষ্ট মেয়াদে পরিশোধের শর্তে একশো দিনার ঋণ ছিলো। যখন ঋণ পরিশোধের মেয়াদ আসলো, ঋণী তখন বললো, নগদে একশো দিনার মূল্যের কোনো একটি পণ্য একশো পঞ্চাশ দিনারে আমার কাছে বাকিতে

[২০৮] জামে তিরমিজি, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫৩৩। হাদিস : ১২৩১।

[২০৯] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১৩৬।

বিক্রি করো। এমন বিক্রি জায়েজ আছে। কারণ, সেখানে অন্যকিছুর শর্তারোপ করেনি এবং এমন কিছু উল্লেখ করেনি, যার কারণে ক্রয়টি ফাসেদ হয়।'[২১০]

মাসআলা—৫.

অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহের আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলো থেকে প্রাপ্ত সুদি অর্থ ব্যবহার করা

প্রশ্ন : ১৩৯৯ হিজরি সনের ১০ রবিউল আউওয়াল মাসে ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক জেদ্দার তত্ত্বাবধায়ক বোর্ডের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিলো অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহের আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলোতে ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকের রাখা অর্থ থেকে প্রাপ্ত সুদ ব্যবহারের ব্যাপারে শরয়ি দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করা।

বিজ্ঞ আলেমদের রিপোর্টের মাধ্যমে উপস্থাপিত প্রস্তাবের আলোকে ব্যাংক নিয়ন্ত্রণকারী বোর্ড এই সিদ্ধান্ত গ্রহন করে যে, আন্তর্জাতিক ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সুদের ৫০ পার্সেন্ট 'স্পেশাল রিজার্ভ ফান্ড' হিসেবে রাখা হবে। আর এই ৫০ পার্সেন্ট হবে আন্তর্জাতিক মার্কেটে ব্যাংকের যেসব শাখা কাজ করে, তাদের কাছে রাখা আমানতের অর্থ থেকে প্রাপ্ত সামগ্রীক সুদ থেকে। এই ফান্ডের উদ্দেশ্য হবে, ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রাখা কারেন্সির মূল্য কমে যাওয়ার কারণে ব্যাংকের মূলধনের যে ক্ষতি হবে, সেটিকে এই ফান্ড থেকে পূরণ করা হবে, আর সুদের অন্য ৫০ পার্সেন্টকে বিশেষ অনুদানে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশেষ অনুদান ফান্ডকে নিচের খাতগুলোতে ব্যয় করা হবে। যথা—

- সদস্য দেশের আর্থিক, অর্থনৈতিক ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার চাকাকে স্থিতিশীল রাখতে প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী সেটি ব্যয় করা হবে। এ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ১৪০১ হিজরি সন মোতাবেক ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে 'আল-মাহাদুল ইসলামি লিল বুহুস ওয়াত তাদরিব' নামক জিদ্দায় একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। সে প্রতিষ্ঠান

[২১০] কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মাদিনা, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬৯৪।

এখন গবেষণা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নিজ দায়িত্ব পালন করেছে।

- অস্বাভাবিক অবস্থা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ব্যাংকগুলো তাদের সদস্য দেশ এবং ইসলামিক সংস্থাগুলোকে ত্রাণ ও প্রয়োজনীয় সেবা এই বিশেষ ফান্ড থেকে সরবরাহ করবে।
- ইসলামিক ইস্যুগুলোকে সুদৃঢ় ও সুসংহত করার জন্য সদস্য দেশগুলোকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে।
- সদস্য দেশগুলোর শৈল্পিকখাতে সহায়তা প্রদান করা হবে।
- এখন প্রশ্ন হলো, ইসলামি ব্যাংকের জন্য অমুসলিম রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলো থেকে প্রাপ্ত সুদকে উপরের বিবরণ অনুযায়ী 'স্পেশাল ও বিশেষ অনুদান ফান্ড' হিসেবে রেখে উপকৃত হওয়া জায়েজ আছে কি না?

উত্তর : এ ব্যাপারে ১১/৩/১৩৯৯ হিজরি সনে বিজ্ঞ আলেমদের যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিলো এবং তারা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে সকল প্রস্তাবনা পেশ করেছিলেন, তার সঙ্গে আমিও একমত পোষণ করে বলেছি যে, এ জাতীয় ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সুদও স্পষ্ট সুদ, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহদের সহিহ ও গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো সুদ হারাম যদিও তা কোনো (হারবি) অমুসলিম থেকে নেওয়া হয়। সুতরাং মুসলিমদের জন্য সে সুদ উসুল করে নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করা জায়েজ নেই।

আর অন্যদিকে আমরা এই মতামতও পোষণ করি যে, বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অমুসলিম রাষ্ট্রের ব্যাংকসমূহে সুদের এ বিশাল অংশ রেখে দেওয়া ঠিক নয়। এ সমস্যা থেকে রক্ষা পেতে আলেমগণ এ পদ্ধতির কথা বলেছেন যে, প্রথমে সাধ্য অনুযায়ী সেসব সুদি ব্যাংক অর্থ রাখা থেকে যে-কোনো ভাবে বাঁচার চেষ্টা করবে। তবে যতদিন পর্যন্ত এটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না, ততদিন পর্যন্ত ইসলামি ব্যাংকগুলো সুদি ব্যাংক থেকে যে পরিমাণ সুদ পাবে সেটিকে একটি ভিন্ন অ্যাকাউন্টে রাখবে। এরপর সেগুলোকে ফকির ও গরীবদের জন্য ব্যয় করবে।

আর সুদি ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সুদের ৫০ পার্সেন্ট স্পেশাল রিজার্ভ ফান্ডে

রাখা। আমার দৃষ্টিতে শরয়িভাবে এটি জায়েজ নেই। কারণ, স্পেশাল ফান্ড ব্যাংকেরই মোট সম্পদের একটি অংশ হয়ে থাকে, আর অনেক সময় অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কারেন্সির মূল্য কমে যাওয়ার কারণে যে ক্ষতি হয়, সেটিকে ওই স্পেশাল ফান্ড থেকে পূরণ করা হয়, আর উপরে আমরা এ বিষয়টি আলোচনা করেছি যে, ব্যাংকের জন্য সুদ থেকে কোনোভাবেই উপকৃত হওয়া জায়েজ নেই।

সুতরাং ইসলামি ব্যাংকের জন্য আবশ্যক হলো, অমুসলিম রাষ্ট্রের সুদি ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সুদকে শুধু বিশেষ অনুদানের জন্যই বরাদ্ধ রাখবে।

মাসআলা—৬.

লেটার অফ ক্রেডিট ইস্যু করতে ব্যাংকের পারিশ্রমিক বা কমিশন নেওয়া

প্রশ্ন : যারা বাইরের দেশ থেকে পণ্য আমদানি করে, তাদেরকে কোনো এক ব্যাংকে এল, সি, খুলতে হয়। যে কারণে ব্যাংক তাদের জন্য 'লেটার অফ ক্রেডিট' ইস্যু করে থাকে এবং এর মাধ্যমে ব্যাংক ওই ব্যক্তির দায়িত্ব বহন করে। ব্যাংকের পক্ষ থেকে এই দায়িত্ব নেওয়ার কারণে বিনিময় নেওয়া হয়। এখন প্রশ্ন হলো, ব্যাংকের জন্য এই দায়িত্ব গ্রহণের কারণে বিনিময় নেওয়া জায়েজ আছে কি না?

উত্তর : এ বিষয়ে ড. রফিক মিশরির প্রস্তাবগুলো যাচাই করেছি। তবে এ ক্ষেত্রে আমার পক্ষ থেকে সেই উত্তরই হবে, যা সার্ভিস চার্জের ক্ষেত্রে বলেছি। যার সারাংশ হলো, শরয়িভাবে দায়িত্ব বা জিম্মাদারির বিনিময় ও পারিশ্রমিক নেওয়া হারাম। আমার জানামতে কোনো একজন ফকিহও এটিকে জায়েজ বলেননি। এমনটি হওয়ার কারণ হলো, এটি এমন একটি পারিশ্রমিক, যা কোনো মাল বা কাজের বিনিময় নয়। দ্বিতীয় কারণ হলো, ইসলামি ফিকহে দায়িত্ব বা জিম্মাদারিকে সৌজন্যমূলক চুক্তি বলা হয়েছে। এগুলোকে বিনিময় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এটি এমন স্পষ্ট কথা, যার দলিল দেওয়ারও প্রয়োজন নেই।

অবশ্য এ বিষয়টি লক্ষ্যণীয় যে, জিম্মাদারি গ্রহণকারীর জন্য স্বয়ং জিম্মাদারীর বিনিময় নেওয়া জায়েজ নেই। তবে যদি তার জিম্মাদারির জন্য কিছু কাজ করতে হয় যেমন : এর জন্য তাকে লেখাপড়া এবং অন্যান্য দাপ্তরিক কার্যক্রম করতে হয়। অথবা যার পক্ষ থেকে জিম্মাদারি নেওয়া হচ্ছে বা যার জিম্মাদারি নেওয়া হচ্ছে তাদের মধ্যে পত্রের আদান-প্রদানের মাধ্যমে সম্পর্ক করতে হয়। এ ধরনের দাপ্তরিক কার্যক্রম ফ্রি করা জরুরি নয়। বরং জিম্মাদারি গ্রহণকারীর জন্য যার জন্য বা যার পক্ষ থেকে জিম্মাদারি গ্রহণ করছে তাদের কারও থেকে এ ধরনের কার্যক্রমের ন্যায্য পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েজ আছে।

বর্তমানে ব্যাংকগুলো যেসব জিম্মাদারি গ্রহণ করে, সে ক্ষেত্রে শুধু মৌখিকভাবে জিম্মাদারি গ্রহণ করে না বরং এর জন্য অনেক দাপ্তরিক কার্যক্রমও সম্পাদন করতে হয়। যেমন : পত্রের আদান-প্রদান, কাগজপত্র, টাকা ইত্যাদি উসুল করা ও হস্তান্তর করা ইত্যাদি, আর এসব কার্যক্রম সম্পাদনা করতে তাদের শ্রমিক, দফতর, অফিস ও অন্যান্য জিনিসের প্রয়োজন পড়ে। আর ব্যাংকের এ ধরনের ব্যয় ফ্রি হওয়া আবশ্যক নয়, ফলে এগুলোর জন্য ব্যাংক তার গ্রাহক থেকে ন্যায্য পারিশ্রমিক নিতে পারবে। অবশ্য শুধু জিম্মাদারির বিনিময়ে কিছু নেওয়া জায়েজ নেই।

এ ছাড়া বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে ব্যাংক মধ্যস্থতা করে থাকে। উকিল বা দালাল হিসেবে অনেক কাজ করে, আর শরয়িভাবে উকিল বা দালালের জন্য বিনিময় নেওয়া জায়েজ আছে। সুতরাং এ ধরনের কাজের ক্ষেত্রে ব্যাংক তার গ্রাহক থেকে ওকালত বা দালালির বিনিময় নিতে পারে।

অতএব ব্যাংকের জন্য তার গ্রাহক থেকে দুটি পদ্ধতিতে বিনিময় নেওয়া জায়েজ আছে—

- লেটার অফ ক্রেডিট (L.C.) ইস্যু করতে ব্যাংকের যে দাপ্তরিক কার্যক্রমের প্রয়োজন পড়ে, তার পারিশ্রমিক নেওয়া।
- ওকালত বা দালালির পারিশ্রমিক গ্রহণ করা। অবশ্য এ দুটি পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাংক যে পারিশ্রমিক নেবে, সে ক্ষেত্রে আবশ্যক হলো, এ প্রকৃতির কাজের ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকে ব্যাংকের পারিশ্রমিক বেশি

হতে পারবে না। যদি ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকে বেশি হয়, তাহলে সেটি শুধু জিম্মাদারির বিনিময় নেওয়ার জন্য হিলা-বাহানা হিসেবে গণ্য হবে। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে যার বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

সারকথা, ব্যাংক যখন এই দুই পদ্ধতির মাধ্যমে বিনিময় নিতে পারলো, তখন শুধু জিম্মাদারির বিনিময় নেওয়ার আর কোনো সুযোগ থাকলো না। ড. রফিক মিশরির প্রস্তাবের সারকথা হলো, পূর্বেকার যুগে সৌজন্যমূলক একজন অন্যের জিম্মাদারি গ্রহণ করতো। কিন্তু বর্তমানে জিম্মাদারি গ্রহণের বিষয়টি একটি পেশায় পরিণত হয়েছে। বিধায় বর্তমানে শুধু জিম্মাদারির বিনিময় নেওয়া জায়েজ হওয়া উচিত। আমরা যথার্থ সম্মানের সঙ্গে বলছি যে, ড. রফিক মিশরির এই প্রস্তাবের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারছি না, আর একমত না হওয়ার বেশ কিছু কারণ রয়েছে। যথা :

প্রথমে আমরা যদি একথাকে মেনে নিই যে, কোনো ব্যক্তি যদি এককভাবে এমন কাজ করে, শরয়ি দৃষ্টিতে যার বিনিময় নেওয়া জায়েজ নেই তবে সে কাজটিই যদি নিয়মতান্ত্রিক কোনো পেশার রূপ ধারণ করে, তাহলে তার বিনিময় নেওয়া জায়েজ হবে। আমরা যদি এ দলিলটিকে সহিহ বলে মেনে নিই, তাহলে এ দলিলের আলোকে তো এ কথাও বলা যেতে পারে যে, পূর্ব যুগে ঋণ দেওয়ার বিষয়টি যেহেতু সৌজন্যমূলক কাজ ছিলো আর এ ধরনের কাজে আগ্রহীদের মধ্যেই সেটি সীমাবদ্ধ ছিলো, এ কারণে ঋণ হিসেবে কারও বড়ো অংকের অর্থের প্রয়োজন পড়তো না। তা ছাড়া সে যুগে সৌজন্যমূলক ঋণ দেওয়ার জন্য অনেক লোক প্রস্তুত ছিলো। কিন্তু বর্তমানে ঋণ হিসেবে মানুষের যেহেতু অনেক বড়ো অংকের অর্থের প্রয়োজন পড়ে, আর বর্তমানে সৌজন্যমূলক ঋণ দেওয়ার মতো লোকও পাওয়া যায় না। এ কারণে ঋণের বিষয়টি এখন একটি পেশায় পরিণত হয়েছে। যার জন্য ব্যাংকের সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং এখন ঋণের বিনিময়ে সুদ নেওয়াও জায়েজ হতে হবে।

এটা স্পষ্ট যে, ঋণের ব্যাপারে এই দলিল গ্রহণ করে কেউ এমন কথা বলেনি যে, ঋণের বিনিময়ে সুদ নেওয়া জায়েজ আছে। অনুরূপভাবে জিম্মাদারির ব্যাপারেও সে দলিলটি গ্রহণ করা যাবে না।

আর ইমাম, মুয়াজ্জিন, শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিনিময় নেওয়ার

মাসআলাগুলো ইজতেহাদি মাসআলা। অনেক ফকিহ শুরু থেকেই এ ধরনের কাজের বিনিময় নেওয়াকে জায়েজ বলেছেন। যেমন : ইমাম শাফিয়ি রহ.। এগুলোর বিনিময় নেওয়া জায়েজের পক্ষে তিনি বেশ কিছু হাদিসের মাধ্যমে দলিল দিয়েছেন। সুতরাং যখন বেশি প্রয়োজন হলো এবং এ ধরনের কাজের জন্য বিনিময়হীন শ্রম দেওয়ার মতো লোক পাওয়া গেলো না, তখন হানাফি মাজহাবের ফকিহগণ এ ধরনের কাজের বিনিময় নেওয়াকে জায়েজ বললেন। তবে জিম্মাদারির বিনিময় নেওয়ার মাসআলাটি কোনো ইজতেহাদি মাসআলা নয় বরং সেটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের মাসআলা। এ কারণে জিম্মাদারির বিনিময় নেওয়ার মাসআলাকে ইবাদতের বিনিময় নেওয়ার মাসআলার ওপর কিয়াস করা সহিহ নয়।

আর কাঠ সংগ্রহ করা বা শিকার করার জন্য কোনো ব্যক্তিকে শ্রমিক হিসেবে নেওয়ার মাসআলাটি হলো, মৌলিকভাবে তার বিনিময় নেওয়া জায়েজ আছে, আর শিকার করা পশু বা সংগৃহীত কাঠের মালিক হবে যে ব্যক্তি শ্রমিক নিয়োগ দিয়েছে সে। শ্রমিক সে জিনিসের মালিক হবে না, আর 'শ্রমিক নিয়োগকার' কোনো ব্যক্তি হোক বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হোক সে ক্ষেত্রে হুকুমে কোনো পরিবর্তন হবে না।

উপরের আলোচনা থেকে যখন এটি স্পষ্ট হলো যে, ব্যাংক তার গ্রাহক থেকে দুটি পদ্ধতিতে বিনিময় নিতে পারবে। একটি হলো দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন করার বিনিময়ে। আর দ্বিতীয়টি হলো, ওকালত বা দালালির বিনিময়ে। সুতরাং জিম্মাদারির বিনিময় নেওয়া জায়েজ করার এখন আর কোনো প্রয়োজন থাকলো না। কেননা, এ দুটি কাজের বিনিময় নির্ধারণের দায়িত্ব ব্যাংকের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। অতএব ব্যাংকের জন্য এখন সুযোগ তৈরি হলো যে, এ কাজের জন্য তারা সে পরিমাণ বিনিময় নির্ধারণ করবে, যা বর্তমান সমাজে ব্যাংকের পক্ষ থেকে এ ধরনের কাজের জন্য যথেষ্ট হবে। মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

মাকতাবাতুল ইসলাম থেকে প্রকাশিত
লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

১. পরকালের সম্বল : সহজে নেকি অর্জন [আসান নেকিয়া]

২. দেশ দেশান্তর-১ [জাহানে দিদা-১]

৩. দেশ দেশান্তর-২ [জাহানে দিদা-২]

৪. দেশ দেশান্তর-৩ [দুনিয়া মেরে আগে]

৫. দেশ দেশান্তর-৪ [সফর দর সফর]

৬. নির্বাচিত গল্প [সংকলন]

৭. ইসলাহি গল্প [সংকলন]

৮. ইমানি গল্প [সংকলন]

৯. আমার পিতা আমার শায়খ [মেরে ওয়ালিদ মেরে শায়খ]

১০. সুদবিহীন ব্যাংকিং [গায়রে সুদি ব্যাংকারি]

পাঠকের পাতা

অনুবাদক পরিচিতি

মুহাম্মদ ইলিয়াস বিন আলাউদ্দীন। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের চার অক্টোবর যশোর জেলার সদর থানায় তালবাড়ীয়া গ্রামের একটি সাধারণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিন ভাই-বোনের মাঝে সর্বকনিষ্ঠ। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার হাতেখড়ি। বড়ো ভাইয়ের হাত ধরে ১৯৯৮ সালে তালবাড়ীয়া হুসাইনিয়া মাদরাসায় দীনী শিক্ষায় নিয়োজিত হওয়ার মাধ্যমে শিক্ষা জীবনের সূচনা হয় তার। কৃতিত্বের সঙ্গে কওমী মাদরাসার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে ২০১০ সালে বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের অধীনে তিনি দাওরায়ে হাদিস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং কৃতকার্য হন। এরপর জামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম (মসজিদুল আকবার কমপ্লেক্স) থেকে তাখাসসুস ফিল ফিকহি ওয়াল ইফতা সম্পন্ন করে কর্মজীবনে পদার্পণ করেন।

ছাত্রজীবন থেকেই আরবি ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী হওয়ায় লেখাপড়ার মাঝে বিভিন্ন সময়ে যোগ্য উস্তাজগণের লেখালেখিতে শরিক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। মুতাওয়াসসিতাহ জামাতেই শিক্ষকদের অনুপ্রেরণায় হিদায়াতুন্নাহু কিতাবের শরাহ রেওয়ায়াতুন নাহুর অনুবাদ করে শিক্ষকদের প্রশংসা কুড়ান। তিনি অনুবাদ ও গবেষণাধর্মী কিতাব রচনায় অধিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। এ পর্যন্ত তার পাঁচটি অনুবাদগ্রন্থ ও 'কিতাব পরিচিতি' নামক একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। তা ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় এগারোটি পাণ্ডুলিপির কাজ চলমান।চারটি কিতাব প্রকাশের প্রক্রিয়াধীন।

বর্তমানে ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলাধীন একটি মাদরাসার প্রিন্সিপাল ও অন্য একটি মাদরাসায় হাদিসের খেদমত করে যাচ্ছেন। আমরা তাঁর সফলতা কামনা করি।

ফিকহি মাকালাত প্রথম খণ্ডে যা আছে

- কাগুজে মুদ্রার বিধিবিধান
- কাগুজে নোটের ক্রয়ক্ষমতা এবং সেটিকে সূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা
- কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করা
- শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের শরয়ি বিধান
- নিরেট স্বত্ব ক্রয়-বিক্রয় করা
- পশ্চিমা দেশগুলোর জন্য কিছু আধুনিক মাসআলা ও তার সমাধান
- ইসলামি ব্যাংকিং বিষয়ে কিছু মাসআলা ও তার সমাধান

মাকতাবাতুল ইসলাম
ISBN 978-984-91049 1-9
www.maktabatul-islam.com